ছেড়ে আসা গ্রাম

ছেড়ে আসা গ্রাম

॥ দ্বিতীয় খণ্ড ॥

দক্ষিণারঞ্জন বসু

পপুলার লাইব্রেরী

১৯৫/১বি, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রথম সংস্করণ ঃ মাঘ, ১৩৬৫

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ মৈত্রেয়ী দেবী

প্রকাশক ঃ
শ্রীঅখিলচন্দ্র নন্দী,
পপুলার লাইব্রেরী,
১৯৫।১ বি, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

মুদ্রক ঃ
শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,
মানসী প্রেস,
৭৩, মাণিকতলা স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ ঃ

ছেড়ে আসা গ্রাম (প্রথম খণ্ড),
স্বপ্নকোরক,
মধুরেণ,
শতাব্দীর সূর্য,
সুভদ্রার ভিটে,
বীরবাহাদুর,
বাজীমাৎ,
পেনাংয়ের পাহাড়ে,
বিদেশ বিভুঁই,
পরম্পরা,
রোদ জল ঝড়।

॥ তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা ॥

দণ্ডকারণ্যে
নূতন বাঙলার স্রষ্টা-অধিবাসীদের হাতে

শুধু পশ্চিম বাঙলাই বাঙলা দেশ নয়। বাঙালীর ইতিহাসও শুধু পশ্চিম বাঙলার ইতিহাস নয়। অনেক বড়ো তার পটভূমিকা, অনেক ব্যাপক তার বিস্তার। বাঙলার মাত্র এক তৃতীয়াংশ পশ্চিমবঙ্গ—বাকি দুই তৃতীয়াংশ আজ অন্যদেশ, ভারত-দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন আর এক রাষ্ট্রের পূর্বাংশ। আজ আর বাঙলা দেশ বলে বাঙলার সে অংশ পরিচিত নয়, তার নতুন নাম পূর্ব পাকিস্তান! কিন্তু ভাবীকালের বাঙালীর কাছে পল্লী-প্রাণ বাঙলা দেশের সত্য রূপ, তার সত্যকারের পরিচয় তুলে ধরার দায়িত্ব কি আমাদের নয়? এই প্রশ্নের পটভূমিকায়ই আমি 'ছেড়ে আসা গ্রাম' সম্বন্ধে নানা কাহিনী সংগ্রহের পরিকল্পনা করেছিলাম। সহযোগিতা পেয়েছিলাম আশাতীত। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫০। বাঙলা দেশের চরম দুঃসময়ের সে কাল। পঞ্চাশের বেদনাঘন দুর্দিনে 'যুগান্তরে' যখন ছিন্নমূল উদ্বাস্তু নরনারীর কাছ থেকে সংগৃহীত ছেড়ে আসা গ্রামের মর্মন্তুদ আলেখ্যসমূহ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে তখন দেশবাসীর মধ্যে এক তুমুল আলোড়ন দেখা দিয়েছিল। আকস্মিক এক রাজনৈতিক ঝঞ্ঝায় লক্ষ লক্ষ সুখী শান্তিপ্রিয় মানুষের অভ্যস্ত জীবনযাত্রা ও পরিবেশ এবং আপন পিতৃপিতামহের ভিটে থেকে এমন ভাবে উন্মুলিত হবার নজির পৃথিবীর ইতিহাসে বোধহয় কোথাও পাওয়া যায় না। অস্বীকৃত-অতীত ও অনিশ্চিত-ভবিষ্যৎ লক্ষ লক্ষ এই ছিন্নমূল মানুষের দল স্মৃতি চারনায় কিছু শান্তি পায় বৈকি। তাই তাদেরই মধ্যে বহুজন 'ইতিহাসের বিচ্ছিন্ন ধারাকে কথায় ধরে রাখতে এবং ভবিষ্যতের মানুষ যাতে বাঙালী বলে পরিচিত একদল মানুষেরই ভাগ্যবিড়ম্বিত জীবনের ছিন্নসূত্রটুকুর সন্ধান লাভ করতে পারে' সেই উদ্দেশ্যে আপন আপন গ্রাম-পরিচয় দিয়ে আমাকে আমার পরিকল্পনা রূপায়নে সাহায্য করেছেন। তাঁদের প্রত্যেকের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই।

কয়েক বছর পূর্বে 'ছেড়ে আসা গ্রাম' প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। তাতে কেবলমাত্র চারিটি জেলার কয়েবটি করে গ্রাম-চিত্র প্রকাশ করা হয়েছিল। তখন থেকেই বহু অনুরোধ ও তাগিদ আসতে থাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত বাঙলার অন্যান্য জেলার গ্রাম-পরিচয়ও গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্যে। নানা কারণে, বিশেষ করে কয়েকটি জেলার গ্রাম-তথ্য সংগ্রহে বিলম্ব হওয়ায় 'ছেড়ে আসা গ্রাম' গ্রন্থের

দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশে বেশ একটু দেরি হয়ে গেল। বেদনাক্ষুব্ধ এক একজন গ্রাম-প্রতিনিধিকে দিয়ে বলানো হয়েছে পূর্ব ও উত্তর বাঙলার এক একটি স্নিগ্ধ-শ্যামল গ্রামের অশ্রুসজল বর্ণনা। একই বেদনা-মধুর সুর তার প্রত্যেকটিতে ধ্বনিত হলেও বিভিন্ন জেলার লোকাচার ও লোক সংস্কৃতির পার্থক্যও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে বিভিন্ন কাহিনীতে।

প্রথম খণ্ডের ন্যায় এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকাতেও এ কথা বলে রাখা ভালো যে, ছেড়ে আসা গ্রামের কাহিনীগুলো ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রচিত নয়। সাধারণ গ্রামীণ মানুষের স্বপ্ন-প্রেরণা, স্নেহ-লালিত চেতনা ও সুখদুঃখ-মধুর স্মৃতি চিন্তা প্রত্যেকটি বর্ণনাকে আবেগ-প্রবণ করে তুলেছে। বস্তুত মানুষই এখানে মূলকেন্দ্র, মানুষের চেতনাকে কেন্দ্র করেই এক একটি গ্রাম হয়ে উঠেছে জীবন্ত। তথাপি ইতিহাস এখানে অপ্রত্যক্ষ হলেও, ভবিষ্যতের মানুষকে কোনো কোনো ঐতিহাসিক সূত্রের সন্ধান দানে এই সব গ্রাম-চিত্রও হয়তো সাহায্য করবে।

যাঁরা আমার এই পরিকল্পনা রূপায়ণে নিজ নিজ গ্রাম-পরিচয় দিয়ে আমাকে সহযোগিতা-ধন্য করেছেন এখানে তাঁদের প্রত্যেকের কাছে আন্তরিকভাবে ঋণ স্বীকার করতে আমি কৃতার্থবোধ করছি। 'যুগান্তরে' প্রকাশিত গ্রাম-আলেখ্যের মধ্যে নির্বাচিত কতগুলোকে এই গ্রন্থে প্রকাশের অনুমতি দিয়ে 'যুগান্তর' কর্তৃপক্ষ আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। তথ্যসংগ্রহে ও গ্রন্থ সম্পাদনায় আমাকে সাহায্য করেছেন শ্রীকৃষ্ণ ধর, শ্রীশিশির কুমার চক্রবর্তী, স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ কুণ্ডু চৌধুরী, শ্রীমনকুমার সেন, শ্রীমৃণালকান্তি মুখোপাধ্যায়, শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়, শ্রীসন্তোষ ঘোষ, শ্রীগৌর চক্রবর্তী, শ্রীঅখিল চন্দ্র নন্দী, শ্রীঅম্বিকা চরণ চৌধুরী। এঁদের স্বেচ্ছা-সহযোগিতার কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আমি চিরকাল স্মরণ করব।

শ্রীপঞ্চমী, —দক্ষিণারঞ্জন বসু

১৩৬৫

সূচীপত্র

॥ চট্টগ্রাম ॥

সারোয়াতলী

সুদীর্ঘ আট দশ হাত চওড়া আরাকান রোডের দু'পাশে দেখা যায় আমার ছেড়ে আসা গ্রামের এক বিশিষ্ট রূপ। রাস্তার দু'ধারে সারবন্দী বড় বড় গাছ—অশ্বত্থ, বট, আম, সোনালু আর গামার। নব কিশলয়ে ফলে ফুলে তাদের বসন্তশ্রী মনে জাগায় সৃষ্টিকর্তার রসমাধুর্য। কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরী রং ধরায় মানুষের মনে, ভোরের স্নিগ্ধ বাতাস বকুল ফুল কুড়াবার জন্য ডাকে।

অদূরে 'করেলডেঙ্গা' পাহাড়। নিবিড় শ্যামল আস্তরণের ফাঁকে ফাঁকে নানা রংয়ের ফুলের সমারোহ। সোনালী রংয়ের সোনালু ফুল, বেগুনী রংয়ের গামার, বনকরবী, অজস্র কাঠ-গোলাপ ও কাঠ-মল্লিকা। পাহাড়ের গা-বেয়ে ছোট ছোট ঝরণা নেমে এসেছে, তার পাশে কোথাও কোথাও শণ ক্ষেত। নীচে দিগন্ত-প্রসারী মাঠ, বুকে তাদের নানান ফসল। তার পরই আম, জাম, সুপারি, নারিকেল আর খেজুর গাছের ঘন অন্তরালে আমার জন্মভূমি কঞ্জুরী মৌজার সারোয়াতলী গ্রাম। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সময় থেকে বাইরের লোকে জেনেছে 'সেওড়াতলী' বলে।

কর্ণফুলির বহু শাখাপ্রশাখা গাঁয়ের ভেতর প্রবেশ করেছে। ছবির মত তাদের রূপ—তাদের প্রায় সবগুলিতেই বারমাস নৌকা চলে।

আষাঢ়-শ্রাবণের ঘন বর্ষণেও রাস্তাঘাট ডোবে না, চারদিক্‌ অপূর্ব শ্যামশ্রীতে ভরে যায়। পুকুর দীঘির টলটলে জলের উপর নানা রংয়ের শাপলা ফুল ও পদ্মের অপরূপ সৌন্দর্যে চোখ জুড়ায়।

ভরা বর্ষায় খালে বিলে ছোট নেংটিপরা ছেলেমেয়েদের মাছ ধরার হিড়িক পড়ে। এক একটি মাছ পলো চাপা পড়ার পর তাদের উচ্ছ্বসিত হাসি ও চিৎকারে প্রকৃতির সজলরূপের মাধুর্য বেড়ে যায়।

শ্রাবণ মাসের আনন্দ—মা মনসার আগমন। পয়লা শ্রাবণ ঘরে ঘরে মা মনসার ঘট বসে—প্রতি রবিবার ঘটের পল্লব বদ্‌লানো হয়। প্রত্যেকদিনই

মনসার পুঁথি পড়া হয়—'বাইশ কবি মনসাপুঁথি' অর্থাৎ বাইশজন কবির লেখা মনসামঙ্গল। একজন সুললিত কণ্ঠে পুঁথি পড়েন—কয়েকজন দোহার ধরেন। মধ্যে মধ্যে চলে গীতবাদ্য। কোন কোন বাড়িতে এই উপলক্ষে ভোজ হয়। সংক্রান্তির দিন ঘটা করে মায়ের পুজো। পুজোয় পাঁঠা, হাঁস, কবুতর বলি পড়ে। কেউ কেউ বলি দেন আখ বা চালকুমড়ো।

আসে শরৎ। শারদলক্ষ্মীর শুভ আগমনে প্রকৃতির সঙ্গে মানব হৃদয় আনন্দে নেচে ওঠে। ভোর বেলার শান্ত বাতাসে ভেসে আসে শিউলী ফুলের গন্ধ, দারোগা বাড়ির মঙ্গল আরতির ঘণ্টা কাঁসর শাঁখের পবিত্র শব্দ আর বড় পীরের দরগা থেকে আসে সুমধুর আজান ধ্বনি।

দুর্গা পূজায় নাগ ও মহাজনদের বাড়িতেই ধুমধাম হয় সব চেয়ে বেশী। গ্রামের প্রায় সবাই তাতে যোগ দেয়। তবে বিশেষ করে নাগদের বাড়ির নবমী পূজার বলি দেখবার জন্য সারা গ্রামের লোক ছুটে যায়। বলির মহিষটির শিং দু'খানা সিঁদুরে রাঙিয়ে তার গলায় বেলপাতা ও জবা ফুলের মালা পরানো হয়। সাজতে হয় ঘাতককেও। মাথায় জবাফুলের মালার পাগড়ি, হাতে খড়্গ—সালুপরা, সিন্দুর-রঞ্জিত সেই মূর্তিকে আজও ভুলতে পারি নি। ভুলি নি বলির পর তার 'ঘাতক নাচ'।

মনে পড়ে ছোট বেলায় একবার বলির আগেই ছুটে পালিয়ে এসেছিলাম। বলির মহিষের চোখের কোণে জলের ধারা আমার শিশু মনের উপর যে প্রভাব বিস্তার করেছিল—আজ পর্যন্তও সেই ছবি আমার মন থেকে মিলিয়ে যায়নি।

পূজার উৎসবের পরই মনে পড়ে ধান কাটার আনন্দের কথা। কোন কোন গৃহস্থের ধান কাটার সময় ঢাক-ঢোলের বাদ্য বাজনা হত। অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের আসামী তারকেশ্বরদা'দের জমির ধান কাটা দেখতে জড় হতাম ছেলে বেলায়। খুব ভোরে বাজনদারেরা এসে সানাইয়ের তান ধরতেই দলে দলে চাষীর দল জমায়েত হত। রাঙা গামছা কোমরে বেঁধে, কাঁচির ডগায় সিন্দুর লাগিয়ে সবাই রওনা হত মাঠের দিকে। মাঠজোড়া অনেক জমি, তাতে ধান কাটা চলত দিনরাত। সঙ্গে চলত বাজনা আর চাষীদের খাওয়া।

তারকেশ্বরের মা সবার বড়মা। তিনি ধান বরণ করতেন দূর্বায়, বরণকুলায়, মঙ্গলঘটের জলে আর মঙ্গলপাখার বাতাসে। প্রথম আঁটি ধান এইভাবে ঘরে আনা হত। চাষীরা বিদায় পেত নূতন কাপড় ও গামছা।

চাষীদের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ সব জাতই থাকত এবং তারা সবাই এই সব অনুষ্ঠান পালন করত।

চৈত্র মাসে হত 'গৌরীর নাচ'। হিন্দু মুসলমান সবাই এই উৎসবে যোগ দিতেন। ঢাকী-ঢুলী চলে মনোজ্ঞ ফুলসাজে সজ্জিত হরগৌরীর পিছু পিছু। গ্রাম হতে গ্রামান্তরে শোভাযাত্রীরা গেয়ে বেড়ায়—

আজুয়া গৌরীর মালা-চন্দন
কালুয়া গৌরীর বিয়া,
ওরে গৌরীরে নিতো আইলূ শিব
চুয়া-চন্দন দিয়া।......

মূল গায়েন গায় 'আজুয়া গৌরীর......' ইত্যাদি। পিছনে সবাই ধুয়া ধরে। বাজনার তালে তালে হরগৌরী নাচে।

ছোট একখানা পেতলের সরাই থাকে গৌরীর হাতে। নাচের ফাঁকে ফাঁকে গিন্নীমাদের কাছে তাদের পাওনা আদায় করে।

চৈত্র সংক্রান্তির আগের দিনকে বলে 'ফুলবিষু'। এই নামকরণ অর্থহীন নয়। ফুলের মালায়, নিমপাতায় আর কেয়া কাঁঠালের ফালিতে বাড়ির সব দরজা-জানালা সাজান হয়। বাড়ির সব কিছুকেই মালা পরান হয়, এমন কি আসবাপত্র এবং গৃহপালিত পশু-পক্ষীও বাদ পড়ে না।

চৈত্র সংক্রান্তির কয়েকদিন আগে থেকেই ঘরে ঘরে খৈ, চিড়া, নারিকেল, তিল, চালতা, কুল ও গুড় প্রভৃতির মিশ্রণে নাড়ু তৈরী হয়। এই নাড়ুকে আমাদের চাটগাঁয় বলে—'লাওন'। সংক্রান্তি বা বিষুপর্বের দিন চলে এই 'লাওন' খাওয়ার উৎসব। এই উৎসবের মধ্য দিয়েই হত বর্ষাবিদায় এবং হিন্দু-মুসলমানের নববর্ষ-বরণের আন্তরিক শুভকামনার বিনিময়।

জ্যৈষ্ঠ মাসে চলত আম-নিমন্ত্রণ। চট্টগ্রামের পল্লীর এই এক বৈশিষ্ট্য। পরস্পর পরস্পরকে আম খেতে নিমন্ত্রণ করবেন। নিমন্ত্রণ রক্ষা না করলে অসুখী হবেন—অনুযোগ করবেন।

মোটামুটি এই হচ্ছে আমার গ্রাম সারোয়াতলীর পূজাপার্বণ।

গ্রামটি একেবারে ছোট নয়। স্কুল, ডাকঘর ও দাতব্য চিকিৎসালয় আছে, আর আছে মাইলখানেকের মধ্যে কানুনগোপাড়ায় এক প্রথম শ্রেণীর কলেজ।

চট্টগ্রামের স্নিগ্ধ সুন্দর পরিবেশে তার পাহাড় ও নদীর গাম্ভীর্যের মধ্যে গড়ে

ওঠা যে সব মানুষ দেখেছি, আজ তাদের মধ্যে প্রথম মনে পড়ছে যোগেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়কে। ধনীর সন্তান, জমিদারের ছেলে, কিন্তু নির্লিপ্ত এই মানুষটি বিষয়বৈভবের কোন খবরই রাখতেন না।

এল ভাগ্য বিপর্যয়। তিনি আপনা থেকে কেমন করে জানতে পারলেন যে, তাঁর গৃহদেবতা মা কালীর নিত্যভোগ বন্ধ হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আহার বন্ধ করলেন। এর পর যে তিন মাসের মত বেঁচে ছিলেন তার মধ্যে অন্ন আব গ্রহণ করেন নি। একটুখানি হাসি দিয়ে সকলের অনুরোধ এড়িয়ে যেতেন।

তাঁকে দাদুমণি বলে ডাকতাম। কথার ফাঁকে বন্দী করে একদিন দাদুমণিকে অন্নগ্রহণের অনুরোধ জানালাম। তাঁর করুণ মুখের মলিন হাসি অশ্রুরাশির মধ্যে ডুবে গেল। চুপি চুপি আমায় সব জানালেন, বললেন—ঐ অনুরোধ তুই আর আমায় করিস্‌নি ভাই।

আর আজ মনে পড়ে গ্রামের তারকেশ্বরদা ও রামকৃষ্ণ বিশ্বাসকে—'ফাঁসীর মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয় গান'। মনে পড়ে—শাসকশক্তির অত্যাচারের করালরূপ। তারকেশ্বর-রামকৃষ্ণের পরিচয় বাঙ্গালী পাঠককে দিতে হবে না জানি, কিন্তু সেদিন গ্রামের উপর দিয়ে অত্যাচারের যে ঝড় বয়ে গেছে—সেকথা স্মরণ করলে এখনো শিউরে উঠি।

চোখের উপর ভেসে উঠে একদিনের নির্মম ছবি। ভোর বেলায় গভীর আতঙ্কে গ্রামবাসীর ঘুম ভাঙ্গল—ভয়ে কারো মুখে কথা সরে না! জ্বলে উঠ্‌ল তারকেশ্বর, রামকৃষ্ণ ও বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্মী প্রসন্ন সেন মহাশয়ের বাড়ি।

পুলিশ সুপার স্টার সাহেবের কর্তৃত্বাধীনে সারোয়াতলীকে মিলিটারীর হাতে তুলে দেওয়া হল। তারা তারকাঁটা দিয়ে কালাইয়ার হাটের পাশে গ্রামের হাই-স্কুলটাকে ঘিরে ফেলল। শুরু হল লাঠি-বৃষ্টি, বেয়নেটের খোঁচা ও বন্দুকের কুঁদার আঘাত। তৃতীয় শ্রেণীর শিশু থেকে দশমশ্রেণীর কিশোর কেউই বাদ পড়ল না—এমন কি শিক্ষকরাও প্রহারে জর্জরিত হলেন।

এই অত্যাচার থেকে ধোরলা, কানুনগোপাড়া প্রভৃতি পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিও রেহাই পায় নি। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর জালালাবাদে চলে স্বাধীনতাকামী বিদ্রোহীদের সঙ্গে ইংরেজ সরকারের প্রথম সশস্ত্র সম্মুখ সংগ্রাম। এই যুদ্ধের অধিনায়ক ছিলেন লোকনাথ বল। তাঁর ভাই টেগ্‌রা এবং আরো কয়েকজন

সেখানে শহীদ্ হয়েছিলেন। তারকেশ্বর, রামকৃষ্ণের বাড়ির মত লোকনাথদার বাড়িও ভস্মীভূত হয় সেই সময়।

তখন দেখেছি গ্রামের সকলের তাঁদের প্রতি কি সহানুভূতি ও সমবেদনা! বিদেশী শাসকের অত্যাচারে এদের মনেও বেজে উঠত বিদ্রোহের সুর।

অশিক্ষিত চাষাভূষোর দল বিদ্রোহীদের লুকিয়ে রাখতেন—তাঁদের মধ্যে বেশীর ভাগই ছিলেন মুসলমান। তাদের ঘরের মায়েরাও 'স্বদেশী ছেলেদের' কত যত্নই না করতেন। তাঁদের মুখে প্রায়ই শুনতাম—'আহারে দুঃখিনীর পোয়া, তোরা আখেরে রাজা হবি। তোরার দুখ খোদার দোয়ায় ঘুচিব'।

শুনছি সেই রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের বাড়ি তাঁদেরই এক প্রজা জোর করে দখল করেছে। তারকেশ্বরদা'দের বাড়ি নিয়েও চলেছে সীমাহীন লোভের হানাহানি। আর স্বর্গীয় প্রসন্ন সেন মহাশয়ের পরিবারবর্গ আজ উদ্বাস্তু, পশ্চিমবঙ্গে সরকারের আশ্রয়প্রার্থী। শুধু ভাবছি নিয়তির এ কি কঠোর পরিহাস!

কিন্তু এমনতর তো ছিল না। ১৯৪৬ সালের বন্যায শহরের বাসা হতে গ্রামে চলেছি মায়ের কাছে। বেঙ্গুরা ষ্টেশনে পেঁ ৗছে দেখি, চলার পথ অথৈ জলের তলায় আত্মবিলোপ করেছে, চলাচল হচ্ছে 'সাম্পানে'। কিছুদূর চলার পর সাম্পানও আর চলে না। হেঁটে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই মাইলখানেক পথ। অবর্ণনীয় সেই দুঃখের ইতিহাস। অনভ্যস্ত পায়ে এগিয়ে চলেছি। সঙ্গে চাকর অমূল্য, তার মাথায় ভারী বোঝা। কাজেই তার সাহায্য পাওয়ার আশা বৃথা।

কিছুদূর গিয়েই পড়লাম এক চোরা গর্তে। বুক পর্যন্ত ডুবে গেলাম। কাপড়-চোপড় ভিজে জলে-কাদায় একাকার হয়ে গেল। ঠিক এমন সময় সহাস্য মুখে এগিয়ে এলেন নুর আহম্মদ দা। অতি কষ্ট করে আমায় পার করলেন সযত্নে। মাকে এসে সহাস্যে বললেন—'আখুড়ী, তোয়ার মাইয়া দি গেলাম—আঁয়ার লাই মিঠাই আন'।

মায়ের মুখের মিষ্টি হাসি—তাঁর হাতের সামান্য পুরস্কারই অসামান্য ছিল নুরদার কাছে। কিন্তু সেদিন কোথায় গেল?

কে জানে মহাকালের রথচক্রতলের এই নিষ্পেষণ কবে শেষ হবে? জানি শেষ হবে, হবে এই বিচ্ছিন্ন জাতির মিলন। বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমানের ভাষাগত কৃষ্টিগত ঐক্যের মধ্য দিয়ে সেই শুভদিন আবার আসবে।

খলঘাট

বৈশাখ মাস। গরমের ছুটির দেরী নেই আর। স্কুলে আসার পথে দেখে এসেছি বুড়াকালী বাড়ির ধারে দত্তদের বাগানে পাকা সিঁদূরে আম ঝুলছে। টিফিনের ছুটিতে দল বেঁধে ছুট্‌লাম কিশোর বন্ধুদের নিয়ে। আনন্দে মত্ত হয়ে আম পাড়ছি, এমন সময় আমাদের তেড়ে এল একটি লোক 'চোর! চোর!' বলে। যে-যার প্রাণ নিয়ে দৌড়লাম। কোঁচড়ে বাঁধা আমগুলো রাস্তায়, পুকুরে, ডোবায় পড়ে গেল। হাঁফাতে হাঁফাতে স্কুলের দরজায় এসে পৌঁছলাম। দেখলাম—সেই লোকটি দাঁড়িয়ে আছে, মুখে তার দুষ্টু হাসি। সে আমায় ইশারায় ডাকলে, ভয়ে ভয়ে তার কাছে গেলাম। লোকটি স্কুলের ছেলেদের পরিচিত, নাম 'তারা পাগলা', রাতদিন কালীবাড়ির সামনে বসে বিড় বিড় করে কি বলে, পুকুরে একগলা জলে নেমে একটির পর একটি ডুব দেয়, তারপর ভিজে কাপড়ে উঠে এসে আবার ঢোকে কালীমন্দিরের ভেতর। কোন কাজকর্ম নেই তার, খাওয়া-পরার ঠিক নেই, কথাবার্তায় সুস্থ মনের পরিচয় পাওয়া যায় না। স্কুলের ছেলেরা তাকে ক্ষ্যাপায়, সে ছুটে আসে তাদের মারতে।

'তারা পাগ্‌লা' আমায় ডাকল কেন—দূর থেকে জানতে চাইল আমার সহপাঠীরা।

অদূরে গাছ-তলায় বসে আমার হাতটি দেখে পাগ্‌লা বল্‌লে, এবার পরীক্ষায় তুই 'ফাষ্ট' হবি, ভাল করে পড়াশুনা করিস্‌, বুঝলি?

আমার পেছনে দাঁড়িয়ে আমারই একজন সহপাঠী জিজ্ঞেস করল, আমি?

পাগ্‌লা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলে, তুই সপ্তজন্মেও পাশ করতে পারবি না। কারখানার কুলি হবি তুই, তোর পড়ার দরকার কি?—

'তারা পাগলার' কথা সত্য হয়েছিল, সেকথা মনে পড়ছে আজ। কিন্তু সেদিন চপল কিশোরচিত্তের হাজার কথার মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল এই সাধকের ভবিষ্যদ্বাণী।

এই তারা পাগ্‌লাই তারাচরণ পরমহংসদেব হয়েছিলেন উত্তর কালে। তাঁর সাধনার পীঠভূমি বুড়াকালী বাড়ি পরিণত হয়েছিল হিন্দুদের পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে।

সত্যের মহিমায়, সাধনার গরিমায় এই সিদ্ধ মহাপুরুষের সাধনার ক্ষেত্র 'ধলঘাট' এমন করে ছেড়ে আসতে হবে তা কি জানতাম !

উত্তরে আর দক্ষিণে হারগেজী খাল টেনে দিয়েছে গ্রামখানির সীমারেখা। পশ্চিমে অবারিত মাঠ মিশে গেছে দিগন্তে, পূর্বে অনুচ্চ করেলডেঙ্গা পাহাড় আকাশের দিকে চেয়ে আছে স্থির নেত্রে। চারদিকে মাঠ আর সবুজের প্রাচুর্য।

একধারে নদী বয়ে চলেছে কুলুকুলু নাদে, আর একধারে পড়ে আছে ধু-ধু মাঠ, তার বুকের উপর দিয়ে এঁকে-বেঁকে অগ্রসর হয়েছে গ্রামের বিস্তৃত পথখানি। ছায়াঘন গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যায় ছোট্ট কুটির, মধ্যবিত্তের মাটির দোতলা কোঠা, সান-বাঁধানো ঘাট, গোয়াল, গোলা, পুকুর-দীঘি-বাগান, বাঁশঝাড়। যেন তুলি দিয়ে আঁকা। কোথাও এতটুকু আবর্জনা নেই, কোলাহল নেই, গ্রামবাসীরা মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে—মাঠে চাষ করছে চাষী, জেলে পুকুরে মাছ ধরছে, রাখালেরা বটগাছের তলায় বসে বাঁশি বাজাচ্ছে, কেউবা খেলছে ডাণ্ডাগুলি, কেউবা ব্যাটবল দিয়ে খেলছে ক্রিকেট, স্কুলের ছেলে-মেয়েরা বই বগলে করে ছুটছে স্কুলে, ব্যাঙ্কের প্রাঙ্গণে বসেছে সভা, হাসপাতালে রোগীরা দাঁড়িয়ে আছে ভিড় করে, পোষ্ট আপিসে পিয়নকে ঘিরে বসেছে গ্রামের লোকগুলো—খোঁজ করছে চিঠির, মণি অর্ডারের, দোকান-গুলিতে জমে উঠেছে আলাপ—রাজনৈতিক, সামাজিক, ঘরোয়া। বর্ষায় যখন চারদিক জলে ভরে যায়, তখন ছবির মত দেখায় গ্রামখানি। শরতে মাঠে মাঠে যেন সবুজের সীমাহীন রেখা, গ্রীষ্মে চোখে পড়ে ফাঁকা মাঠগুলো, বসন্তে গাছে গাছে ফুটে ওঠে নবযৌবনশ্রী।

নিরুপদ্রব একটানা জীবনযাত্রা চলছে আবহমান কাল ধরে। বর্ধিষ্ণু আমার গ্রামখানি। কিন্তু চিরকাল তো ছিল না তার এমন উন্নত অবস্থা। আমরা যখন ছোট ছিলাম—তখন দেখেছি আমাদের সামনের দীঘিটি জঙ্গলে আছে ভরে, রাস্তাঘাট অনুন্নত, স্কুলের গোড়াপত্তন হচ্ছে মাত্র, ব্যাঙ্ক হাসপাতাল-এর জন্ম তখনও হয়নি। আমাদের চোখের সম্মুখে গ্রামখানি গড়ে উঠেছে।

গ্রামকে শহরের সঙ্গে প্রতিযোগিতার উপযুক্ত করে তোলার উদ্দেশ্যে ক'জন নেতৃস্থানীয় লোক এলেন এগিয়ে। তাঁদের চেষ্টায় পল্লী সংস্কার আরম্ভ হল। অল্প কয়েক বছরের মধ্যে সৌন্দর্যে, শিক্ষায় দীক্ষায় সকল বিষয়ে আমাদের গ্রামখানি হল সেরা। অভাব বলতে ছিল না কিছুরই। শহরের সঙ্গে

যাতায়াতের সুবন্দোবস্ত আছে, রেলপথে মাত্র চল্লিশ মিনিটের রাস্তা, জলপথেও ঘণ্টাখানেক সময় লাগে। গ্রাম, তবু শহরেরই মত। তার চেয়ে বরং সুন্দর। গ্রামের মধ্যে অহিন্দুর বসতি নেই,কিন্তু চতুষ্পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের মুষ্টিমেয় মুসলমান ও অহিন্দুরা গৌরবের সঙ্গে এই গ্রামেরই অধিবাসী হিসাবে আত্মপরিচয় দেয়।

'বঙ্গবাণী', 'বাণীমন্দির', 'সাবিত্রী,' 'শৈলসঙ্গীত', 'সিন্ধুসঙ্গীত', 'স্বর্গে ও মর্ত্যে'র রচয়িতা কবি শশাঙ্কমোহন সেন-এর জন্ম এই ধলঘাট গ্রামে। Star of India' জগদ্বন্ধু দত্তের জন্মভূমিও ধলঘাট। দানবীর নিমাই দস্তিদার—চট্টগ্রাম শহরের Outdoor হাসপাতাল যাঁর অক্ষয় কীর্তি, তিনিও এখানকারই।

ছিপ্ দিয়ে মাছ ধরা এ গ্রামের বৈশিষ্ট্য। কানুর দীঘিতে, মাগনের দীঘিতে, ক্যাম্পের পুকুরে, পেস্কারদের দীঘিতে চারকাঠি বসিয়ে টঙ্-এর উপর বসে শিকারীরা মাছ ধরে। এক একটি মাছ যেন এক একটি জানোয়ার। ওজন দেড়মণ-দু'মণ। বিকেলে বড়শিতে আটকালে তাকে ডাঙ্গায় তুল্‌তে রাত হয়ে যায়। এত বড় রুই-কাতলা যে পুকুরে থাক্‌তে পারে এ ধারণা না দেখলে কেউ করতে পারে না।

একটা ঘটনা মনে পড়ে। শীতের দিন। কনকনে শীত পড়েছে। টঙের উপর বসে আছি ছিপ ধরে। হাটবার ছিল সেদিন। বেপারীরা, ক্রেতারা সব চলেছে দলে দলে। যেতে যেতে তারা মন্তব্য করছে, বাবুদের মাথা খারাপ, এমন শীতে কে কোথায় মাছ ধরেছে? পরিচিত লোক। বললাম, ফিরবার সময় এদিকে এসে দেখে যেয়ো কেমন মাছ ধরেছি।

বিকেলের দিকে সত্য সত্যই একটা মাছ লাগল। মণ খানেক হবে তার ওজন। বিরাট রুই। মাছটি তুলে খেজুর গাছের সঙ্গে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখলাম। হাট থেকে ফেরবার পথে লোকগুলো অবাক হয়ে দেখে বাড়ি ফিরল।

জমিদার এখানে নেই, আছে মধ্যবিত্ত। তারা বুকের রক্ত দিয়ে তাদের জন্মভূমিকে পুরুষানুক্রমে করেছে উন্নত। এখানে বাস করে কৃষক-গুণী-তাঁতী-মেথর-হাড়ি-ডোম—যারা শুধু নিজেদের ব্যবসা নিয়েই পড়ে থাকে না, দেশের পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা করবার সময়টুকু সকলেই করে নেয়। যারা নিরক্ষর তারাও রাজনীতি সম্বন্ধে দুকথা বলতে পারে, সকলের এ রাজনীতি সম্বন্ধীয় জ্ঞান এ গ্রামের বৈশিষ্ট্য। বারো মাসে তেরো পার্বণ এখানেও অনুষ্ঠিত হয় এ জেলার আর সব জায়গারই মত।

গ্রামের এমন পরিবেশের মধ্যে কোথাও উদ্বেগ নেই, অশান্তি নেই আছে পরস্পর সহযোগিতা, হিন্দু-মুসলমানে প্রীতি ও পল্লী উন্নয়নের সমবেত প্রচেষ্টা।

আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে যখন গ্রামখানি মাথা তুলে দাঁড়াল সকলের ওপরে, তখন হঠাৎ বৃটিশের রোষদৃষ্টি পড়ল গ্রামবাসীর ওপর। শহরের কাছাকাছি, মধ্যবিত্ত শিক্ষিত-সম্প্রদায়-প্রধান গ্রামখানি সন্ত্রাসবাদের একটি প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠল।

গভীর রাত্রি, সূচীভেদ্য অন্ধকার। রাত্রের অন্ধকারের বুক চিরে ফুটে উঠল একটি অস্পষ্ট আলোর রেখা। তারপর গুলীর আওয়াজ। একটি গুলী আমার কানের কাছে দিয়ে বোঁ করে উড়ে গেল। বুঝতে পারলাম না কিছুই। কিছুক্ষণ সব নীরব। তারপর একসঙ্গে শত শত গুলীর শব্দ। বাইরে আসা নিরাপদ নয়, তাই ঘরেই রইলাম।

সকাল হবার একটু আগে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম রাস্তায়। সশস্ত্র গুর্খা 'চ্যালেঞ্জ' করল। দারোগা সাহেব এলেন। বললেন, রাত্রিতে নবীন ঠাকুরের বাড়িতে ঘটনা ঘটেছে, ক্যাপ্টেন ক্যামেরণ সাহেব নিহত হয়েছে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণকারীদের একজন (নির্মল সেন) আত্মহত্যা করেছেন পালাতে না পেরে।

সকালে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এলেন। ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পরে সর্বপ্রথম হানা দিলেন আমাদের বাড়িতে। বললেন, আমাদের পরিবার এসব ফেরারী আসামীদের সঙ্গে জড়িত। খানাতল্লাসী হল পাড়ার পর পাড়ায়—সারা গ্রামখানিতে। তাতেও রেহাই পেল না নিরীহ গ্রামবাসীরা। চতুষ্পার্শ্বস্থ গৃহস্থদের উপর ধার্য হল পাঁচ হাজার টাকা পাইকারী জরিমানা। স্থাপিত হল চিরস্থায়ী ক্যাম্প, নির্যাতিত হল গ্রামবাসী। তবু কিন্তু এ গ্রাম ছাড়বার কল্পনা তারা করেনি কোনদিন। পূর্বপুরুষদের ভিটের মায়া কেউ কি ছাড়তে পারে?

বাঙলা বিভাগ হল। দলে দলে লোক ছেড়ে গেল তাদের জন্মভূমি। রেখে এল তাদের পূর্বপুরুষদের ভিটে-মাটি। প্রথম উত্তেজনা কমে গেলেই ফিরে আসবে তারা। সবাই চলে যাচ্ছে। একা নই আমি, স্ত্রী পুত্র-পরিবার আছে। তারা থাকতে চায় না আর। তাই বাধ্য হয়ে তাদের নিরাপত্তারই জন্য গ্রাম ছেড়ে আসার সঙ্কল্প করলাম। আপত্তি জানাল হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ সবাই। আমিন সরিফ, আজিজ মল্ল, ফরোক আহম্মদ—গ্রামের মধ্যে

যারা এখন মাতব্বর—একযোগে বললে, সত্যই আমাদের ছেড়ে চললেন? আমাদের এখানে তো কোন ভয় নেই।

দুঃখ হয়েছিল তাদের কথায়। তারা তো ছিল আমার আত্মীয়েরই মত চৌদ্দ পুরুষ ধরে, পরিবারের সঙ্গে শুভেচ্ছা ও প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ। তাদের আবার ভয় কিসের? চারদিককার অবস্থা তখন শান্ত। কিন্তু ভিড় খুব। তবু অতি কষ্টে রাত বারোটায় এসে পৌঁছলাম শিয়ালদা ষ্টেশনে।

সে আজ প্রায় আট বছর আগেকার কথা। সারাদিনের কর্মব্যস্ততার শেষে যখন অপরাহ্ণ হয় তখন মনখানি ছুটে যায় আমার সেই 'ছেড়ে আসা গ্রামে'। আমি কল্পনার চোখে দেখি আমাদের স্কুলের মাঠে ছেলেরা খেলছে মনের সুখে, বাড়ির সামনে দীঘিতে মাছ ধরতে বসেছে সুরেশ পুরোহিত,কালী-বাড়িতে ওঁকারগিরের আখড়ায় ভিড় জমে আসছে। পুকুরের পোনা মাছগুলো ঘাটে এসে সাঁতার কাটছে, বাগানের মালতীলতায় টুনটুনি পাখিগুলো বসে আছে তাদের নতুন নীড়ে, ঝাউগাছে বাসা বেঁধেছে চিলেরা, গোয়ালের গরুগুলো উঠানে ছুটোছুটি করছে, পোষা কুকুরটি দরজার সাম্‌নে বসে আছে লেজ গুটিয়ে, বিড়ালটি খাবার খুঁজে বেড়াচ্ছে এ-ঘর ও ঘর, বাগানের গোলাপ গাছগুলো ভরে আছে মুকুলে, লিচু গাছের উপর বসে কাক মনের আনন্দে ডাকছে—কা-কা। ফল-ভারে অবনত হয়েছে আম গাছের পত্রবহুল শাখা-প্রশাখা, পাকা কালো জাম বাতাসে ঝরে পড়ছে মাটিতে, রাস্তায় লোক নেই, কোথাও কোন শব্দ নেই, চারদিকে শ্মশানের নীরবতা। সন্ধ্যা হল, কালী-বাড়িতে বেজে উঠল কাঁশর-ঘণ্টা, জ্বলে উঠল আচার্যিদের বাড়িতে দু' একটি প্রদীপ, যুগীদের পাড়ায় খোল-করতালে হল সন্ধ্যার বন্দনা ··।

ফিরে আসতে চাইল না মন এখান থেকে। এখানকার প্রতিটি ধূলিকণার সঙ্গে যে আমার পরিচয় নিবিড়, অবিচ্ছেদ্য। এরা আমায় ডাকবে—এ তো স্বাভাবিক। কিন্তু পারি না তাদের সে ডাকে সাড়া দিতে। বুঝাতে পারি না অবাধ্য মনকে। আশা বলে তুমি তো ছিলে না গৃহহীন, একটি বিশাল বর্ধিষ্ণু পল্লীর সর্বত্রই ছিল তোমার গৃহ, তুমি তো ঘর-ছাড়া হতে পার না।

ভাবি, কোন্‌টা সত্য—আমার আশা, না আমার এ নির্মম বর্তমান?

ভাটিকাইন

পৃথিবীর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিনে যে দেশের মাটিকে আপন বলে জেনেছি, যে দেশের আকাশ আর বাতাসের সঙ্গে আমার শৈশবের প্রতিটি দিনের অনুভূতি একাত্ম হয়েছিল একদিন, আজ সেই জন্মভূমির সঙ্গে শেষ যোগটুকু ছিন্ন করে চলে এসেছি। পিতৃ পিতামহের ভিটে ছেড়ে দেশান্তরে পাড়ি জমিয়েছিলাম দিনের আলোতে নয়, রাত্রির অন্ধকারে। গোটা দেশটাই যেন রাত্রির তপস্যায় মগ্ন। দেশকে ছেড়েছি, কিন্তু দেশের মাটিকে তো আজও ভুলতে পারিনি। শরণার্থীর বেশে জীবনের প্রতি পদক্ষেপে আজ যে দুর্যোগের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি, এই দুঃসময়ে বড় বেশী মনে পড়ছে আমার জননী, আমার জন্মভূমি, আমার 'ছেড়ে আসা গ্রাম'কে। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পথে যাত্রা করেছি, দুঃখ বরণকেই জীবনের সহযাত্রী করে নিয়েছি, কিন্তু এই দুঃখের দিনে জন্মদুঃখিনী গ্রামের স্মৃতি-কথা লিখ'তে বসে এখনও আশা জাগে, এখনও মন বলে : 'সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালবেসে'।

জীবনের এক বিরাট স্থান শূন্য হয়ে গেছে বলে মনে হয়, পায়ের নীচ থেকে মাটি সরে গেছে। কোথাও মাথা গুজবার আশ্রয় নেই। কাউকে বলবারও কিছু নেই, বললেও কেউ যেন শুনবে না। এতগুলো লোক মরেছে কি মরবে বোঝা যাচ্ছে না। বোধ হয় এরা সকলেই মরবে, আজ না হয় কাল। কেবল কৃশাঙ্গি শাখা কর্ণফুলি বেঁচে থাকবে। বর্ষীয়সীর শব্দহীন হাস্যে নিজের নিস্তরঙ্গ স্বল্প জলে কুণ্ডলী পাকাবে।

নবীনচন্দ্র 'পলাশীর যুদ্ধে' যাদের জন্য অশ্রু বিসর্জন করেছিলেন, তারা বেঁচে আছে, তবে তারা নিজ হাতে কবি ও তাঁর কাব্যকে হত্যা করেছে।

ইতিহাস ক্ষমা করবে না জানি, কিন্তু ইতিহাসের দীর্ঘ ও বিচিত্র পথে বিচরণ করে সে প্রতিঘাত উপভোগ করবার জন্য আজকের কেউ বেঁচে থাকবে না। যে হাত আঘাত করে, সে হাত বরাভয় দেয়, এইরূপ অসঙ্গতি ইতিপূর্বে শোনা যায় নি। পৃথিবীর বয়স হয়েছে, বোধ হয় অন্তিমদশা ঘনিয়েছে।

কিন্তু কি বলছিলাম। জীবনের এক বিরাট স্থান শূন্য হয়ে গেছে মনে হয়।

যে মাটিতে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলাম, সে মাটি আজ আর আমার নয়, তা স্পর্শ করবার অধিকার আমার আর নেই !

চট্টগ্রাম।

একদিকে ঘন সন্নিবিষ্ট পাহাড়শ্রেণী, অন্যদিকে তরঙ্গায়িত বঙ্গোপসাগর, মধ্যে কৃষ্ণচূড়া গাছের ফুলে ভরা বিস্তৃত উপত্যকা। আজ যেন সব পুড়ে গেছে।

সীতাকুণ্ড থেকে চট্টগ্রামের সে এক অপূর্ব রূপ, যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল পাহাড় আর পাহাড়, পাহাড়শীর্ষে শুভ্র দেবালয়ে দেবতা 'চন্দ্রনাথ', ক্রোড়ে প্রলয়ের প্রতীক্ষায় ত্রিশূলধারী বিরূপাক্ষ, নিম্নে নিস্তেজ স্বয়ম্ভুনাথ মর্ত্যের মানুষের অতি নিকটে বলে রুদ্ররূপ ত্যাগ করেছেন, আরো নীচে পূতসলিলা মন্দাকিনী, অনাদিকাল হতে কলস্বরে বয়ে যাচ্ছে। পুরাণে এই স্থানকে চম্পকারণ্য বলা হত। উত্তরে অনাবিষ্কৃত পাহাড়-চূড়া, সহস্র ধারায় জল ঝরে পড়ছে। বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই, জল পড়ে পড়ে মাটি পাথর হয়ে গিয়েছে। আবার পাহাড়-গাত্রে স্থানে স্থানে অগ্নিশিখা, এর গর্জনকে স্থানীয় হিন্দুরা গুরুধ্বনি বলে। দক্ষিণে বাড়বানল। সীতাকুণ্ড থেকে পাঁচ মাইল দূরে ঘন অরণ্যের মধ্যে শিববিগ্রহ ও পাতালস্পর্শী জলকুণ্ড টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছে, অথচ ডুব দিলে দেহ শীতল হয়।

চন্দ্রনাথের মন্দির থেকে এক সঙ্কীর্ণ সর্পবহুল গিরিপথ দক্ষিণদিকে নেমে গিয়েছে। তীর্থযাত্রী দল ঐ রাস্তা দিয়ে নেমে যায়। যক্ষপুরীর মত অন্ধকার সে পথ। পথ হাতড়িয়ে চলতে হয়। মাঝে মাঝে শাবকসহ কোন বিচ্ছিন্ন ব্যাঘ্র দম্পতীকে চলে যেতে দেখা যায়। এর নাম পাতালপুরী। স্মরণাতীতকালে কোন্ মহাপ্রাণ হিন্দু রাজা এই মন্দির নির্মাণ করেছিলেন জানা যায়নি। মন্দিরের অধীশ্বরী কালী, মাথা নীচে ও পা উপরের দিকে করে পূজারীদের দিকে পিছন ফিরে আছেন। এ এক অপূর্ব মূর্তি। বহু শতাব্দী পূর্বে আবির্ভূতা হয়েছেন এ দেবী, অথচ মর্ত্যের মানুষের মুখ দর্শন করেননি।

কুমিড়া, ভাটিয়ারী ও ফৌজদারীর হাট ছাড়াবার পর পাহাড় যেন দূরে সরে গিয়েছে। এইখানে কৃষ্ণচূড়া ফুল শোভিত ঢালু জমি। নাম পাহাড়তলী। এ, বি, রেলওয়ের কলকারখানা, লোকোশেড, মালগুদাম, ইঞ্জিন মেরামতের কারখানা, ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের দপ্তর। তারপর চট্টগ্রাম ষ্টেশন। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড এখানে ঈষৎ উচ্চে, পাহাড়তলী থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত রাস্তাটা

উঁচু হয়ে এসেছে। বাটালি পাহাড়পার্শ্বে সঙ্কীর্ণ গিরিপথের নাম টাইগার পাশ। এইখান থেকে বড় পল্টন, ইউরোপীয় ক্লাব ও লাটসাহেবের কুঠি পর্যন্তও ছোটখাটো টিলায় অসংখ্য বাংলো। আগে এখানে সরকারী বড় সাহেব, মার্চেন্ট আফিস ও রেলওয়ের সব বড় কর্তারা থাকতেন। আজ তাঁরা সাগর পাড়ি দিয়েছেন। যাবার আগে কার সর্বনাশের পথ প্রশস্ত করে গেছেন, ইতিহাস একদিন তার বিচার করবে।

সেকালে চরচাকতাই থেকে নৌকাযোগে কর্ণফুলি দিয়ে আমাদের গ্রামে যেতে হত। প্রাচীন পল্লী ভাটিকাইন। বড় কর্ণফুলি ও তার নিস্তরঙ্গ শাখা ধরে সেনের-পোল, সাইরার পোল, চন্দ্রকলা পোল ও ইন্দ্রপোল হয়ে এসে নুরন্নবী মাঝির নৌকা থামত। দুরন্ত বর্ষায় বড় কর্ণফুলির জল যখন দলিত মথিত হত তখনও বৃদ্ধ নূরন্নবীকে অসীম সাহসে দাঁড় টেনে নৌকা নিয়ে যেতে দেখেছি। আমরা শহরেই থাকতাম, মাঝে মাঝে পাল-পার্বণে বাবার সঙ্গে গ্রামে যেতাম। ইন্দ্রপোল ছাড়িয়ে আরও দূরে নৌকা থামত। নৌকা থেকে নেমে বকাউড়া বিলে গিয়ে উঠতাম। জ্যোৎস্না রাত্রে ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাকি ভীড় করত বকাউড়া বিলে। মাঝে মাঝে দেখা যেত হারগেজা ফুলের ঝাড় আর প্রাচীন মগেদের চিতা।

বিল ছাড়িয়ে গ্রামের রাস্তা ধরতাম। প্রথমেই শ্মশান-কালীর হাট, দুধারে ঘন বাঁশঝাড়, বাঁশপাতা পড়ে রাস্তার কতকাংশ একেবারে ঢাকা পড়ে গেছে। গ্রামের হাইস্কুল ছাড়িয়ে আমাদের বাড়ি। গ্রামবাসী এবং নিকটবর্তী গ্রামের বহু লোক আমাদের বাড়িকে সরীর বাপের বাড়ি বলত।

সরী ওরফে সরলা আমার বড় পিসিমার নাম। জনশ্রুতি সাতটি সন্তানের অকাল মৃত্যুর পর পিসিমার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটে এবং তিনি পিতৃগৃহে চলে আসেন। পিতৃগৃহে তখন কেউ ছিলেন না, কর্মসূত্রে সকলেই তখন চট্টগ্রাম শহরে। পিসিমা নাকি একাকী একটি বাতি জ্বেলে ভিতরের দিকের বারান্দায় অনেক রাত্রি পর্যন্ত সুর করে রামায়ণ, মহাভারত পড়তেন। অন্ধকার মধ্যরাত্রে সেই গৌরবর্ণা দীর্ঘাঙ্গী সরলাকে চক্রবর্তীদের পোড়ো বাড়িতে একাকী ঘোরাফেরা করতে দেখে পথচারী কেউ চমকে উঠত কিনা জানা যায়নি। শনি, মঙ্গলবারের মধ্যরাত্রে সরীর বাপের বাড়ির পানা পুকুরের অভ্যন্তর থেকে প্রেত পূজার কাঁশর-ঘণ্টা ধ্বনি রামায়ণ পাঠরতা সরলাকে আদৌ বিচলিত করত কিনা সে

সংবাদও জানা যায়নি। সকলি আজ বিস্মৃতির গর্ভে লীন। কেবল তেঁতুল ও দীর্ঘশির ইন্নালুর ডালে ডালে শাখা কর্ণফুলির উদাস বাতাস মৃত চক্রবর্তীদের নাম নিয়ে আজও লুটোপুটি খায়।

ভাটিকাইন অথবা ভট্টিখণ্ড, যাই হক না কেন, তাহাতে কিছু আসে যায় না। আমাদের গ্রামের নাম ভাটিকাইন। ভাটিকাইন থানার এক মাইলের মধ্যে বহু বর্ধিষ্ণু হিন্দুর বাস ছিল গ্রামে। আমাদের বাড়ি ব্রাহ্মণপাড়ায়, হরদাসবাবুর বাড়ির পার্শ্বে। হরদাসবাবু জ্ঞানবান ও ধার্মিক লোক ছিলেন। তাঁর বাড়িতে অষ্টপ্রহর কীর্তন হত। যত দূর মনে পড়ে তাঁর বাড়ির ভিতর ও বাইরের উঠানে সম্বৎসর সামিয়ানা খাটান থাকত। উঠান জুড়ে সতরঞ্চি পাতা, বাইরের পুকুর পাড় পর্যন্ত লোক বস্‌ত। ঝুড়ি ঝুড়ি ভোগ হত ঠাকুরের। খাঁটি গাওয়া ঘিয়ের গন্ধে সুরভিত হয়ে যেত চার দিক।

শুধু হরদাসবাবুরই যে স্বাচ্ছল্য ছিল তা নয়, গ্রামবাসী প্রায় সকলের ঘরেই যেন লক্ষ্মী বাঁধা থাকতেন। চাল কিনে খেত এরকম লোককে লক্ষ্মীছাড়া বলা হত এবং সেরকম কেউ গ্রামে ছিল বলে জানা যায় নি।

মামার সঙ্গে কর্ণফুলিতে মাছ ধরতে যেতাম। সেজন্য আমাদের ভাইদের আগ্রহের অন্ত ছিল না। চন্দ্র অস্ত যাবার পূর্বেই তিনি জাল নিয়ে বের হতেন। আমরা জেগে থাকতাম। মামার সঙ্গে গিয়ে ডুলা ধরব। পিছনের বাড়ির সিরাজুদ্দিন ভুঞার ছেলে বসিরও আমাদের সঙ্গে যেত। নগেন্দ্রকাকা, মামা, আমি, দাদা, বসির ও ওয়াজ্জারগোলার নূরমহম্মদ রাত থাকতে বাড়ি থেকে বের হতাম। বাবা বাড়ি থাকলে আমরা যেতে পারতাম না। মা কিছু বলতেন না। কেবল দিদি জেগে থাকলে সঙ্গে যাবার জন্য বায়না ধরতেন। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তায় উঠে মরা শ্রীমতীর পোল পার হয়ে বকাউড়া বিলের রাস্তা ধরতাম। হঠাৎ বৃষ্টি নামলে গ্রামের প্রাইমারী স্কুলের চালায় গিয়ে দাঁড়াতাম। তারপর বৃষ্টির ঝাপ্‌টা কমে গেলে স্কুলঘর থেকে বের হয়ে ওয়াঙ্গেদারদের বাড়ি ছাড়িয়ে যেতাম। নগেনকাকা বলতেন, ঐ দেখ দুমুখো 'খাইনি' সাপ ঘুরছে। বসির বলত 'জঠিয়া' সাপ। মামা বলতেন, বিলের মুখে 'কালন্দর' সাপ আছে। তাতেও আমরা নিরস্ত হতাম না। মরা শ্রীমতীর পোল পার হয়েই বিলে নামতাম। তারপর বৃষ্টির জলে, ঠাণ্ডায়, বিড় বিড় করতে করতে সকলে মিলে খালে জাল ফেলত। বাটা, হন্দরা, পোপা, লোঠিয়া, ইচা,

খোরশুলা, বেলে, গলদা ও বাগদায় নিমেষে ডুলা ভরে যেত। সকালে বাড়ি ফিরে মাছ ঢাললে উঠানের একাংশ সাদা হয়ে যেত।

প্রতি বৎসর কাকার বাড়িতে ভাটিকাইনে যাত্রাদলের গান হত। বিজয়-বসন্ত পালা হবে। এই উপলক্ষে গ্রামে সাড়া পড়ে গেছে। ষ্টেজ বাঁধা হয়েছে। আবদুল আজিজ মৌলবীর বাড়িতে দুইটি বড় দেওয়ালগিরি আছে। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সেগুলি পাঠিয়ে দিয়েছেন। সন্ধ্যা থেকেই তিন গাঁয়ের লোক আসতে আরম্ভ করবে। উঠান জুড়ে ত্রিপল ও সতরঞ্চি পাতা হয়েছে। দেখতে দেখতে উঠান ভরে গেল। সদরের বাইরে সাময়িকভাবে পান-সিগারেট ও চায়ের দোকান বসেছে। সুদৃশ্য বালকের দল রংচং-এ পোশাক পরে সখী সেজে ষ্টেজের ওপর গান ধরেছে—'শাখে বসি পাখী করে গান'।

বহু দিনের কথা। শঙ্খ ও হালদা নদীকে তবুও ভুলি নি। কর্ণফুলির পাশে পাশে সেগুলি আজও বয়ে চলেছে। সেই হাটহাজারি, ফটিকছড়ি, রাঙ্গা মাটির দেশ, শান্ত সমাহিত পাহাড় ক্রোড়ে নাক চ্যাপটা মগ ও চাকমা শিশুর দল। সেই চন্দ্রনাথ পাহাড়, পাতালকালীর সহস্র ধারা। সেই ভাটিকাইন যাত্রাদলের গান, চকমকে পোশাক পরে গ্রামের বড় অভিনেতা চন্দ্রকুমার আসরে উঠেছে। সবই মনে আছে। কিছুই ভুলি নি।......

তবে এই কলিকাতায় আমি আজ বাস্তহারা! রিলিফ ক্যাম্পে বাস করি। ক্যাম্পে কয়েকজনের কলেরা হয়েছে। সকালে একটি বাস্তহারা শিশু বসন্তে মারা গেছে। সে সময়েই এক মুঠো মোটা চিড়ে পেয়েছি। রিলিফবাবুর কাছে যেতে সাহস হয় না। কিছু বলতে গেলেই তিনি ক্ষেপে ওঠেন।

কেন এমন হল, সে প্রশ্ন আমি করি না। মাটির তলা থেকে মৃতের দুর্গন্ধ ওপরে ভেসে আসে কিনা জানি না, জানলে হয়ত বেশী করে মাটি চাপা দিয়ে আসতাম। আসবার সময় নূরম্বরীর নাতির নৌকাখানা চেয়েছিলাম; রাত দুপুরে শ্মশানকালীর হাটের কাছে নৌকা ভিড়াতে বলেছিলাম। সেও যে বিগড়ে গেছে, আগে তা বুঝতে পারিনি। অন্ধকারে পা টিপে টিপে পটিয়া পেরিয়ে চক্রদণ্ডী আসি। শেষ রাত্রে হরিচরণের দীঘির ধার দিয়ে আসবার সময় কয়েকটি কুলবধূকে মরাকান্না কাঁদতে শুনেছিলাম। অদূরেই দাউ দাউ আগুন জ্বলছিল। সেই আলোয় পথ চিনে চিনেই চলে এসেছি।

অনেকে আসতে পারেনি।

গোমদণ্ডী

সৌন্দর্যের প্রতীক চট্টলা। প্রকৃতির লীলানিকেতন শৈলকিরীটিনী, সাগর-কুন্তলা, সরিৎমালিনী, কবিধাত্রী চট্টগ্রাম ভারতের জাতীয় ইতিহাসে উজ্জ্বল অক্ষরে সাক্ষী হয়ে আছে। মাঝে মাঝে জীবন সংগ্রামের তপ্ত ঝড় চট্টলার বুকে উঠলেও সে ঝড় শান্ত হয়ে একদিন শান্তির নিবাস হয়েই দেখা দিত। সমুদ্র-বেষ্টিত উর্মিমালার মাথায় মাথায় প্রাণের স্পন্দন আসত ভেসে। চিরচঞ্চল ঢেউ মানুষকে ইঙ্গিত জানাত এগিয়ে চলার। স্থাণু হয়ে বসে থাকার অর্থ ই হল মৃত্যু—চট্টগ্রাম তাই কখনো মৃত্যুর সাধনা করেনি, সাধনা করেছে প্রাণের, সাধনা করেছে শির উন্নত করে বাঁচার মত বাঁচার। সে মন্ত্রের পূজারী ছিল প্রতিটি মানুষ, তাই চট্টগ্রাম বিপ্লবী সৈন্যের জন্মদাত্রী হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছে। এই চট্টগ্রামেরই বিখ্যাত কবি নবীন সেন তাই বলেছিলেন—

"ভারতের তপোবন ! পাপ ধরাতলে
স্বরগের প্রতিকৃতি।"

সত্যিই জায়গাটি ছিল স্বর্গের মত। ভারতবর্ষের তপোবন বলতে যদি কোন জায়গাকে বুঝতে হয় তা হলে এই চট্টগ্রাম ! আজ তার কঙ্কাল ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই ভেবে কান্না পায়। বিরাট ঐতিহ্য লুপ্ত হয়েছে, বৃহদারণ্যের মৃত্যু হয়েছে ! এই চট্টলারই এক নিভৃত পল্লীতে আমার জন্ম। গোমদণ্ডী আমার জন্মভূমি। অখ্যাত-অজ্ঞাত গণ্ডগ্রাম হলেও গোমদণ্ডী ঐতিহাসিক চট্টগ্রামেরই অংশ, অমৃতের উৎস। ইতিহাস থেকে যেটুকু জানা যায় তাতে দেখা যায় বর্গীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আমাদের পূর্বপুরুষ মাধবচন্দ্র মজুমদার মহাশয় প্রায় দু'শ বছর আগে বর্ধমান থেকে চট্টগ্রামে গিয়ে শঙ্খনদীর উত্তরে সুচিয়া গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। পরে সেখানে স্থানাভাব হেতুই হোক বা অন্য কারণেই হোক মাগনদাস চৌধুরী তাঁর খামারবাড়ি গোমদণ্ডী গ্রামে চলে আসেন এবং নির্মাণ করেন তাঁর ভদ্রাসন। শিক্ষায় দীক্ষায় উচ্চাঙ্গের না হলেও গ্রামখানি ছিল পল্লীশ্রীর এক অফুরন্ত ভাণ্ডার, পশ্চিম প্রান্তে কর্ণফুলি নদীর ডাক, দক্ষিণে রায়খালী খাল, উত্তরে ছনদণ্ডী খাল গিয়ে মিশেছে সূর্যাস্তের

রঙে রাঙা কর্ণফুলিতে। গ্রামখানির চতুঃসীমা চারটি প্রকাণ্ড দীঘি দিয়ে ঘেরা। প্রকৃতিদেবী পাহাড়-পর্বত, সাগর-নদী, দীঘি দিয়ে সতর্কতার সঙ্গে চট্টগ্রামকে ঘিরে রেখে শত্রুর হাত থেকে আমাদের রক্ষা করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সে চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হল! ঘরের মধ্যে যে বিভেদ এল, তার আঘাতেই আমরা পড়লাম ছড়িয়ে। কুসুমে কবে কীট প্রবেশ করেছিল তার সংবাদ রাখিনি, ফুলের ঘ্রাণ নিতেই ছিলাম মত্ত! মনে হয় সেই ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের মধ্যে দিয়েই বিষাক্ত কীট প্রবেশ করেছে মনে, তারপর কুঁড়ে কুঁড়ে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে অন্তঃকরণকে, সে সর্বনাশের খবর পেলাম বহু দেরীতে! এত সতর্কতা সত্ত্বেও শত্রুর হাত থেকে আমরা বাঁচলাম কই? যে দুষ্ট কীট আমাদের নীচে নামিয়েছে সে কীটের সন্ধান কি আজো আমরা পেয়েছি?

আজ গ্রামছাড়া হয়ে গোমদণ্ডীকে ভাবতে ইচ্ছে করছে! মনে পড়ছে সেই ছায়াঢাকা, পাখিডাকা গ্রামখানিকে বার বার। অর্ধশতাব্দীর সুখ-দুঃখের স্মৃতিবিজড়িত গ্রামখানিকে কোন দিন এমন ভাবে ছেড়ে আসতে হবে কল্পনা করিনি, তাই বোধ হয় সেই স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির স্মৃতি ইচ্ছে করেও ভুলতে পারছি না। দিনরাত মনের এক অজ্ঞাত ক্ষতস্থান থেকে যন্ত্রণা উঠছে বুঝতে পারি, কিন্তু করার কিছুই নেই। তাই মাঝে মাঝে নির্জনে অশ্রুবিসর্জন করে মনের বেদনা ভুলতে চেষ্টা করি মাত্র।

জীবনভরা যাদের ছিল হাসি আজ কান্নাই তাদের সম্বল! দুঃখের পাঁচালী গেয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে চলেছি ছুটে, জানি না এ চলার শেষ কোথায়। একবার বর্গীদের হামলায় দেশত্যাগী হয়েছিলেন আমার পূর্বপুরুষ, আজ ভ্রাতৃবিরোধে আমি হলাম যাযাবর। বর্ধমান থেকে চট্টগ্রামে গেছেন পূর্বপুরুষগণ প্রাণ বাঁচাতে, আমি চট্টগ্রাম থেকে আবার বর্ধমানের কোলে এসেছি আশ্রয় এবং খাদ্যের ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে! কপালের লেখা হয়তো একেই বলে! ভাই ভাই-এর ঝগড়া যে এমন সর্বনাশী প্লাবন আনে জানতাম না। মানুষের দুর্ভাগ্য, মানুষের দীর্ঘশ্বাস শুনে ঈশ্বরকে স্বভাবতই প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে:

'হে বিধাতঃ! কোন্ পাপ করিল সে জাতি?
কেন তাহাদের হল এত অবনতি?'

প্রকৃতির অফুরন্ত সৌন্দর্য দিয়ে ঘেরা আমার গোমদণ্ডীর চারিদিক শুধু সবুজের মেলা। ছুটি উপলক্ষে শহরের কৃত্রিম পরিবেশের মায়া কাটিয়ে যখন গিয়ে

পল্লী-জননীর শ্যামল কোলে প্রথম আশ্রয় নিতাম তখন ভুলে যেতাম নগর-জীবনের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট। জীবনের সমস্ত দৈন্য-গ্লানি যেন এক মুহূর্তে ধুয়ে মুছে যেত, পল্লীমায়ের সোনার কাঠির স্পর্শে পেতাম জীবনের নতুন সাড়া। ভাদ্র-আশ্বিন মাসে দুকূল প্লাবিত কর্ণফুলি দিয়ে সাদা পালের নৌকোয় চড়ে গ্রামে যাওয়ার সময় দুপাশের ধানক্ষেতে চোখ পড়লেই প্রবাসীর মন রোমাঞ্চ হয়ে উঠত।

অন্ন বস্ত্রের জন্যে নগরের যান্ত্রিক সভ্যতার চাপে যখন শরীর মন অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখনই মন বিদ্রোহ করে দেশে ফিরে যাবার জন্যে। অস্থির হয়ে পড়ি পল্লীমায়ের স্নেহশীতল ছায়ায় নির্বিঘ্ন জীবন যাপন করতে। তখনই মনে বড় হয়ে প্রশ্ন জাগে,-আর কি ভাগ্যে জন্মভূমি দেখা ঘটে উঠবে না, আর কি কোনদিন ফিরে যেতে পারব না আমার সেই নিভৃত কুটিরে? ছোট ছেলেটা দেশে ফেরার বায়না ধরলে আর অশ্রু চেপে রাখতে পারি না! নিজেকে অভিশপ্ত বলে ধিক্কার দিই বারবার। মাঝে মাঝে কোন কোন সময় অতীতের চিন্তায় বিহ্বল হয়ে পড়লে কেবলি যেন পল্লীমায়ের স্নেহব্যাকুল আহ্বান শুনতে পাই,— 'ওরে আয়রে ছুটে আয়রে ত্বরা—' কিন্তু ছুটে কোথায় যাব? পৃথিবীর আহ্নিক গতির সঙ্গে ছুটে ছুটে প্রাণ তো কণ্ঠাগত হয়ে উঠল, তবুও তো কোন আশ্রয় মিলল না আমাদের! শ্রমের পর বিশ্রাম না মিললে প্রাণধারণই হয়ে ওঠে অসম্ভব, কিন্তু আমরা তো শুধু শ্রমই করে চলেছি, বিশ্রামের সময় আসবে কখন?

আজ চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে গ্রামখানি উঠেছে ভেসে। মন আমার আজ বেদনাবিধুর হয়ে শুধু স্মৃতিরই রোমন্থন করে চলেছে। আমার গোমদণ্ডীর বিস্তৃতি ছিল দৈর্ঘে সাড়ে চার মাইল আর প্রস্থে আড়াই মাইল। বিদেশ থেকে গ্রামে চিঠিপত্রাদিতে দত্তপাড়া, দক্ষিণপাড়া, স্বুবর্ণবণিকপাড়া, বড়ুয়াপাড়া, বহদ্দারপাড়া ইত্যাদি বলে চিহ্নিত না করলে অনেক সময় প্রাপকের কাছে চিঠি পোঁছে দিতে পিয়নদের হিমশিম খেতে হত। গ্রামটিতে উচ্চ শিক্ষিত লোকের সংখ্যা খুব বেশী না হলেও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী, উকিল-মোক্তার, সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষক, রেলকর্মচারীর সংখ্যা বড় কম ছিল না। হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান প্রভৃতি সমস্ত সম্প্রদায়েরই বাস ছিল। সপ্তপুরুষ যেখানে মানুষ সেই সোনার চেয়ে দামী আমার গ্রামখানি আজ কোথায় গেল হারিয়ে? কোথায় গোমদণ্ডী আর কোথায় আজ আমি?

সবুজধানের ক্ষেত, আম-কাঁঠালের ও সুপারিকুঞ্জ ঘেরা বিরাট গ্রামখানির অনবদ্য শ্যামলশোভা মনকে আজও সরস করে তোলে। চারিদিকে থৈ-থৈ জলে যখন মাঠ যেত ডুবে, জোয়ারের জল নদীর কানায় কানায় যখন উঠত ভরে, তখন সেই দৃশ্য দেখে আনন্দের উচ্ছ্বাসে ভেসে যেতাম। পুজোর ছুটিতে যখন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে বড় দীঘির পাড়ে বসে পূর্বদিকের দূরবর্তী পাহাড় শ্রেণীর দিকে তাকাতাম, দীঘির কাকচক্ষু স্ফটিক জলের সুদূরপ্রসারী হাওলা বিলের জলে কুমুদকহ্লার শোভিত সবুজ ধানের দোলন দেখে কবির সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়েই যেন বলেছি বহুবার ঃ

> 'এমন স্নিগ্ধ নদী কাহার ? কোথায় এমন ধূম্রপাহাড় ?
> কোথায় এমন হরিৎ ক্ষেত্র আকাশতলে মেশে ?
> এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে ?'

এই স্মৃতির সঙ্গে মিশেছে শৈশবের ভুলে যাওয়া দুষ্টুমীর কথা। মনে পড়ছে ছোটবেলায় সমবয়সীদের সঙ্গে দল বেঁধে পুকুর থেকে পদ্মফুল তোলা, জেলেদের ভাড়াটে নৌকো করে জলেভরা খালবিল অতিক্রম করে বেড়াতে যাওয়ার কথা, বনভোজন, খালের ওপর থেকে কাঠের পুলের রেলিং-এ বসে নানান আজগুবি গল্পগুজব, পুলের নীচে দিয়ে মাঝিদের ছই দেওয়া নৌকোয় ছোট ছোট ঢিল ছুড়ে মারা, পুল থেকে ঝপাং করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়া, এমনি আরো কত কি। ফুটবল খেলার অনুশীলন উপলক্ষে হাতাহাতির কথাগুলি আজও মনের মানচিত্রে জলজ্বল করছে। জানিনা কোন্ অভিশপ্ত জীবন নিয়ে আমরা সুজলা সুফলা পূর্ববংগে জন্মগ্রহণ করেছিলাম, জানিনা কোন্ বিধিবিড়ম্বায় এমন স্বর্ণপ্রসূ জন্মভূমি ত্যাগ করে আমাদের সর্বহারা হয়ে চলে আসতে হল ! কিন্তু তবু মনে হয় এ চলে-আসা আবার দেশে ফিরে যাওয়ার ভূমিকামাত্র—আমাদের এই আসা চিরতরে আসা নয়।

মনে পড়ে বারোয়ারী পুজোর সময় ছেলেমেয়েদের উদ্দাম আনন্দের কথা। বৃদ্ধরাও সে আনন্দের অংশীদার হতে দ্বিধাগ্রস্ত বা লজ্জাবোধ করতেন না। পুজো উপলক্ষে গ্রামে থিয়েটার, যাত্রা, কবিগান, গাজীর গান ইত্যাদি শোনার জন্যে গ্রামের ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের অধিবাসীরা উৎসুক হয়ে থাকত। দূরদূরান্তর থেকে পদব্রজে এবং নৌকো করে বহু শ্রোতা আসত গান শুনতে। সে শ্রোতার জাতিভেদ ছিল না—সেখানে হিন্দুর চেয়ে বেশী

উৎসাহী ছিল মুসলমান ভাইয়েরা। সকলে সমান অংশীদার হয়ে তদারক করত আসর,—গানের অর্থবোধ করে কাঁদত সকলেই সমানভাবে। সেখানে কে কার দুঃখে কাঁদছে সেটা বড় কথা ছিল না, বড় ছিল দরদীমন, বড় ছিল দুঃখবোধের উপলব্ধি। আজ সে নিষ্পাপ মন পরিবর্তিত, আজ অন্য সম্প্রদায়ের দুঃখে অশ্রু বিসর্জন করা যেন লজ্জার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে! কেন এমনটি হল? কেন মানুষ তার দরদ হারিয়ে অমানুষে পরিণত হয়েছে, কেন গড়ে তোলা হল বিপদের এই বেড়াজাল? এ বিপদের বেড়াজাল কি ছিন্ন করা যায় না সমস্ত দুঃখিত-অবহেলিত মানুষের সামগ্রিক চেষ্টায়?

মনে পড়ে দক্ষিণ পাড়ার সুন্দরবলী, গোলামনকী ওরফে নকীবলী, ফতে আলী, গোপীচৌধুরী, ভৈরব দত্ত, তারিণী দে, কালী সিং, প্যারী সিং, রামগতি সিং ইত্যাদি পালোয়ানদের অদ্ভুত সব গল্পের কথা। সুন্দরবলীর বহু শক্তির কথা আজও লোকের মুখে মুখে শোনা যায়। সে নাকি প্রায় চল্লিশ বছর আগে যৌবনে পথের মধ্যে ঝড়ে নুযেপড়া দুটি কাঁচা বাঁশ মুচড়িয়ে গ্রন্থি দিয়ে পথের পাশে সরিয়ে রাস্তা চলাচলের বিঘ্ন দূর করে দিয়েছিল। আর একবার বাড়ি থেকে নৌকোযোগে কর্ণফুলি নদী পার হওয়ার সময় মুসলমান মাঝির সঙ্গে দাঁড় টানা নিয়ে বাদানুবাদ হওয়ার পর অগত্যা নিজে দাঁড় টানতে বসে এবং দু-চারটে টান দেবার পরই অমন মজবুত দাঁড় পাটকাটির মত ভেঙ্গে দুটুকরো হয়ে যায়! এর ফল হয় আরো ঘোরালো, মাঝি প্রচণ্ড রেগে অকথ্য গালাগালি দিয়ে অন্য দাঁড় টানতে বাধ্য করে তাকে। আস্তে আস্তে সুবোধ বালকের মত দাঁড় টেনে তীরে পেঁাছে ক্রুদ্ধ সুন্দরবলী মাঝিকে একটু শিক্ষা দেবার অভিপ্রায়ে মাঝিসমেত নৌকোটি দুহাতে তুলে কুলে উঠে পড়তেই মাঝির অন্তরাত্মা খাঁচা ছাড়ার উপক্রম হয়। ঈশ্বরের নাম জপতে জপতে সে সুন্দরবলীর হাতে পায়ে ধরে কোনক্রমে সে যাত্রা রক্ষা পায়! আর সব মল্লবীরদেরও অনেককে আমি নিজের চোখে দেখেছি, তাদের দৈর্ঘ-প্রস্থ ছিল সমান। চেহারা দেখলে চোখ ফেরানো যেত না। হাতের থাবা ছিল বাঘেব মত। বাক্যবলের চেয়ে তারা বাহুবলেরই ছিল পূজারী। গোপী চৌধুরী এত স্বাস্থ্যবান ছিল যে মাইল পঞ্চাশেক সে অনায়াসেই হেঁটে পাড়ি দিত অম্লানবদনে। আজ তারা কোথায় জানি না, —কিন্তু সেদিন তারাই ছিল গ্রামের প্রহরী, গ্রামের রক্ষাকর্তা। তারা থাকতেও গ্রামের মধ্যে বিভেদ, বাইরের লোকের চক্রান্ত প্রবেশ করল কি

করে ? মল্লবীরদের মধ্যে তো কোনদিন জাতিভেদের কুৎসিত হানাহানি দেখিনি। তাদের নিজেদের মধ্যে আত্মীয়তা ছিল এক ওস্তাদের শিষ্য বলে। কোথায় সুন্দরবলী, কোথায় গোপী চৌধুরী ? বিপদের দিনে তারা কি 'গুরুজী কী ফতে' বলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাম্প্রদায়িক পশুটার গলা টিপে ধরতে পারত না ?

গ্রামের জাগ্রতা দেবী জ্বালাকুমারীর মন্দিরে ভক্তিভরে কতশত ভক্ত 'হত্যা' দিয়েছে, প্রাণনিঙ্ড়ানো অর্ঘ্য দিয়েছে। তিনিও কি জ্বালা নিবারণ করতে পারেন না আজকের মূঢ় মানুষের ? কেন সবাই নির্বাক, কেন শান্তির স্বপক্ষে কারো স্বর উঠছে না আজ ?

বছর পঞ্চাশ পূর্বে বহু শ্রমসহকারে 'সুহৃদ পাঠাগার' নামে একটি পাঠচক্র স্থাপন করেছিলাম, আজও মন পড়ে আছে সেই পাঠাগার ভবনে। এর প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে একজন সত্তর বছরের বৃদ্ধও রয়েছেন বেঁচে, তিনি আজও গ্রামের মাটিতেই আটকে রয়েছেন খবর পেয়েছি। মাটির মায়া তাঁকে অবশ করে রেখেছে, তাঁর মত দেশপ্রাণের সাক্ষাৎ আজ কজনের মধ্যে দেখতে পাই ?

রেলস্টেশন থেকে জেলা বোর্ডের রাস্তাটি সোজা চলে গিয়েছে পোপাদিয়া গ্রামের বুক চিরে কালাচাঁদ ঠাকুরবাড়ির কোল ঘেঁষে আশুতোষ কলেজ পর্যন্ত। গ্রামটি দীঘি বেষ্টিত, বড় দীঘিতে জেলেরা যখন বড় জাল ফেলে মাছ ধরত সে দৃশ্য দেখতে পুকুরপাড়ে জমত উৎসুক দর্শকের দল। তার ঘাটে সন্ধ্যে বেলায় বসত মজলিশ, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করার আড্ডা। কোথাও দেখা না পেলে শেষে পুকুর ঘাটে জমায়েত হলেই নির্দিষ্টজনের সাক্ষাৎ অবশ্যই মিলত। দুপাশে ফুলভারে নত কামিনীফুলগাছের ডাল এসে গায়ে লাগত, ঘাটের ওপর ঝাঁকরা চাঁপাফুলের গাছটি গন্ধ বিতরণ করত চতুর্দিকে। বড় মনোরম ছিল জায়গাটি। পুকুরের পূর্বপাড়ে পিতৃপুরুষের মহাবিশ্রামের স্থান শ্মশানঘাট। শুভকাজের উপলক্ষে বাড়ির বাইরে গেলে ঐ শ্মশানের উদ্দেশ্যে পিতৃপিতামহদের প্রণাম জানিয়েছি কত। তাঁদের মৃত্যুর দিনটিতে স্মৃতিস্তম্ভের পাদদেশে ফুলগুচ্ছ ও প্রদীপ জ্বালিয়ে স্মরণ করেছি বছরের পর বছর। আজ শ্মশান বলতে আলাদা কিছু বোঝায় না, সমস্ত দেশটাই শ্মশানে পরিণত হয়েছে। দূর থেকে তাই প্রণাম জানাচ্ছি শ্মশানেশ্বরকে ! কোন্ ভগীরথ প্রাণগঙ্গা এনে অভিশপ্ত মৃত্যুপথযাত্রীদের জীবিত করে তুলবেন আজ ?

পাশের বাড়ির পিসিমার প্রিয় বঁাহাস (লাউয়ের খোসার জলপাত্র)

থেকে গ্রীষ্মের দুপুরে কখনো চেয়ে কখনো চুরি করে টকজল খেয়ে কতদিন বকুনি সহ্য করেছি ভেবে হাসি পাচ্ছে। পিসিমা আর বকতে আসবেন না, তিনি চিরনিদ্রায় অভিভূত। আমরা তার বাগান থেকে প্রাণভরে গোটা নির্জন দুপুরে কাঁচা আম, পাকা মিষ্টি আম, আমড়া, কাঁঠাল, কামরাঙা, লিচু, কালজাম, গোলাপজাম, জামরুল, তরমুজ, ফুটি, নোনা আতা, শসা ইত্যাদি খেতাম ইচ্ছেমত। অতীতের স্বাদ আজও ভুলিনি, কিন্তু সে সব ফল এখন আর তেমন করে পাব কোথায়? আজ যেন 'উত্থায় হৃদিলীয়ন্তে দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ'র মত অবস্থা আমাদের, ভালোমন্দ জিনিস খাবার ইচ্ছে থাকলেও উদাসীনতার ভান করে আত্মদমন করতে হয়!

গ্রামের চারণকবি রূপদাস কৈবর্ত বা প্রসিদ্ধ কবিয়াল রমেশ শীলের কথা কিছুতেই ভুলতে পারছি না। শ্রাবণ মাস থেকে নাগসংক্রান্তি পর্যন্ত তারা মনসামঙ্গল থেকে গাথা গেয়ে সমস্ত গ্রামটিকে মুখরিত করে রাখত। মেয়েদের মধ্যেও কেউ পুজোর সময় চণ্ডীমাহাত্ম্য বা জাগরণ পুঁথিও সুর করে পড়ত বলে মনে পড়ে। সেদিনের সেই উৎসাহ উদ্দীপনা আজ গেল কোথায়? আর কি ফিরে পাব না গ্রামের জীবন? নগরজীবনকেই কেন্দ্র করে যন্ত্রবৎ বেচে থাকতে হবে আজীবন? আর কি কোনদিন শিবের গাজন, চড়কের মেলা, বারুনী স্নানের উপলক্ষে গ্রামে হুটোপুটি করতে পাব না? পাব না কি মুখোশ এঁটে মহিষ বাঘ, ভাল্লুক সেজে মুখোশ অভিনয় করতে গ্রামের মাঠে? বিশ্বাস আছে মা আবার আমাদের কোলে টেনে নেবেন এবং 'এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন, আসিবে সেদিন আসিবে।' আমরা সেইদিনের প্রতীক্ষাই করব।

॥ নোয়াখালি ॥

দরাপনগর

পূর্ববঙ্গে প্রথম দুর্ভাগ্যের কালোছায়া নেমে আসে আমাদের নোয়াখালিতে। সাম্প্রদায়িক খড়্গাঘাতে দ্বিখণ্ডিত হয়েছি আমরা, কিন্তু তবুও আমরাই একদিক দিয়ে ভাগ্যবান। এই নোয়াখালির বুকের পাঁজরে পাঁজরে পড়েছিল মহাত্মার চরণচিহ্ন। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে তাঁর ঐতিহাসিক পরিক্রমা সমস্ত পূর্ববাঙ্‌লার বুকে একদিন এনেছিল চাঞ্চল্য। ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠার পক্ষে এই গ্রাম সফরই যথেষ্ট। শ্রীচৈতন্যের পুণ্যপরশে নবদ্বীপ যেমন ধন্য, তেমনি ধন্য হয়েছে নোয়াখালি মহাত্মাজীর পুণ্যপাদস্পর্শে। বৈষ্ণবযুগের জগাই-মাধাইরা সব নতুন করে কি জন্ম নিয়েছে পূর্ববাঙলার পল্লীতে পল্লীতে? History repeats itself মিথ্যে নয় তাহলে! ইতিহাসের পশ্চাদ্‌পসরণের অর্থই হল হানাহানি, বিশ্বাসঘাতকতা, গুপ্তঘাতক, ভ্রাতৃ-বিরোধের কলংকময় সমষ্টিফল। আমরা সেকথা বুঝেছি অক্ষরে অক্ষরে, বুঝেছি আজ সর্বস্ব খুইয়ে। যাদের ভূমি যায় হারিয়ে তাদের ভূমিকা যে কি হতে পারে তাও ভাববার বিষয়!

এক দেশের অবাঞ্ছিত মানুষ অন্যদেশের ভারস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছি যেন আমরা, অমৃতবঞ্চিত পূর্ববাঙ্‌লার অভিশপ্ত মানুষ আবার কবে এবং কি করে স্বঐতিহ্যে, স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হবে তার শুভ ইংগিত বা গোপনমন্ত্র কে বলে দেবে?

মনে পড়ছে ভোর পাঁচটায় হরিনারায়ণপুর থেকে যেদিন আমাদের স্টীমার ভোঁ বাজিয়ে অজানা রাজ্যের দিকে যাত্রা করল সেদিন পূর্বাকাশের উজ্জ্বল শুকতারাটি পর্যন্ত যেন লজ্জায়, শংকায়, অভিমানে ম্লান হয়ে গিয়েছিল। হু হু শব্দে জল কেটে নিস্পৃহ যন্ত্রদানব চলছে এগিয়ে সাতপাঁচ কোন কথা না চিন্তা করেই—ব্যাথাতুরা জননীর বুকের ভেতর গুমরে গুমরে উঠছে আর সেই হৃদয়-নিঙ্‌ড়াণ ধড়ফড়ানির ঢেউ এসে লাগছে আমারও বুকে। স্নেহময়ী মাকে

শেষবারের মত দেখে নেবার জন্যে আমি দাঁড়িয়েছিলাম ডেকে—কিন্তু অশ্রুভারে সমস্ত কিছু তখন হয়ে উঠেছে অস্পষ্ট। মায়ের রূপ গেছে হারিয়ে। ইঞ্জিনের শব্দ শুনে আমার মনে হচ্ছিল দেশজননী যেন বলছেন 'ফিরে আয়--ফিরে আয়—ফিরে আয় আপন ঘরে!' লক্ষ্য করলাম চতুর্দিকে ফিরে আসার ইংগিত,—আমাদের না যেতে দেবার আহ্বান।

কিন্তু আমি দুর্বল মানুষ; আমার উপায় নেই থাকবার। দোটানায় পড়ে চোখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে শুধু অক্ষমতার তপ্ত অশ্রু। সেদিন দেশজননীর কোল থেকে বিদায় নেবার পর থেকে যে অশ্রুবর্ষণ শুরু হয়েছে তার শেষ কোথায় জানিনা। আজ এই বিশাল অনাত্মীয় পাষাণপুরীর এককোনায় একখানি প্রায়ান্ধকার ঘরে বসে ধুঁকছি, মাথা পড়েছে নুয়ে, দুর্ভাবনায় চোখের পাশে কালিমার ছাপ দেখা দিয়েছে। ছাত্রজীবনের রংগীন স্বপ্নরেশগুলি আজ কঠিন বাস্তবের আঘাতে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়ে আসার সময় তার বুকে যে উত্তাল তরংগরাশির নৃত্যরূপ দেখেছিলাম তারই মধ্যে ভাসিয়ে দিয়ে এসেছি আমার আশাভরসার অলীক কল্পনা। উদ্বাস্তু স্টীমারের যাত্রী আমরা, আমাদের আশার স্বপ্ন দেখার সময় আছে? আমরা ওপারের অবাঞ্ছিত আর এপারের বোঝা হয়ে জীবন কাটাচ্ছি। সময় সময় দুঃখের আধিক্যে সজোরে মাথা ঠুকতে ইচ্ছে করে মাটিতে, কিন্তু কোথায় আমার সেই মিষ্টি দেশের মাটি?

নোয়াখালি। বাঙলামায়ের সর্বকনিষ্ঠা স্নেহ-দুলালী নোয়াখালি। মহাত্মার পাদস্পর্শে ধন্যা নোয়াখালি। সারাবাঙলার অনু-পরমাণু দিয়ে গড়া সমুদ্র সৈকতে দাঁড়িয়ে আমার নোয়াখালি। তারই কোলে শিশু গ্রাম আমার প্রিয় 'দরাপনগর'। এ গ্রামের কোন ঐতিহাসিক পটভূমিকা আছে কিনা জানিনা, শুধু জানি দরাপনগর নামটি মনে পড়লেই চোখের সামনে উজ্জল হয়ে ভেসে ওঠে আম-কাঁঠাল, সুপারি, নারকেলকুঞ্জ ঘেরা একটি মনোরম দ্বীপপুঞ্জের প্রাণমাতানো ছবি। দুপাশে 'বারুই'র বরজ নিয়ে এঁকেবেঁকে চলে যাওয়া পল্লীপথ, আশে-পাশে সুসজ্জিত কুঞ্জের মত প্রতিবেশিদের বাড়িঘর, স্নেহমমতায় ভরা প্রতি-বেশিমন। তারই মধ্যে দুপাশে দুটি বিরাট পুকুর নিয়ে আমাদের বাড়ি। ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্তের প্রয়োজনাতিরিক্ত সাজ সরঞ্জাম নিয়ে সাজানো ঘরগুলো। পূবদিকের খানিকটা বাদ দিয়ে চারপাশ ঘেরা ছিল সুপারিকুঞ্জে।

দুবাড়ির মাঝখানে ছোট্ট একটি 'জুরি'। জুরিটি দুই বাড়ির অধিকারের সীমানা নির্ধারণ করলেও মানবিকগুণের সীমানা নির্ধারণ করেনি কখনো। তাদের প্রাণের মিল, মনের ছন্দ জুরির ওপর দেয়া সুপারির পুলের অপেক্ষা করে না। পুবদিকে রতনপুকুর। ওতে ডুব দিলে রতন পাওয়া যায় কিনা জানিনা, তবে তার কাকচক্ষু জল গ্রামের অধিকাংশ লোকই পানীয়জল হিসেবে ব্যবহার করত অন্যপুকুর ছেড়ে। এই রতনপুকুরের পাড় দিয়ে কচুবাড়ির দরজা দিয়ে চলে গেছে গেঁয়ো রাস্তা। কচুবাড়িতে কি শুধু কচুই হয়? শব্দ-তাত্ত্বিকদের বিচার এখানে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে, এরকম বহু অসামঞ্জস্যই আছে বাঙলার পল্লীতে পল্লীতে। কচুবাড়ি আমাদের কাছে পরিচিত তার ফুল-বাগিচার জন্যে—অতি প্রত্যুষে উঠে ফুলচুরি করতে যেতাম কচুবাড়ি! আজ বোঝাতে পারব না সেদিনকার দু-একটা ফুল চুরির মধ্যে আমাদের শিশুমনে কি উন্মাদনা জাগত!

কচুবাড়ি থেকে রাস্তা এঁকে বেঁকে ঘেরীর বিরাট দীঘির পাড় দিয়ে চলে গেছে কাবির হাটের দিকে। দীঘির পাড় এত উঁচু হয় জানতাম না, ওপর থেকে নীচে তাকালে মাথা ঝিমঝিম করে ওঠে। তার উত্তর পাড়ের মাঝামাঝি অংশটা ভাঙা দেখে একবার কৌতূহলবশেই জিজ্ঞাসা করেছিলাম বাবাকে তার কারণ। সেদিন বাবার কাছ থেকে যে উত্তর পেয়েছি তার বিস্ময় আজও কাটেনি, কিশোর মনে দাগ কেটে বসে গেছে। তিনি বলেছিলেন ওই ফাঁকটা দিয়েই নাকি একটি বিরাট সিন্দুক (যতখানি ভাঙা ততখানি মাপের) ক্রোশখানেক দূরে 'কিল্লার দীঘিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল রাত দুপুরে। সেই বিরাট সিন্দুকে ছিল সাতরাজার সম্পদ। গ্রামবাসীরা বলে এই সিন্দুক চালাচালির ব্যাপারটি নাকি প্রায়ই নিশুতি রাত্রেই হয়ে থাকে বলে প্রবাদ আছে। বহুবার ভাঙা অংশটুকু মেরামতের চেষ্টাও হয়েছে, কিন্তু বাঁধা যায়নি কোন না কোন আশ্চর্য কারণে। শেষে অধৈর্য হয়ে লোকে হাল ছেড়ে দিয়েছে।

মনে পড়ছে কতদিন রাত্রে রূপকথা শোনার বায়না নিয়ে মাকে বিরক্ত করেছি, মাকে ঘুমুতে দিইনি। আজও টুকরো টুকরো খেইহারা হয়ে স্মরণপথে বড় হয়ে দেখা দেয় সেই তেপান্তরে ছুটে চলা দুঃসাহসিক রাজপুত্তুর, যার ঘোড়া এখনো জোর কদমে ছুটে চলেছে মনের রাজপথে ধুলো উড়িয়ে।

সেই অনাদিকালের রাজপুত্তুরের পথের সাথী হলাম আজ আমরা! আমরাও ছুটে চলেছি তেপান্তরের রুক্ষ-শুষ্ক মাঠের ওপর দিয়ে সামান্য নিরাপদ আশ্রয়ের জন্যে। জানিনা এই ছুটে চলার শেষ কোথায়? ছোটবেলায় চাঁদের ছুটে চলা দেখে আশ্চর্য হয়েছি। এতো জোরে সাদা-কালো মেঘের ফাঁকে ফাঁকে চাঁদ অমন করে ছোটে কেন? আমি যেখানে যাই চাঁদও সেখানে যায় কেন ইত্যাদি প্রশ্নে মন হয়ে উঠত ভরপুর! কতদিন চাঁদকে পেছনে ফেলে যাবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছি ভেবে আজ হাসি পায়!

শিশুমনের বিস্ময় কাটিয়ে উঠে একদিন লক্ষ্য করলাম আমার জগতটা হঠাৎ যেন বেড়ে গেছে অনেকখানি। আমি চষে বেড়াচ্ছি সারাগ্রামটা, গ্রামের প্রতি অনুপরমানুর সঙ্গে আমার হয়ে গেছে একাত্মবোধ। আম, জাম, লিচু, জামরুল, কুল, বাতাবি গাছের ডালে ডালে ঘটেছে আমার অগ্রগতি। বর্ষার কাদাজলে চলেছে হরদম ফুটবল খেলার অনুশীলণ—সেদিন সারাগায়ে মায়ের যে পরশ পেয়েছি সেই পুরনো কথা ভেবেই কাটাতে হবে বোধহয় বাকী জীবন। সেদিনের ভিজেমাটির সোঁদাগন্ধ আজও লেগে রয়েছে আমার নাকে।

'মতরী' অর্থাৎ মিত্র বাড়ির দাওয়ায় যে দোকানঘরটি ছিল তাতেই সকাল সন্ধ্যায় বসত আড্ডা। আশেপাশের গ্রামের লোকও আসত সওদা করতে, গল্পগুজব করতে। আমাদের গ্রামটি হিন্দুপ্রধান হলেও দোকান ঘরের মিলনতীর্থে দেখা মিলত সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষেরই—চৌকিদার মুজহরলাল থেকে আরম্ভ করে চোর মরকালী আর বুড়ো হাফেজ মিয়া থেকে আরম্ভ করে মিয়াদের বিকৃত-মস্তিষ্ক বিলাত-ফেরৎ ছেলেটি পর্যন্ত সেখানে আসত দিনান্তে অন্তত একটিবার। পাগল ছেলেটি আপনমনে বিড়বিড় করে বকলেও ব্যবহারে কোনরকম পাগলসুলভ হাংগামা করতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। বেত ঘুরিয়ে গুরু মশায়ী চালে যখন সে চলে যেত আমার কিশোর মনে তখন জাগত প্রচণ্ড বিস্ময়। সেদিন মানুষকে পাগল হতে দেখেছি, আজ দেখছি গোটা জাতি হয়ে উঠেছে পাগল! এমন পাগলামী করলে শান্তিতে মানুষ থাকবে কি করে সে চিন্তা কারো মনে জাগেনি আজ পর্যন্ত? মানুষ বাঁচলে তবে তো জাতি,—তবে কেন জাতিবোধের আজ এমন প্রাধান্য মানুষের ওপর? মানুষ কি মরে গেছে? জাতের বজ্জাতি শেষ হোক এই প্রার্থনাই করছে সমস্ত সম্প্রদায়ের সমস্ত মানুষ!

মনে পড়ে বুড়ো তমিজুদ্দিনকে। বুড়ো ঘর ছাইতো বছর বছর। সুপারির মরশুমে সুপারি দিত পেড়ে। প্রতি গাছ থেকে তার পাওনা ছিল একগণ্ডা সুপারি। সরু লম্বা একটা বাঁশের মাথায় কাস্তে বেঁধে সুপারি পাড়ত ছোকরাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। শুনেছি বয়সকালে তমিজুদ্দিন গাছে উঠত কাঠ-বেড়ালের মত, বুড়ো বয়সে আর ভরসা করে না সরু গাছে উঠতে। মনে পড়ে বলীকেও। সে যখন জমিতে মই দিত তখন গিয়ে তার পেছনে কোমর জড়িয়ে মই-এর ওপর দাঁড়াতাম। বেঁটে বুড়ো বাধা তো দিতই না বরং বাঁদিকের গরুটার ল্যাজ মুচড়ে হেঁই-হেঁইও বলে আমাকে আনন্দ দেবার ব্যবস্থা করত আন্তরিক ভাবে। কিছুক্ষণ পরে নামিয়ে দেবার মতলবে প্রশ্ন করত, 'অইল?' ধুলোয় ধুসরিত শরীরের দিকে তাকিয়ে আমি শুধু জবাব দিতাম— 'উঁহু!'

মনে পড়ছে মিত্র বাড়ির ঝুলন উৎসবের কথা। দামামার শব্দে কর্ণপটাহের অবস্থা হত সংগিন। আরতির ধূপের ধোঁয়ার আবছা পরিবেশের মধ্যে দেখতাম ঠাকুর দুলছেন, দোল খাচ্ছেন সহাস্য মুখে। পুজোর আরতিই ছিল সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক ব্যাপার। ছেলে-বুড়ো নির্বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন দলে ভাগ হয়ে আরতি করত ভক্তি-নম্র চিত্তে। বাজনার তালে তালে আরতি উঠত জমে, আগুনের ফুলকি পড়ত ছড়িয়ে এদিক-ওদিকে। ঢুলির বাজনার ছন্দ যখন চরমে, নাচতে নাচতে আরতিকারদের হাত থেকে তখন খসে পড়ত ধুনুচি, আগুন ছিটকে পড়ে দু-একজনকে ঘায়েলও যে করত না তা নয়, কিন্তু সেদিকে নজর দেবার মনের অবস্থা তখন কোথায়? এইসব নিয়েই আমার গ্রাম, এইসব অনাসৃষ্টি নিয়েই পূর্ব বাঙলার সব গ্রাম পরিপূর্ণ। সামান্য ঝুলন উৎসবকে কেন্দ্র করেই যে বিরাট আনন্দোৎসবের ব্যবস্থা যারা সেদিন করত আজ তারা কে কোথায় ছড়িয়ে পড়েছে জানিনা।

পুজোর সময় ধরদের বাড়িতে হত উৎসব। অভিজাত বাড়ির নোনতা-ধরা দেয়ালের মত তার সবকিছুতেই নোনতা ধরলেও এই সেদিন পর্যন্তও পুজোর আনন্দটা ছিল অকৃত্রিম। ঢপ, রামায়ণগান থেকে আরম্ভ করে যাত্রা গানের মধ্যে দিয়ে জীবন্ত হয়ে উঠত সমস্ত গ্রামখানি। রামায়ণগানের দুচার লাইন আজও মনে আছে আমার। সেদিনকার আসর ভর্তি লোকের সামনে যখন গায়েন রামের রাজ্যাভিষেকের চির-অভিপ্রেত সংবাদটি ঘোষণা

করতেন তখন দর্শকদের মুখে ফুটে উঠত স্বস্তির হাসি। সে হাসির উৎস হিসেবে ছিল বিশেষ করে এই কথাটি ;

'ওগো কৌশল্যে, শুনে কী আনন্দ হল অযোধ্যার
রাজা হবে রঘুমণি লক্ষণ হবে ছত্রধারী—
বামে সীতা সীমন্তিনী সদা নিরখি ॥'

এই যে সুখীস্বচ্ছল ভবিষ্যত অযোধ্যার ছবি, এ ছবি তো চিরন্তন। জীবনের ওপর সার্থকতার ছাপ না পড়লে এমন নির্বিঘ্ন ছবি ফুটবে কি করে?

যাত্রার মধ্যে দীনবন্ধুর নাচই ছিল সবচেয়ে আকর্ষণীয়। পুজোর সময় তাকে পাওয়া ছিল দুর্লভ সৌভাগ্যের কথা। বড় বড় যাত্রার দলে থাকত তার চাহিদা। তার 'পুজারিণী' নৃত্যই ছিল সবচেয়ে বিস্ময়কর। মাথায় ও দুহাতে তিনটি ধূপদানি নিয়ে পুজারিণী তার বিচিত্র অংগভংগী সহকারে দেবতাকে অর্ঘ্য নিবেদন করছে, অথচ প্রণাম করতে গিয়েও তার ধূপদানি স্থান-ভ্রষ্ট হচ্ছে না। তার নৃত্যলালিত্য দেখলে বিশ্বাসই করা যেত না যে শরীরে তার হাড় আছে একটাও! আমাদের গ্রামে দীনবন্ধুই ছিল প্রাচীনকালের সুরুচি-সম্পন্ন নৃত্যের ধারক ও বাহক।

আজ ফেলে আসা দিনগুলির ধূসর স্মৃতি রোমন্থনই ভাল লাগছে। আজ আমাদের অবস্থা মহাভারত বর্ণিত অভিমন্যুর মত! তবে অভিমন্যু প্রবেশের মন্ত্র জানতেন বের হয়ে আসার মন্ত্র সম্বন্ধে ছিলেন অজ্ঞ। আমরা বেরিয়ে আসার মন্ত্র জানি, জানিনা ছেড়ে আসা গ্রামে পুনপ্রতিষ্ঠা লাভের মন্ত্র, এই তফাৎ! মৈত্রী সাধনার মধ্য দিয়েই পাওয়া যাবে সে পথের সন্ধান।

সন্দীপ

দক্ষিণে সুন্দরবন, উত্তরে তরাই। বাঙলাদেশের ভৌগোলিক সীমানা এই। তবু আরো এক মৃত্যুদীপ্ত ইতিহাস ছিল এই সীমানির্ধারিত ভূখণ্ডের। সে ইতিহাস একদিনে গড়ে ওঠেনি। নদীমাতৃক বাঙলাদেশের বুকে পলিমাটির স্তরের মত যুগে যুগে সাত কোটি মানুষের বুকের ভালোবাসায়, অশ্রুতে, প্রতিজ্ঞায় এ ইতিহাস লিখিত হয়েছিল। আজ নিজের হাতে সে ইতিহাসকে দ্বিখণ্ডিত করে দিলাম। এক সীমান্তের মানুষ আর এক সীমান্তে উপনীত হল শরণার্থীর বেশে, আশ্রয়ের প্রার্থনায়। হায় আমার দেশ! যেখানেই থাকি, যত দূরেই থাকি এ দেশের মাটিকে, এদেশের আকাশকে তো ভুলতে পারি না। এ দেশে যে আমি জন্মেছি, এদেশ যে আমার জননী।

দূর থেকে একটা কালো বিন্দুর মত মনে হয় প্রথম। সমুদ্রের বুকে বুঝিবা কোন ভাসমান কাষ্ঠখণ্ড। ঢেউয়ের ভেতর ডুবে যাচ্ছে কখনো—আবার মাথা তুলছে হঠাৎ। কর্ণফুলি নদীকে অনেক পেছনে ফেলে সমুদ্রের মোহানায় এসে পড়েছে মোটরলঞ্চ। এবার সোজা কোণাকুণি পাড়ি জমাতে হবে। ঢেউয়ের তালে তালে ভেসে চলেছে লঞ্চ। যান্ত্রিক আর্তনাদ তলিয়ে যাচ্ছে সামুদ্রিক ঢেউয়ের উত্তাল বিক্ষোভে। নির্মেঘ আকাশে মধ্যাহ্নের সূর্য। রোদের স্পর্শে সফেন ঢেউগুলি হিরন্ময় দীপ্তি ছড়িয়ে দিচ্ছে। ঈগলের মত অনুসন্ধানী চোখে তাকালেও উপকূল চোখে পড়বে না আর। শুধু অন্তহীন জল চারদিকে—ঢেউয়ের অবিশ্রান্ত গর্জন। পাল-তোলা নৌকোর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় মাঝে মাঝে। দেখা যায় দু একখানা যাত্রীবাহী নৌকো। সমুদের উপযোগী বিশেষ ধরণের নৌকো এইসব। দিক-চিহ্নহীন সমুদ্রে নৌকারোহীদের একমাত্র সহায় মাঝির অদ্ভুত দক্ষতা আর যাত্রীর দুর্নিবার দুঃসাহস। প্রায়ই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয় এদের। তবু পরাভূত হয় না এরা, অনেক প্রাণের বিনিময়ে কঠিন অভিজ্ঞতায় শক্তিমান সবাই। তাই রুদ্রের অভিসারে অভ্যস্ত এরা প্রত্যেকে।

দুপুরের সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ে এক সময়। সেই কালো বিন্দুটা চোখের

সামনে পরিষ্কার হয়ে দেখা দেয় এইবার। সুপারি, নারকেল গাছে ঘেরা এক টুকরো ভূখণ্ড। সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ছে ভূখণ্ডের গায়ে। যে কোন মুহূর্তে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে বলে কিনারে গিয়ে ভিড়ল লঞ্চ। ঢেউয়ের দোলায় লঞ্চ তখন কাঁপছে। কোন অবলম্বন ছাড়া লঞ্চের ওপর দাঁড়ানো যায় না। আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় খালাসীরা কিন্তু সিঁড়ি ফেলে দিলে। তাদের হাত ধরে ধরে সিঁড়ি পার হয়ে উঠে এল যাত্রীদল। এখান থেকে গন্তব্যস্থল মাইল দুয়েকের পথ কিন্তু সেখানে যাওয়া যায় কি করে? মোটর, ঘোড়ার গাড়ি, রিক্সা এসব কিছুই নেই। একটা কাঁচা রাস্তা এঁকেবেঁকে ভেতর দিয়ে চলে গেছে। ছোট ছোট মোট কাঁধে নিয়ে যাত্রীরা-কেউ কেউ সেই পথে রওনা হয়। বাকী যারা রইল তারা আশ্রয় নিল গরুর গাড়ির। যাতায়াতের একমাত্র উপায় এই দ্বিচক্রযান।

নতুন কোন আগন্তুক তখন হয়তো সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন—সামনে অনন্ত সমুদ্র, দিগন্ত চোখে পড়ে না। একটা ঝলসান তাম্র পাত্রের মত পশ্চিমের সূর্য সমুদ্রের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। নিজের অস্তিত্ব লুপ্ত করে দেবার কামনায় উদ্বেল বিকেলের সূর্য। আশপাশের গাছগুলোতে পাখিদের ক্লান্ত কলরব। একটা স্তব্ধ বিষণ্ণ পরিবেশ। মুহূর্তের জন্যে অবাক হয়ে যান আগন্তুক। বাঙলাদেশের অংশ নাকি এটা। কিন্তু বাঙলার কোন অঞ্চল এমন দুরধিগম্য, বহির্জগৎ-বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে ভাবতে পারেননি ভদ্রলোক। একটা বিস্মিত চেতনায় কয়েক মুহূর্ত কেটে যায়। পাশে দাঁড়িয়ে গরুর গাড়ির গাড়োয়ান যে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছে সেদিকে খেয়ালই নেই তাঁর।

প্রায় দেড়শ বছর আগে একদল লোক যেদিন এখানে এসে নেমেছিল সেদিন তারাও বোধহয় বিস্মিত চোখে তাকিয়েছিল কিছুক্ষণ। কিন্তু উদ্দেশ্য ছিল তাদের নির্ধারিত। কর্তব্য ছিল সুপরিকল্পিত। সাত সমুদ্র তের নদী পার হওয়া রূপকথার রাজকুমারের মত তাদের চমকপ্রদ অভিযাত্রা তাই থেমেছিল এখানে। জাতে ছিল তারা পর্তুগীজ। পসরা খুলতে দেরী হয়নি তাদের। অপ্রতিহত আধিপত্যে বাঁধা পড়েনি কোথাও। দেড়শ বছর আগে বাঙলার প্রত্যন্তভাগের এই দ্বীপটিও ঔপনিবেশিক আলোর সংস্পর্শ থেকে অব্যাহতি পায়নি। ইতিহাসে তবু এই দ্বীপটির কথা হয়তো দেখতে পাবেন না, কারণ বিশেষজ্ঞের গবেষণার বাইরে যে এই দ্বীপ—আমার দেশ এই সন্দীপ।

শহরের অংশটিকে বলা হয় হরিশপুর, অবশ্য ঠিক শহর নয়। একটি থানা,

মুন্সেফ-আদালত আর সাবট্রেজারী অফিস গোটা দ্বীপটার শাসন ব্যবস্থার প্রতিভূ। মাইলখানেক পরিধি শহরের। দক্ষিণদিকে দীঘিরপাড় অঞ্চল জুড়ে অধিকাংশ শহরবাসীর বাস। একটা বিরাট দীঘির চারদিকে ছোট ছোট ঘর। কোনটার চালা টিনের, কোনটার বা খড়ের। কবি নবীন সেন যখন মুন্সেফ ছিলেন এখানে তখন তাঁরই উদ্যমে কাটানো হয়েছিল এই দীঘি।

দীঘিরপাড়েই বাসিন্দা ছিলাম আমি। দীঘির জলে সাঁতার কাটা একটা অপরিহার্য আনন্দের অংগ ছিল আমাদের। তাছাড়া আরো একটা কারণে দীঘিটি আকর্ষণীয় ছিল শৈশবে। ছোট ছোট রংগীন মাছ দীঘির কিনারে শ্যাওলা ঝোপের ভেতর ঘুরে বেড়াত। পাঠশালা পালিয়ে দল বেঁধে সেই মাছ ধরতে আসতাম আমরা। বড়দের চোখ এড়িয়ে নিষিদ্ধ কাজটা সেরে নেবার সেই ছিল সুবর্ণ সুযোগ। কিন্তু সময় সময় ধরা পড়ে যেতাম তবু।

'ওখানে কি করছিস তোরা?' —একদিন একটা গম্ভীর গলার আওয়াজ শুনে হকচকিয়ে চেয়ে দেখি সুধেন্দুদা দাঁড়িয়ে পেছনে। পড়ি কি মরি করে যে যেদিকে পারলে ছুটে পালাল, ধরা পড়ে গেলাম আমি।

'পাঠশালা পালিয়ে এই কাজ করে বেড়াচ্ছিস?'—সুধেন্দুদা তখনো আমার হাতটা ধরে রেখেছেন। আমার মুখে টুঁ শব্দটি নেই।

'দীঘির পাহারাওলা দেখতে পেলে হাড় ভেঙ্গে দেবে সে খেয়াল আছে?'—সুধেন্দুদা হাত ছেড়ে দিয়ে কাছে টেনে নিলেন আমাকে। নিবিড় স্নেহে দুহাতে জড়িয়ে ধরলেন। একটা প্রীতির প্রবাহ যেন এই সুধেন্দুদা। স্বদেশী যুগের জেলখাটা লোক। বাড়ি মাইটভাংগা গ্রামে। শহরে ছোট একটা বইয়ের দোকান আছে তাঁর। স্কুল-পাঠশালার বই ছাড়াও উঁচুদরের সব বই রাখতেন তিনি। ওসব বই কাউকে কিনতে দেখিনি কখনো। সুধেন্দুদা আমাদের পড়তে দিতেন বইগুলো। রাজনীতি আর সাহিত্যের আস্বাদ নিতাম আমরা সেই সব বই থেকে। ঝড়ের রাতের বিজয়ী অশ্বারোহীর মত আজো দেখতে পাই সুধেন্দুদাকে। মাইটভাংগায় চিরাচরিত দুর্গাপূজা নিয়ে জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল একবার। হিন্দু-মুসলমানের উন্মত্ত বিরোধ, দুপক্ষই কোমর বেঁধে দাঁড়িয়েছে। একটা রক্তের নদী হয়ত বয়ে যাবে কিছুক্ষণ পরেই। সহসা সুধেন্দুদা কোথা থেকে এসে মাঝখানে বাজের মত পড়লেন। বিরোধের নিষ্পত্তি হল নিমেষেই। কিন্তু আঘাতে জর্জরিত হয়ে অচেতন অবস্থায়

হাঁসপাতালে চলে গেলেন সুধেন্দুদা। সেই অনির্বাণ আদর্শের দীপশিখাকে ভুলব না কোনদিন।

রবিবার আমাদের কাছে ছিল একটা দুর্লভ দিন। দুপুরের পরেই বেরিয়ে পড়তাম আমরা। আমাদের দলের সর্দার ছিলেন দ্বিজেনদা। শহরের বুকের ওপর দিয়ে সোজা উত্তর দিকে যে রাস্তাটা চলে গেছে সেই পথে হেঁটে চার আনির বাগে চলে যেতাম আমরা। দুর্গম জংগলে আচ্ছন্ন চার আনির বাগ। সরু সরু পায়ে হাঁটা পথ আছে ভেতরে ঢুকবার। কয়েকটি পুরণো দীঘি নানান রকম জলজ গুল্মে এমনভাবে ঠেসে আছে যে সেইসব আগাছার ওপর দিয়ে স্বচ্ছন্দে হেঁটে পার হওয়া যায়। জংগলের এখানে সেখানে দালানের ধ্বংসাবশেষ পড়ে রয়েছে।

একটা কাহিনী প্রচলিত আছে এই চারআনির বাগ সম্বন্ধে। পর্তুগীজদের বিলীয়মান প্রভাবের মুখে মুসলমান কৃষাণের ছেলে সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছিল সন্দীপের। প্রবল পরাক্রান্ত হয়ে নাম নিয়েছিল সে দিলাল রাজা। বাগানের এই জায়গায় ছিল তার রাজপ্রাসাদ। তারপর একদিন দিলাল রাজার ক্ষমতাও অপহৃত হল আর কালক্রমে তার প্রাসাদ পরিণত হল এই জংগলাকীর্ণ বাগানে। পায়ে হাঁটা পথ থাকলেও বাগানে বড় একটা ঢোকে না কেউ। কাঠুরেরা কাঠ কাটতে আসে মাঝে-মাঝে। আর আসে গ্রামাঞ্চলের নাম করা সাপুড়ে ওঝারা। সাপ ধরবার এক অদ্ভুত ক্ষমতা আছে তাদের। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বিষধর সাপ ধরে ফেলে—বৃহৎ অজগরও অনায়াসে আয়ত্তে নিয়ে আসে। এইসব সাপ শহরে গ্রামে দেখিয়ে পয়সা রোজগার করে তারা। বাগানের একটু দূরেই চার আনির কাছারী ঘর। কাছারী ঘরের সামনেই খোলা মাঠে হাট বসে শনি-মঙ্গলবার। হাটের এই দুইদিন নিস্তেজ নিষ্প্রাণ চারআনি হঠাৎ জেগে ওঠে যেন। সহস্র লোকের পদঘাতে ও পদপাতে চারআনির বুকে প্রাণ সঞ্চার হয়। শুক্রবারে চাঁদবিবির মস্‌জিদে নামাজের জমায়েত বসে। কাছারীর ডান দিকে একটা বড় পুকুরের পাড়ে চাঁদবিবির মস্‌জিদ। কারুকার্য খচিত, হলদে রঙের বিরাট মস্‌জিদ। অনেক কালের পুরণো। ইতিহাসের চাঁদ-সুলতানা-এর নির্মিতা বলে সন্দেহ করে অনেকে।

পড়ন্ত রোদে ধুলো মাখা গায়ে অন্য কোন পথে ফিরতাম আমরা। হাঁটতে হাঁটতে বসে জিরিয়ে নিতাম পুন্নাল গাছের স্নিগ্ধ ছায়ায়। অশ্বত্থ বটের মত

বিশালকায় গাছ। শাখা প্রশাখায় অজস্র গুটি ফল ধরে। গ্রামের লোকেরা এই ফল থেকে একপ্রকার তেল তৈরী করে বাতি জ্বালায়। পুন্নালের ছায়া ছাড়িয়ে এসে দাঁড়াতাম হাওতালের পুলের ওপর। পুলের নীচে প্রবাহমান একটা খরস্রোতা খাল। কৃষাণের ছেলেরা মহিষের পিঠে চড়ে ওপারে যেয়ে ওঠে।

মন আজ মুখর হয়ে উঠেছে স্মৃতিতে। কালবৈশাখীর আসন্ন ঝড়ের সঙ্কেতে সন্দীপের সমুদ্র হয়তো এখন গম্ভীর হয়ে উঠেছে। অপর পারের যাত্রীদের পক্ষে এ সময়টা ভয়ঙ্কর, তবু এই ভয়ঙ্করের রুদ্র লীলার চরণতলে দোদুল্যমান সন্দীপের চরকে ভুলতে পারিনি। যদি কোনদিন সুযোগ আসে আবার ফিরে যাব। দেশের মাটির পায়ে প্রণাম নিবেদন করে ক্ষমা চাইব তাকে ছেড়ে এসেছিলাম বলে। আমি জানি, সন্দীপ আমাকে আবার কোলে টেনে নেবে, অবুঝ, অবাধ্য ছেলের মত; আবার মন খুলে বঙ্গোপসাগরের তীরে দাঁড়িয়ে নীলাঞ্জন আকাশের দিকে মুখ তুলে গাইব—'সার্থক জনম মাগো, জন্মেছি এই দেশে'। সেদিন আর কতদূর?

॥ ত্রিপুরা ॥

বায়নগর

কালের খেলনার মত আমার সেই ছোট্ট গ্রামটির কথা আজ মনে পড়ে। মনে পড়ে কাঞ্চনফুল আর সোনালতায় মাটির পৃথিবীর সে অপরূপ হাসি—সোনালু গাছের ফলে (আঞ্চলিক ভাষায় বানরের লাঠি) ঘুঙুরের বোলের মত মিঠে আওয়াজ আজো যেন স্পষ্ট শুনতে পাই। শ্রাবণের থমথমে আকাশের দিগন্তে মেঘের তম্বুরা যেন কোন্ খেয়ালী দেবতার বিদ্যুৎ-আঙুলের ছোঁয়ায় গুরু গুরু মন্দ্রে কাঁপছে—টিনের চালায় চালায় বৃষ্টির নূপুর বাজছে ঝমঝম করে; ধ্বনিবর্ণময় বর্ষার সে কি অপরূপ ঘনঘটা। আবছা আলো-আঁধারে চূর্ণবৃষ্টির ধূসর চাদর মুড়ি দিয়ে বিশ্বচরাচর যেন মনের কাছে আসত ঘন হয়ে। মনে পড়ে ক্ষান্তবর্ষণ শ্যামলী মৃত্তিকার বর্ণাঢ্য রূপশৃঙার: কচি পাতার ফাঁকে-ফাঁকে সোনালী রোদের খিলখিল হাসি, বৃষ্টি-ধোয়া কনক চাপায় উজ্জ্বল হরিৎ আভা। দুপুরের তীক্ষ্ণ রোদে উদার উন্মুক্ত আকাশ যেন গুণীর কণ্ঠের গভীর-গম্ভীর কোন উদাত্ত রাগিণীর মত দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত টানা। বৈরাগীর একতারার মত মেঠোপথ চলে গিয়েছে গ্রাম থেকে গ্রামান্তে—ব্যাকুল-বাউল-উতলা বাতাসে ফসলের গান; তৃণশীর্ষে সূর্যের গুঞ্জন।

আরতির ধূপছায়ার মধ্য দিয়ে দেখা ঝাপসা দেবী প্রতিমার মত আজো চোখে ভাসছে আমার সেই ছোট্ট গ্রামটি—তার মধ্যে দেখেছি রূপকথার ঘুঁটেকুড়নী মায়ের নির্বাক বেদনার প্রতিমূর্তি। কালের একতারায় তাঁর অশ্রুর অশ্রুত রাগিণী যেন ডানা-ভাঙা পাখির মত আজো কেঁদে কেঁদে ফিরছে।

গ্রামের নাম বায়নগর। ত্রিপুরা জেলার ছোট্ট একটি গ্রাম। শোনা যায়, আসলে এর নাম ছিল নাকি 'রায়নগর'। এ গাঁয়ের জমিদার ছিলেন রায়েরা। রায় বংশের শেষপুরুষ অঘোর রায়ের প্রতাপ ছিল দোর্দণ্ড। পাকা সবরী কলার মতো গায়ের রঙ, উন্নত ঋজু নাসা আর ভোজালীর মত একজোড়া তীক্ষ্ণ গোঁফ ছিল রায়ের। অঘোর রায় যেমন ছিলেন বাঘের মত ভয়ানক

তেমন তাঁর রাগও ছিল প্রচণ্ড। আকস্মিক উত্তেজনার বশে একদিন তিনিএমন একটি কাণ্ড করে বসেন যার ফলে তাঁকে শেষ পর্যন্ত এ গ্রাম ছেড়ে যেতে হয়।

ঘটনাটি সম্পর্কে জনশ্রুতি শোনা যায় এরকম। বাড়ির লাগোয়া একফালি জমিতে তিনি নানা দূরদেশ থেকে প্রচুর অর্থব্যয় করে নানারকম বাহারি ফুলের চারা এনে লাগিয়েছিলেন। ফুল আর ফুলকপির চাষে ছিল তাঁর সমান আগ্রহ, সমান অধ্যবসায়। একদিন ভিনগাঁয়ের এক জমিদারনন্দনের সদ্যক্রীত টাট্টু ঘোড়াটি বাগানের মালির সতর্ক প্রহরা এড়িয়ে বাগানে ঢুকে পড়ে। খবর শুনেই তো অঘোর রায়ের ব্রহ্মরন্ধ্রে বারুদ জ্বলে উঠল—দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দুর্গাপূজার সময় যে খড়্গ দিয়ে মহিষ বলি দেয়া হত তাই নিয়ে ঝড়ের মত ছুটলেন তিনি বাগানের দিকে। পেছনে পেছনে ছুটল তাঁর স্ত্রী, পাইক, বরকন্দাজ আর সব। খড়্গের শানিত চোখ দুটি রক্তের তৃষ্ণায় ধক্‌ধক্ করে জ্বলছে, আর জ্বলছে অঘোর রায়ের ভাঁটার মত দুটি চোখ। বাগানে ঢুকেই তিনি এক লাফে গিয়ে ঘোড়াটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। অশ্বদেহ দ্বিখণ্ডিত করে সেই প্রচণ্ড খড়্গের কিয়দংশ মাটিতে ঢুকে গেল। রাজগন্ধার উজ্জ্বল লালে রক্তের ছোপ—সবুজ ফুল শাখায় বীভৎস ক্ষতের মত রক্তের চাপ—অন্তঃপুরিকাদের অস্ফুট আর্তনাদ আর পাইক বরকন্দাজের সোরগোলে সে এক বিকট দৃশ্য! কাঁপতে কাঁপতে অঘোর রায় হলেন ধরাশায়ী। তার পরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। জমিদারে জমিদারে এ নিয়ে শুরু হল প্রচণ্ড বৈরিতা। মামলা-মোকদ্দমা আর ষড়যন্ত্রের বেড়াজালে বিপর্যস্ত হয়ে অঘোর রায় হলেন দেশত্যাগী। তারপর কালক্রমে রায়নগর রূপান্তরিত হল বায়নগরে।

গ্রামটি মুসলমান প্রধান—দুদিকে মালীগাঁ আর খৈরকোলাতে হিন্দু প্রায় একজনও নেই। কিন্তু হিন্দু মুসলমানের মধ্যে জীবনযাত্রার আদানপ্রদানের তাগিদে এমন একটি সহজ হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিল যে, কেউ-কাউকে পর মনে করত না। গ্রামসুবাদে বয়োকনিষ্ঠরা পরস্পর পরস্পরকে দাদা, পুতি (কাকা), ঠাকুরভাই প্রভৃতি সুবাদে ডাকত। এর আসল কারণটা প্রধানতঃ অর্থনৈতিক। জীবিকার ক্ষেত্রে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে এতটা ঘনিষ্ঠ ছিল যে, জীবনেও তার প্রভাব অনিবার্যভাবেই আসতে বাধ্য। গ্রামের হিন্দুদের মধ্যে যারা কৃতী পুরুষ তারা প্রায় সবাই থাকতেন বিদেশে। এদের জোতজমি চাষবাসের ভার ছিল মুসলমান প্রধানিয়াদের হাতে। তাঁরা হাল-লাঙ্গল দিয়ে জমি চষতেন, ফসল

তুলতেন। যারা বাড়িতে থাকতেন তাঁদের অর্ধেক ফসল দিয়ে দিতেন। এমনও হয়েছে যে, জমির মালিক হয়তো চিঠি লিখেছেন—তাঁর প্রাপ্য ফসলের মূল্য মণিঅর্ডার করে পাঠাতে। মুসলমান বর্গাদার প্রধানিয়ারা কড়াক্রান্তি হিসেব করে টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন—কোথাও এক বিন্দু ফাঁকি বা কারচুপি ছিল না। যেন মনে হত অলক্ষ্যে কোন অদৃশ্য চক্ষু তাঁদের কাজ-কারবার সব দেখছে—এমনি ধর্মভীরু আর নিরীহ ছিলেন তাঁরা। একটা নিশ্চিত বিশ্বাসের শক্ত জমিতে ছিল তাঁদের জীবনের ভিৎ, সদাসন্তুষ্ট, কঠোর পরিশ্রমী আর নিরীহ ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের দেখেছি হিন্দু প্রতিবেশীদের সঙ্গে কি অমায়িক আর প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করতে। আমার কাকা ছিলেন ডাক্তার। বাড়িতেই প্র্যাকটিস্ করতেন। সন্ধ্যাবেলায় তাঁর বৈঠকখানায় এসে জুটতেন একে একে হাজী-বাড়ির বড় হাজী, উত্তরপাড়ার আকবর আলি, পাঞ্জৎ আলী মুন্সী গ্রামের প্রধানিয়ারা। গাছপিঁড়িতে বসে যেতেন এঁরা—মাটির মালসাতে (দেশে বলে 'আইল্যা') তুষের আগুন জীইয়ে রাখা হত টিকে ধরাবার জন্যে। গভীর রাত্রি পর্যন্ত চলত বৈঠক, আর চলত ছিলিমের পর ছিলিম তামাক। যুদ্ধের সময়টায় এখানে ভিড় হত বেশী। সবাই যেন শুনতে চায় আশার বাণী, আশ্বাসের বাণী—সবাই যেন প্রাণপণে বিশ্বাস করতে চায় এ দুর্দিনের অন্ত আছে। ডাক্তার-কাকার কাছে তাই অনেকে ছুটে আসত, তাঁর কাছ থেকে সমর্থনের বাণী শুনবার জন্যে। কেউ খেতে পাচ্ছে না—রোগে ওষুধ নেই, পথ্য নেই, ডাক্তারকাকা তাঁর যথাসাধ্য সাহায্য করতেন। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল বলিষ্ঠ দেহ মুসলমান চাষীদের দেহে বুভুক্ষা আর অনাহারের ছাপ—ব্যাণ্ডেজ খোলা পোড়া ঘায়ের মত মুখে শুকনো হাসি—যেমন করুণ তেমনি বীভৎস। রাজনৈতিক আধি আর ঝোড়ো হাওয়ার অন্তরালে একটি সহজ সরল জীবনের সমতল ভূমিতে সবাই হাতে হাত মিলিয়ে চলত এখানে। আমাদের বাড়ির কিছু দূরেই ছিল হাজীবাড়ি। এ বংশের কোন্ পুরুষ কবে একবার মক্কা গিয়ে 'হজ' করে এসেছিলেন তাই থেকে এরা সবাই 'হাজী।' বড় হাজীর কথা আজ মনে পড়ে। মেহেদী রঙের দাড়ি আর চোখদুটিতে ছিল একটা সরল বিশ্বাসের ছাপ, চোখ এমন করে হাসতে জানে—এ কথা এর আগে আমার জানা ছিল না। শেষ রাত্রে তার উদাত্ত কণ্ঠের 'আজান' আমাদের পাতলা ঘুমের আস্তরণ ভেদ করে কানে এসে বাজত। আমাদের ভাল কোন খবর পেলে এই মুসলমান বৃদ্ধটি সত্যি-সত্যি খুশি

হতেন—প্রাণখোলা হাসির ছটায় মেহেদী রঙের দাড়িগুলিতে একটা আলোর ঝিলিক ঠিকরে পড়ত যেন।

টুকরো-টুকরো কত ছবি আজ মনে পড়ে! মনে পড়ে স্বরূপদাস সাধুর কথা। একটা জীর্ণ আলখাল্লা গায়—হাতে খঞ্জনী, কাঁধে শতচ্ছিন্ন ভিক্ষার ঝুলি। কিন্তু মুখে নিশ্চিত প্রত্যয়ের কী অপূর্ব প্রশান্তি। এক পা উর্ধ্বে খঞ্জনী বাজিয়ে সে গাইত—

"এতদিন পরে ঘরে এলিরে রামধন,
মা বলে ডাকে না ভরত,
মুখ দেখেনা শত্রুঘন-ন্-ন্।"

তখন অনুতপ্তা কৈকেয়ীর মর্মজ্বালা যেন যুগযুগান্ত পেরিয়ে আমাদের মনের ভেতরটা ছুঁয়ে যেত। বাড়ির সবাই এসে জড় হয়েছে উঠানে, স্বরূপদাস খঞ্জনী বাজিয়ে নেচে-নেচে গান গাইছে। বাড়ির কুকুরটা পর্যন্ত অবাক হয়ে দেখছে—মাঝে-মাঝে কান খাড়া করে বোধহয় গানও শুনছে। সকলে ফরমাস করে যাচ্ছেন—স্বরূপদাস অক্লান্তভাবে গান গেয়ে চলছে—কখনো বা দেহতত্ত্ব, কখনো বা শ্যামা-সঙ্গীত, কখনো বা কৃষ্ণ-রাধিকার বিরহ-মিলন-কথা। যাওয়ার সময় কয়েকমুঠো চাল, কারোর দেয়া কিছুটা ডাল এবং আনাজ ঝুলিতে পুরে গুন্ গুন্ করে চলে যেত স্বরূপদাস।

আমাদের গ্রামে সঙ্কীর্তনের রেওয়াজ ছিল খুব বেশী। প্রতি সন্ধ্যাতেই কীর্তন হত। রমণী পালের হাত ছিল মৃদঙ্গের বোল ফোটাতে ওস্তাদ। সরু লিকলিকে চেহারা—চুলগুলি বড়-বড়। কীর্তনের সময় মৃদঙ্গটি কাঁধে ঝুলিয়ে সে যে-ভাবে লাফাতে থাকত ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাতে আমরা অবাক হয়ে যেতাম। বড়-বড় চুলগুলি একবার এ পাশে আর একবার ওপাশে কাৎ হয়ে পড়ছে, এক-একবার এক-একটি প্রচণ্ড লাফ দিয়ে সে যাচ্ছে ডান দিক থেকে বা দিকে আর মৃদঙ্গের বোলে আওয়াজ ওঠছে যেন গম্ভীর ওঙ্কারধ্বনির মত। একবার জরগায়ে অষ্টপ্রহর সংকীর্তনে মৃদঙ্গ বাজাতে গিয়ে রমণী পাল মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিল—অস্নাত, অভুক্ত অবস্থায়। কিন্তু তবু সে মৃদঙ্গ ছাড়ে নি। কিন্তু আজ—আজ সে রমণী পালের কাঁধে আর মৃদঙ্গ নেই—শানবাঁধান শহর কলকাতার পথে-পথে সে আজ ফিরি করে ফিরছে।

এক সময় আমাদের গ্রামে 'নিমাই সন্ন্যাস' পালাকীর্তনের ঢেউ আসে। প্রথম পালাকীর্তনের অনুষ্ঠান হয় আমাদের বাড়িতে। উত্তরপাড়ায় বংশী, খগেশ, নীরু, আবু--এসব ছেলেরা এতে অংশ গ্রহণ করে। বলাবাহুল্য, সেদিন উত্তেজনা ছিল প্রচুর—আয়োজন ছিল না। সাজ পোশাকের কোন বালাই ছিল না। খগেশ নিমাই সন্ন্যাসের পালায় শ্রীরাধার ভূমিকায় অভিনয় করে। শুক-সারী এসে গাইছে—

"ওঠ-ওঠ রাইশশী
ভোর হল অমানিশি—"

ও হরি! শ্রীমতী রাধিকা প্যান্ট পরেই সলজ্জ ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে শুক-সারীর প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন! কিন্তু সমস্ত দর্শকসমাজ এমনি অভিভূত হয়ে রয়েছিল যে, এতে তাদের বিন্দুমাত্র রসবোধের ব্যাঘাত ঘটেনি।

শচীমাতার বিলাপে হিন্দু-মুসলমান সকলের চোখ সজল হয়ে ওঠে। ভোর হতেই পালা শেষ হযে বের হল প্রভাত ফেরী। কাঁপা-কাঁপা, টানা-টানা সুরে সে কী গান—আমাদের বাড়ির প্রবেশদ্বাররক্ষী ছিল দুটো বড় তেঁতুল গাছ—ও তল্লাটে এত প্রকাণ্ড গাছ আর ছিল না। তার চিকণ-চিকণ পাতার ঝালর ছিঁড়ে সূর্যের আঁকাবাঁকা আলো এসে পড়ছে; আলো আর সুরে কী নেশাই না সেদিন লেগেছিল!

আমাদের গ্রাম থেকে কয়েক মাইল দক্ষিণে সাঁচার। সেখানকার 'রথযাত্রা' আমাদের অঞ্চলে বিখ্যাত। প্রতিবছরই আমাদের বাড়ির নৌকো করে আমরা সবাই রথযাত্রায় যেতাম। সকাল-সকাল খেয়ে-দেয়ে আমরা রওনা দিতাম। আশে পাশে আরো কত নৌকো—কত দূরদেশ থেকে, কত ভিন্ গাঁ থেকে এরা আসছে। নৌকোর ছইয়ের উপর কারো কারো দেখছি জ্বালানীকাঠ বাঁধা—অর্থাৎ ২।৩ দিন আগে থেকেই তারা রওনা দিয়েছে। রাস্তায় রাস্তায় বাজার বা গঞ্জে নৌকো ভিড়িয়ে তারা আহার পর্ব সমাধা করে।

জগন্নাথদেব দর্শন ও রথের রশি ছোঁয়া নিয়ে ধর্মভীরু যাত্রীদলের সে কী উন্মত্ত উন্মাদনা! কারো জামা ছিঁড়ে গেছে, রথের রশির কাদায় সর্বাঙ্গ চিত্রবিচিত্র হয়ে ওঠেছে, কিন্তু সেদিকে কারো লক্ষ্য নেই—মুখে শুধু 'জয় জগন্নাথ' ধ্বনি। অদূরে অপেক্ষমান মেয়েরা হুলুধ্বনি দিচ্ছেন ক্রমাগত শঙ্খ-

কাসর-ঘণ্টার আওয়াজ, নারীকণ্ঠের হুলুধ্বনি জনতার জয়ধ্বনি মিলে-মিশে একটি বিরাট শব্দস্তম্ভ রচনা করেছে যেন—চারদিকে মানুষের কেবল মাথার সমুদ্র—তার মধ্য দিয়ে চলেছে জগন্নাথের রথ। বিকেলের সূর্য তার উপর আবির ছড়িয়ে দিচ্ছে মুঠো-মুঠো। সে দৃশ্য কি কখনও ভুলতে পারি ?

রথযাত্রা শেষে যাত্রীদলের বাড়ি ফেরার পালা। সন্ধ্যার অন্ধকার এসেছে ঘন হয়ে। নৌকোয়-নৌকোয় সবাই ফিরছে—আর চারদিকে খোঁজাখুঁজি চলছে যারা এখনো ফেরেনি ঃ মাঝি তাদের হাঁক দিচ্ছে—সন্ধ্যার শান্ত আবহাওয়ায় কাঁপা-কাঁপা ঢেউ তুলে সে ডাক আস্তে-আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। ছেলেরা কেউ সদ্যক্রীত মেলার বাঁশিতে তুলেছে বিচিত্র বেসুরো আওয়াজ—কেউ ধরেছে গান। অপূর্ব—অপূর্ব !

এমনি কত কথা—কত ছবি আজ মনে পড়ে। কত কথা বলব আর কত ছবি আঁকব ? বুকের পাঁজর খুলে দিতে কি ব্যথা তা কি কেউ কখনো বলে বুঝাতে পারে ? হয়তো এমন দিন আসবে, যেদিন স্বরূপদাসের সেই গান—সেই গান গেয়ে কেউ আমাদের জন্য এগিয়ে এসে বলবে—

"এতদিন পরে ঘরে এলিরে রামধন,
মা বলে ডাকে না ভরত, মুখ দেখেনা শত্রুঘ্ন—"

সেদিন কতদূরে ?

চান্দিসকরা

বাড়ি থেকে চিঠি এসেছে ঃ আমাদের কপালে যা আছে তাই ঘটবে, কিন্তু তুমি এ অবস্থায় কিছুতেই গ্রামে এস না।

চিঠি পড়ে মনটা কেঁদে উঠল। আমার বাড়ি, আমার গ্রাম, আজ তার দ্বার আমার কাছে রুদ্ধ। যে পথের ধুলি মিশে রয়েছে আমার অস্তিত্বের সঙ্গে, যে গ্রামের জল-কাদা, আলো-বাতাস গায়ে মেখে জীবনের পথে এক পা এক পা করে এগিয়ে এসেছি—আজ সে গ্রামে ফিরে যাওয়া আমার নিষেধ, সেখানে আমি নিরাপদ নই!

চিঠিখানা চোখের সামনে পড়ে রয়েছে। উর্দু আর ইংরেজিতে লেখা টিকিটের মাঝখানে পাকিস্তানী 'ন্যায়পরায়ণতার' তুলাদণ্ড আঁকা—তার ওপরে জ্বলজ্বল করছে আমার গ্রামের ডাকঘরের ছাপ। এই ডাকঘরের ওপর কি বিরাট আকর্ষণ ছিল। ডাক আসবার এক ঘণ্টা আগে গিয়ে ডাকঘরে বসে থাকতাম—কলকাতা থেকে খবরের কাগজ আসবে, বিভিন্ন জায়গা থেকে বন্ধুদের চিঠি আসবে—সারাদিনের একঘেয়েমীর ভেতর এটা ছিল মস্তবড় সান্ত্বনা। আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে রোজ বেলা দশটা-এগারোটার সময় ঝুন্‌ঝুন্‌ করে ঘণ্টা বাজিয়ে চলে যেত ডাক-হরকরা। ছেলেবেলায় সেই ঘণ্টার প্রতি অদ্ভুত আকর্ষণ ছিল। যেখানেই থাকতাম, হরকরার ঘণ্টা শুনলেই ছুটে এসে দাঁড়াতাম রাস্তার পাশে। দেখতাম হাঁটুর ওপরে লুংগী পরে, একটা খাকী সার্ট গায়ে দিয়ে ধূলোমাখা খালি পায়ে, ডাকের ঝোলা কাঁধে নিয়ে ছুটে চলেছে হরকরা। কোন কোনদিন আমাদেরই পুকুরের শান-বাঁধানো ঘাটের পাশে, বকুল গাছের ছায়ায় এসে সে দাঁড়িয়ে পড়ত। ঘাটের একটা সিঁড়িতে ঝোলা রেখে নেমে যেত জলের মধ্যে, মুখ-হাত ধুয়ে মাথায় জল দিয়ে আবার সে রওনা হত—কাঁধের ঝোলা থেকে শব্দ আসত, ঝুন-ঝুন ঝুন্‌-ঝুন্‌। ভট্টাচার্য বাড়ির কাছ থেকেই ডাকঘরের রাস্তা গেছে বেঁকে—তারপর হরকরাকে আর দেখা যেত না। কিন্তু তার ঘণ্টার অনুরণন তখনো বাজত আমার কানে। আজো তেমনি করেই হয়তো হরকরা ছুটে চলেছে তার ঘণ্টা বাজিয়ে—এ-চিঠিখানাও

সে-ই বহন করে এনেছে। কিন্তু তার সেই ঘণ্টা শোনবার জন্যে আমি আর সেখানে নেই!

সপ্তাহে দু'বার করে আমাদের গ্রামে যে বিরাট হাট বসে তার মালিক আমরা। হাটের খাজনা আদায় করবার ভার পাঁচজন ইজরাদারের ওপর—সকলেই তারা মুসলমান। প্রতি হাট-বারে কয়েক সহস্র লোক জড়ো হয় বেচা-কেনার জন্যে। ছেলেবেলায় আমাদের হাটে যাওয়া বারণ ছিল—পাছে হারিয়ে যাই এই ভয়ে। হাটে যাবার একটা বড় পথ ছিল আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে। সে পথের ধারে আমাদের পুকুর আর তাঁর বাঁধানো ঘাট, সেই ঘাটে গিয়ে বসে থাকতুম। কত লোক হাটে যেত সে পথ দিয়ে—কেউ তরকারী নিয়ে, কেউ মনোহারী জিনিস নিয়ে, কেউ হাঁস-মুরগী নিয়ে, কেউ কাঠ-বাঁশ নিয়ে—এমনি কত সব দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নিয়ে ওরা যেত। কুমোরপাড়া তাঁতীপাড়া, কামারপাড়া ইত্যাদি অঞ্চলের শ্রমজীবী লোকেরা যেত তাদের নিজ নিজ জিনিস নিয়ে। বসে বসে আমরা দেখতুম। শেষবেলার দিকে ছুটতো জেলেরা। দূর গাঙ্গে ওরা চলে যেত মাছ ধরতে, তাই হাটে যেতে তাদের দেরী হত। মাছের ভারে নুয়ে পড়ত তাদের ইস্পাতের মত দেহ, ঘামে নেয়ে উঠত প্রতিটি লোমকূপ। দৌড়ে দৌড়ে যেত ওরা—জেলেদের আস্তে হাঁটতে কখনো আমি দেখিনি। হাটের পথে যেতে যেতে কত কথা ওরা কইত—তার ভেতর রাজনীতি ছিল না, অর্থনীতি ছিল না, ঘরের কথা, দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাটো সুখ দুঃখের কথা, আশা-নিরাশার কথা—এ নিয়েই মন তাদের ভরে থাকত।

আগেই বলেছি আমাদের পুকুরের বাঁধানো ঘাটের দু'ধারে মস্তবড় দুটো বকুলগাছ। বকুল ফুল পড়ে ঘাটের চাতাল সকাল-সন্ধ্যায় সাদা হয়ে থাকত। তার মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে পড়ত বাড়ির অন্দর-মহল পর্যন্ত। ঘাটের যে সিঁড়িগুলো জল পর্যন্ত পোঁছে গেছে তাতে বসে গ্রামের ব্রাহ্মণরা আহ্নিক করত দুবেলা। আর ওপরের বিস্তৃত চাতালে মুসলমানরা পড়ত নামাজ। হাট বারে ঘাটটাকে বিশেষ করে ঝাড় দিয়ে রাখা হত—কারণ সেদিন কয়েক শ' লোক আমাদের ঘাটে আসত নামাজ পড়তে। এক সারিতে ৪০।৫০ জন দাঁড়িয়ে যেত। সারিতে দাঁড়ান এতগুলো লোকের একই সঙ্গে ওঠা-বসার ভেতর কেমন একটা ছন্দের দোলন ছিল, যা আমার খুব ভাল লাগত। প্রতিদিন এমনি দৃশ্য দেখতে দেখতে তার ছাপ চিরতরে পড়ে গেছে মনের পর্দায়, সারা জীবন গ্রামছাড়া

থাকলেও একে আমি ভুলে যাব না। আজো এ নিয়মের ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই হয়নি, আজো তারা একইভাবে আল্লার উপাসনা করছে আমাদের ঘাটে—কিন্তু পাশে বসে আহ্নিক করবার মত কেউ হয়তো আর নেই!

হাট-বারে যে দুটো লোককে সবচেয়ে বেশী করে মনে পড়ত তারা হচ্ছে আমিরউদ্দিন আর মাখ্খু মিঞা। ওরা ছিল আমাদের হাটের ইজারাদার। হাট ভেঙ্গে যাবার পর আমাদের জন্যে চীনেবাদাম, ছোলাভাজা ইত্যাদি খাবার নিয়ে রাত্রিবেলায় ওরা আসত। শীতের সময় পেতাম বড় বড় কুল। বহু বছর আগে বড়দার সঙ্গে আমিরউদ্দিন এসেছিল কোলকাতায়। কোলকাতার মত শহর যে পৃথিবীতে থাকতে পারে এ ছিল ওর কল্পনার বাইরে। শেয়ালদা থেকে পথে নেমে সে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে রইল, বুঝতে পারল না সত্যি একি মাটির পৃথিবী, না রূপকথার স্বপ্নপুরী! কিন্তু তার পরের রাত্রিতেই আমিরউদ্দিন যা কাণ্ড করলে, তা ভেবে কতদিন আমরা হেসেছি। তখন রাত বারোটা কি কি একটা হবে—হঠাৎ ঝুপ্-ঝুপ্ করে বৃষ্টি নামল। তার আগের কয়েক মাস ভয়ানক খরা যাচ্ছিল—এতে ফসলেরও ক্ষতি হয়েছিল প্রচুর। বৃষ্টির আওয়াজ কানে আসতেই আমিরউদ্দিন ধড়মড় কবে বিছানা থেকে উঠে পড়ল। দাদাকে ডেকে বললে: 'বাবু, কাইলই আঁই বাড়ি যামুগই। খোদার দোয়ায় বিষ্টি অইল, খ্যাতে লাঙল ফেলাইতে না পাইল্লে, এ-খন্দে আর চাইল ঘরে তুইলতে পাইত্যাম ন। উবাস মরুম। আঁ'রে ইস্টিশনে নিয়া কাইল সকালেই গাড়িত্ তুলি দি আইয়েন, বাবু।" অনেক বোঝানো সত্ত্বেও আর একদিনের জন্যেও কোলকাতায় থাকতে রাজি হল না আমিরউদ্দিন। মাঠের ডাক এসেছিল তার জীবনে, লিকলিকে ধানের শীষের সোনালী স্বপ্নের কাছে কোলকাতার ঔজ্জ্বল্য ম্লান হয়ে গেল।

সেদিন আমিরউদ্দিনের বোকামী দেখে হেসেছিলাম—আজ বুঝতে পারছি গ্রামের আকর্ষণ গ্রামের ছেলের কাছে কত প্রবল, কত গভীর। দিগন্তবিস্তৃত ধানক্ষেতের স্বপ্ন কোনদিন কি ভুলে যেতে পারব? ধানকাটা সারা হবার পর শুরু হত আমাদের ঘুড়ি ওড়ানোর পালা। কত ধুলো গায়ে মেখেছি, দৌড়তে গিয়ে কতবার হোঁচট খেয়ে পড়ে গেছি—কত রক্ত মাঠের ধুলির সঙ্গে মিশে রয়েছে! সেই মাঠ পেরিয়ে দুপুরের খাঁ খাঁ রোদে বাড়ি থেকে পালিয়ে চলে যেতাম মনুমিঞার বাড়ি। মনুমিঞা আখের চাষ করত, তার ওপর ছিল আমাদের লোভ।

রেজ্জাক মিঞার খেজুরের রসও কি আমাদের কম প্রিয় ছিল। রাত্রিতে রস পড়ে হাঁড়ি ভর্তি হয়ে থাকত—সকালে সে রস বিক্রির জন্যে পাঠান হত গ্রামের বাড়িতে বাড়িতে। আমাদের বাড়িতেও খেজুরের রস কেনা হত পায়েস বানাবার জন্যে। আমাদের মন কিন্তু তাতে ভরত না। রেজ্জাক মিঞা ভোর বেলা যখন গাছ থেকে রসের হাঁড়ি নামাত, আমরা গিয়ে গাছের তলায় দাঁড়িয়ে থাকতাম। আমাদের লোলুপ দৃষ্টি দেখে রেজ্জাক মিঞা কিছু রস আমাদের মধ্যেই বিলিয়ে দিত।

ঘটা করে দুর্গা পুজো হত আমাদের বাড়িতে। পুজোর কটা দিন লোকজনের ভিড়ে সারাটা বাড়ি গমগম করত। পুজো উপলক্ষে একদিন স্থানীয় বিশিষ্ট মুসলমান ভদ্রলোকদের নেমতন্ন করে খাওয়ান হত। পুজোর প্রসাদ তাঁরা খেতেন না, তাই তাঁদের জন্যে বন্দোবস্ত করা হত আলাদা খাবারের। পুজো মণ্ডপের পাশেই আমাদের বৈঠকখানা ঘর। বিরাট আলোর ঝাড়ের তলায় পরিষ্কার চাদর আর তাকিয়া দিয়ে ফরাস পাতা হত। সকলে বসতেন সেখানে। আমরা ভয়ে বৈঠকখানা ঘরে ঢুকতাম না—আশে পাশে ধুরঘুর করে বেড়াতাম। আশরাফউদ্দিন, সোনা মিঞা, কালা মিঞা প্রভৃতি সকলেই হলেন গ্রামের প্রবীণ ব্যক্তি। বহুকাল থেকেই আমাদের বাড়ির সঙ্গে নিবিড় ঘনিষ্ঠতা এঁদের। আমাদের পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে কত গল্প শুনেছি এঁদের মুখ থেকে। পুজোর সময় জিনিসপত্র যোগাড় করে দেবার ভার থাকত এঁদের ওপর—কোন্ জিনিস কত পরিমাণ প্রয়োজন এঁরা সব জানতেন। এঁরা সকলেই চাষী—কিন্তু গুরুজনদের মতই এঁদের আমরা সমীহ করে চলতাম। ভালোবেসে এঁরা আমাদের কচি মন জয় করেছিলেন।

এমনি কত শত সাধারণ দৈনন্দিন স্মৃতি আজ ভিড় করে দাঁড়িয়েছে মনের দ্বারে। ছেড়ে আসা গ্রামের ফেলে আসা দিনগুলো জীবন্ত হয়ে উঠছে আমার অন্তরলোকে। এদের কোনটিই বিশেষ ঘটনা নয়—অতি সহজ সরল, সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের সুখ দুঃখ, হাসি-কান্নার কথা। একদিন এর তেমন কোন মূল্যই হয়তো আমার কাছে ছিল না, কিন্তু আজ তাকে হারিয়েছি, তাই সে হয়ে উঠেছে অমূল্য। একই গ্রামবাসী হিসেবে যুগ যুগ ধরে আমরা হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি বাস করে এসেছি—শুধু ধর্মবিশ্বাস ছাড়া আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ও চিন্তা-ধারার ভেতর আর কোন তফাৎই ছিল না। দেশে যখন সমৃদ্ধি এসেছে হিন্দু-

মুসলমানের জন্যে সমানভাবেই এসেছে। যখন বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারীর তাণ্ডব শুরু হয়েছে, তখনো হিন্দু-মুসলমানের জীবনে সমান ভাবেই পড়েছে তার অভিশাপ। কিন্তু কোন্ এক অশুভ মুহূর্তে ঘোষণা করা হল : হিন্দু-মুসললান পরস্পরের শত্রু, এদের ভেতর কখনই মিলন হওয়া সম্ভব নয়! মুনলমান-প্রতিবেশী নতুন চোখে তাকাল হিন্দু প্রতিবেশীর দিকে। বললে, তুমি আমার শত্রু—এতদিন যে আমরা পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে বাস করে এসেছি, তা মিথ্যে—এতদিন যে বন্ধুর মত, ভাইয়ের মত ব্যবহার করেছি, তাও মিথ্যে—শত শত বছর ধরে তোমাতে আমাতে যে আন্তরিকতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তা কখনোই সত্যি নয়! যে শত্রুতা হিন্দু-মুসলমানের ভেতর কোনদিন ছিল না, দিনের পর দিন ধরে বিষাক্ত প্রচারের ফলে সে শত্রুতা 'সৃষ্টি' করা হয়েছে শুধু মাত্র একটি দুষ্ট রাজনৈতিক চক্রান্ত সফল করবার জন্যে।

সফল হয়েছে সে চক্রান্ত। মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, ছল, চাতুরীর দ্বারা দেশকে করা হয়েছে দ্বিখণ্ডিত। হিন্দু মুসলমানের সামাজিক ঐক্য, রাজনৈতিক ঐক্য, ভাব-ভাষা, চিন্তা-কল্পনা-সুখ-দুঃখ-হাসি-কান্নার ঐক্য নির্মমভাবে হার মানল ধর্মবিশ্বাসের অনৈক্যের কাছে। একটা জাতির জীবনে এর চেয়ে বড় অভিশাপ আর বোধ হয় হতে পারে না। লক্ষ লক্ষ মুসলমানের লক্ষ লক্ষ প্রতিবেশী আমরা আজ হলাম ঘরছাড়া, দেশছাড়া!

কিন্তু এই ভৌগোলিক অস্ত্রোপচার আমাদের মনের নিবিড় ঐক্যকেও কি স্পর্শ করতে পেরেছে? না—পারে নি। কোলকাতার নিষ্ঠুর নির্মম পরিবেশের মধ্যে মনের শান্তি কোনদিন আমাদের আসবে না, আসতে পারে না। কোলকাতার আকাশ-বাতাস, আলো-আঁধার, জল-মাটি, গাছ-পালার সঙ্গে আমার গ্রামের প্রকৃতির তফাৎ বৈজ্ঞানিকের চোখে হয়তো নেই, কিন্তু যে আলোতে প্রথম আমি চোখ মেলেছি, যে মাটি আমাকে বক্ষে ধরেছে, যে বাতাস ঘোষণা করেছে আমার জন্মবার্তা—তাকে আমি কেমন করে ভুলব, তার স্পর্শ যে আমার অস্তিত্বের অণুতে-অণুতে মিশে রয়েছে। আমার গ্রামের প্রতিটি ধূলিকণা, প্রতিটি জলবিন্দু, প্রতিটি লতাগুল্মের সঙ্গে আমার নাড়ির যোগ। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের সঙ্গে আমার অন্তরের বাঁধন—একটা কলমের আঁচড়ে সে সবই কি মিথ্যে হয়ে গেল!

আমরা বাস্তুহারা, শরণার্থী—ভারতের দুয়ারে ভিক্ষাপ্রার্থী : এই আমাদের

একমাত্র পরিচয় আজ। এই পরিচয়ের রক্তাক্ত টীকা ললাটে এঁকে কোলকাতার পাষাণ-দুর্গের নিষ্ঠুর বন্ধনের মাঝখানে বসে আমি আজ অশান্ত মনে চেয়ে রয়েছি আমার ছেড়ে আসা গ্রামের দিকে।

রঘুনন্দন পাহাড়ের গা ঘেঁষে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা পর্যন্ত যে বিরাট ট্রাঙ্ক রোড চলে গেছে, তারই একধারে ত্রিপুরা জেলার দক্ষিণ প্রান্তে, কুমিল্লা সদরের অন্তর্গত আমার গ্রাম। নাম তার চান্দিসকরা। শুনেছি এককালে আমাদের গ্রামের নাম ছিল 'চন্দ্র-হাস্য-করা' চান্দিসকরা তার সংক্ষিপ্ত রূপ। চান্দিসকরার আকাশ জুড়ে আজো চাঁদ হাসছে, প্রকৃতির সাজ বদল ঋতুতে ঋতুতে যথানিয়মেই চলেছে,—বকুল ফুল পড়ে সাদা হয়ে যাচ্ছে আমাদের বাঁধানো ঘাট,—চাঁপা-টগর-রজনীগন্ধা-হাসানুহানা-ভূঁইচাঁপার গন্ধে ভোরের বাতাস আজো চঞ্চল হয়ে উঠছে, —আম-কাঁঠাল-জাম - জামরুলের ভারে গাছগুলো নুয়ে পড়ছে,—মাছের তাণ্ডবে অশান্ত হয়ে উঠছে দীঘির কালো জল, কাল বৈশাখীর প্রলয় নাচন শুরু হয়ে গেছে আকাশে-বাতাসে—মুসলমান চাষীরা দিন গুণছে মেঘের আশায়, কবে বিষ্টি হবে, কবে ক্ষেতে লাঙ্গল পড়বে: এ-সব, সব আমি আজ দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। আমার এ দেখায় ভুল কোথাও নেই—আমি যে আমারি গ্রামের ছেলে! কিন্তু—তাঁতী পাড়ার তাঁত আজ আর চলছে না, কুমোরের চাকা ঘুরছে না, কামারের লোহা জলছে না, ছুতোরের বাটালী আজ নিস্তব্ধ! পৈতৃক ভিটা, পৈতৃক পেশার মায়া ত্যাগ করে তারা আজ দলে দলে হারিয়ে যাচ্ছে পূর্ববঙ্গের লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর ভিড়ের ভিতর। আমিও তাদেরি সগোত্র—চলতে চলতে ভাবছি: উল্টো রথের পালা আসবে কবে!

বালিয়া

নিশুতি রাত ··কৃষ্ণাচতুর্দশীর সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্য দিয়ে অতি সন্তর্পণে এগিয়ে চলেছে আমাদের নৌকোখানি। নৌকোর ছইএর দু-দিকই আবৃত··· সম্মুখ ভাগে বসে অতি স্বচ্ছন্দমনে গান গাইছে প্রতিবেশী কাসেম ভূইঞা···পেছন থেকে লগী দিয়ে নৌকো বেয়ে চলেছে যামিনী টিপ্‌রা। ছইএর ভেতরে আমরা চারিটি প্রাণী। সারাদিনের দারুণ অশান্তি আর উত্তেজনায় অবসন্ন। সর্বোপরি বর্তমানে জীবন পর্যন্ত সংশয়। কোনক্রমে শহরে গিয়ে পৌছুতে না পারলে রাত্রি-শেষে নররূপী পশুদের হামলা অবশ্যম্ভাবী—দিনের বেলায় গ্রামের মেয়েদের, বুড়োদের এবং শিশুদের শহরের নিরাপদ আস্তানায় পৌছে দেয়া হয়েছে। এ অঞ্চলে আমরা শুধু ছিলাম রাত্রির অবস্থা দেখে তারপর একটা চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করব এই ভেবে। কিন্তু গোধূলির ধূলি উড়বার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রামের দক্ষিণপ্রান্তে দলবদ্ধভাবে আক্রমণ, লুণ্ঠন ও জখমের সংবাদ এল—প্রান্তীয় বড় সড়ক ধরে মশালের সাহায্যে হামলাকারীর দল হৈ-হল্লা করতে করতে এগিয়ে চলেছে,— কোথাও বা সারি সারি নৌকোর সাহায্যে ওরা অন্তবর্তী বিল জলা প্রভৃতি পার হয়ে একের পর এক বাড়িতে হানা দিচ্ছে। এ সব দৃশ্য আমাদের বাড়ির পূব দিকের রাস্তায় দাঁড়িয়েই দেখা গেল। অবশেষে ও পাড়ার রহমাণ খাঁ এসে যখন জানাল—রাত্রিতে আমাদের বাড়ি আক্রমণের প্ল্যান হয়েছে এবং চারিদিকের আবহাওয়াকে বাগে এনে সর্বশেষে গ্রাম-কেন্দ্রের এই শক্ত ঘাঁটিটিকে বিপর্যস্ত করাই তাদের অভিপ্রায়—তখন আমাদের সম্মুখে নিরস্ত্রভাবে নিশ্চিত মৃত্যুবরণ কিংবা আত্মরক্ষার জন্যে আত্মগোপন এ দুটির একটি পথই শুধু খোলা রইল। রহমাণ জানাল, আমাদের বাড়িতে সম্প্রতি যে কয়েকটি বড় বড় বাক্স-পেঁটরা আমদানী করা হয়েছে তাতে বহু অস্ত্রশস্ত্র ছিল বলেই ওদের বিশ্বাস,—তাই শক্তি পুরোদস্তুর সংগ্রহ করে তবেই ওরা এখানটায় হানা দেবে এবং সেটা এ রাত্রেই! কিন্তু ওদের বিশ্বাস বা সাময়িক ভয়ের কারণ যাই হোক, শূন্য বাক্স-পেঁটরা এবং নিছক বাঁশের লাঠির উপর ভরসা করে আমরা চারটি প্রাণী সহস্রাধিক ক্ষিপ্ত পশুর সম্মুখীন হবার সিদ্ধান্ত নিতে পারিনি। রাত্রিও প্রায় শেষ—অগত্যা কৌশলে পথের সুরক্ষিত ঘাঁটি পার হয়ে শহরে গিয়ে প্রাণ বাঁচানোর পন্থাই

সাব্যস্ত হল ! প্রতিবেশী কাসেমখাঁর মস্তিষ্কের সুস্থিরতার কোন প্রমাণই কোনদিন পাইনি। আজ হঠাৎ এ রকম দুঃসময়ে সে-ই অগ্রণী হয়ে এসে আমাদের নিরাপদে ঘাঁটি পার করে দেবার দায়িত্ব নিয়ে সত্যি অবাক করে দিল।

নৌকো-ঘাট ছেড়ে মাইলটাক দূরে ওদের ঘাঁটি। খালের এপারে-ওপারে ছাউনি ফেলে শিবির তৈরী করা হয়েছে। যেন একটি 'কাফেরও' বিনাক্লেশে গ্রাম থেকে বেরিয়ে যেতে না পারে ! দুপুরের দিকটায় এদের হাতেই ঘোষেদের বাড়ির নৌকোবোঝাই যাবতীয় মালপত্র লুন্ঠিত হয়েছে, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে নৌকোর যাত্রীদের যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনা করা হয়েছে—পূর্বেই শুনেছিলাম।

কে যায় ?—মেজাজী স্বরে প্রশ্ন আসে একটা ছাউনির মুখ থেকে।

আমি কাসেম ভূইঞা।—কে রে ? ইসমাইল নিহি ?—কাসেম গান থামিয়ে ওদের প্রশ্নের জবাব দেয় এবং নিতান্ত নির্লিপ্তকণ্ঠে প্রতি-প্রশ্ন করে।

আরে এত রাত্রে যাচ্ কই ?—কাসেমের উত্তর ঃ 'কই আর যামু,—যাই—রাইত পোয়াইলেঃ ত প্যাটের চিন্তা,—তার ব্যবস্থার লাইগ্যা।

কাসেমের ব্যবসা দুধবিক্রী। গৃহস্থ বাড়ির দুধ দাদন দিয়ে দীর্ঘকালীন বন্দোবস্থ নেয়, প্রত্যহ ভোরে তা ই বাড়ি বাড়ি থেকে সংগ্রহ করে শহরের মিষ্টির দোকানগুলিতে সে চালান দেয়। কাসেমের জবাবে ওরা সন্তুষ্ট হল, তাই আমাদের নৌকোও অবাধে বেরিয়ে এল সামনের দিকে !

এমনি করে সর্বনাশা ছেচল্লিশের এক নিশীথ রাত্রে মহা-অপরাধীর মত নিজের পরমপ্রিয় পুণ্যতীর্থ জন্মভূমি, জন্মগ্রাম থেকে নিঃশব্দে বিদায় নিয়ে এলাম।···তারপর দীর্ঘ বছরের পর বছর কেটে গেছে—কিন্তু মুহূর্তের জন্যেও সে মা-টির কথা ভুলতে পারিনি। আজন্ম যার আলো-হাওয়া আমার জীবনকে বর্ধিত করেছে, যার মাঠ-ঘাট-বাট-বন অনুক্ষণ প্রভাবিত করেছে আমার মন, জ্ঞানোন্মেষের পর থেকে যাকে কেন্দ্র করে দীর্ঘ পঁচিশ বছরের অসংখ্য ঘটনা স্মৃতির ভাণ্ডার করেছে সমৃদ্ধ, মুহূর্তের তরেও তাকে ভুলি কী করে ? আজও প্রতিমুহূর্তেই তাই শুধু পিছু-ডাক।

পূর্ববঙ্গের ভয়ঙ্কর নদী মেঘনা। তারই পূর্বপারে অবস্থিত সুবৃহৎ রেল ও ষ্টীমার জংশন, বাণিজ্যবহুল বন্দর চাঁদপুর। আসামের কুলীধর্ম-ঘটকে কেন্দ্র করে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের নেতৃত্বে চাঁদপুরের ঐতিহাসিক আন্দোলন, জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম ও সংগঠনকর্মে উৎসর্গাকৃত প্রাণ ভারতের

প্রবীণতম, সর্বজন শ্রদ্ধেয় জননেতাদের অন্যতম হরদয়াল নাগের কর্মসাধনা চাঁদপুরের পরিচয়কে ভারতের দূরতম প্রান্ত অবধি প্রসারিত করেছে। নূতনবাজার খেয়া পার হলেই কয়েকটি পাটের কল, তার গা ঘেঁসে এঁকে-বেঁকে রাস্তা চলেছে দক্ষিণমুখী, খানিকটা নীচু জমির হাঁটা-পথ ছাড়িয়েই জেলাবোর্ডের বড় সড়ক সোজা চলে গেছে পুবে ও দক্ষিণে··এমনি চল্‌তে চল্‌তে শহরের কোলাহল যখন নিঃশেষে বিলীন হয়ে যায়—যখন প্রায় দু'ক্রোশ পথ পড়ে গেছে পেছনে, সামনেই তখন ছায়ায় ঢাকা, পুবে ও পশ্চিমে, উত্তরে ও দক্ষিণে বৃক্ষরাজির আবেষ্টনীর মধ্যে ছায়াছবির মত চোখে পড়ে একটি গ্রাম—'বালিয়া': লৌকিক নাম 'বাইলা'। আধুনিক সভ্যতা নিয়ে গর্ব করবার মত কিছুই তার নেই,—কিন্তু প্রকৃতির অফুরন্ত, অজস্র আশীর্বাদ যে তাকে অনুক্ষণ ঘিরে রেখেছে গ্রামের সীমানায় পা দিতেই যে কোন পথিকের তা চোখে পড়ে। গ্রামটির প্রবীনতার সাক্ষ্য আর প্রতিক্ষণের জাগ্রত প্রহরীরূপেই যেন দাঁড়িয়ে আছে একটি সুউচ্চ তালগাছ আর তার পাশে জোড়া আমগাছ—গ্রামের ঠিক হৃৎপিণ্ডের ওপর,—সেনদের বাড়ির একেবারে সামনেটায়। জমিদার হিসেবে নয়, শিক্ষায় ও সামাজিক মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠ হয়েই এই বাড়ি দূরাতীত থেকে সসম্মান দৃষ্টি আকর্ষণ করে আসছে প্রতিবেশী গ্রামগুলোর।

আমাদের বাড়ি বরাবর গ্রামের সমুখে সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর, কোথাও উঁচু গাছপালা সূর্যিদেবের আত্মপ্রকাশের পথকে অবরুদ্ধ করে রাখেনি। তাই প্রভাতের স্নিগ্ধতা আর সূর্যালোক মিলিয়ে যে দুর্লভ মাধুর্য প্রকৃতিদেবী দুহাতে বিলাতে শুরু করেন, তার সম্মোহনে দলে দলে ছেলেমেয়ে ভীড় জমায় সেই আমগাছের তলায়; গাছের নবোদ্গত আম্র মুকুলে ঢিল ছোঁড়ে কেউ, কেউ বা অদূরে খালের হাঁটুজলে নেমে হাতমুখ প্রক্ষালণ করতে থাকে।

চাঁদপুর জংশনে মেঘনা থেকে যে শাখা-নদীটি শহরটিকে দু'ভাগে ভাগ করে দিয়ে এগিয়ে গেছে সম্মুখপানে,—প্রায় সহস্রগজ পরেই তার রূপান্তর ঘটেছে প্রকাণ্ড খালে, ক্রমে আরও সংকীর্ণ হয়ে এই খাল বাণিজ্যবাহী জলপথরূপে শহরের সঙ্গে সহস্রাধিক গ্রামকে সংযুক্ত করে নোয়াখালীর প্রান্তসীমায় গিযে মিশেছে। বর্ষায় তাই বাড়ির সম্মুখ দিয়ে সারি সারি চলমাণ নৌকোর মজা দেখতে সকাল-সন্ধ্যায় ছোটদের ভীড় জমে, বড়দের মধ্যে যাঁরা বিদেশবাসী, গাঁয়ে এসেছেন ছুটি-ছাটা উপলক্ষে, খালের পাড়ে এখানে সেখানে দুজন

চারজন করে দল বেঁধে পলিটিক্স চর্চা করছেন তাঁরা। জিন্না বড় পলিটিসিয়ান কি গান্ধী বড়, সূর্যসেন-অনন্ত সিং-এর আমলই ছিল ভাল কিংবা সত্যাগ্রহই এনে দেবে বাঞ্ছিত স্বাধীনতা, পড়ুয়া হাল-পলিটিসিয়ানদের মধ্যে তাই নিয়ে চলে অফুরন্ত বাক-বিনিময়।

...এই মাঝি নৌকা থামাও।— হঠাৎ হরিমোহন পরামাণিক খালের পাড় দিয়ে হেটে যেতে যেতে একরকম খালের জলে নেবেই একটা নৌকোর ছই শক্ত হাতে টেনে ধরে!

কী অইল বাবু?—ছই-এর উপর থেকে সশংক হয়ে প্রশ্ন করে মাল্লা, আর পেছন থেকে মাঝি একই সঙ্গে।

কী অইল? মাঠের মধ্য দিয়া পাল তুইল্যা যাইতেছ, জান না পাল তুইল্যা গেলে হেই জমিতে আর কোনদিন ফসল অয়না?

ও হো,—এই নামা-নামা, পাল নামা।—মাঝির নিজেরও হয়ত চাষবাস আছে, তাই শস্যক্ষতির আশংকাটা তার মনে সহজেই প্রবল নাড়া দেয়।

বর্ষার নতুনজলে খালে মাছ ধরার কী আনন্দ! পুঁটি, ট্যাংরা, বাতাসী আর কাজলী-বজরীর ঝাঁকীজালের ফাঁকিতে না পড়ে উপায় কি? জোছনা রাতে চাঁদা মাছগুলো চাঁদের আলোকে ঝিক্‌মিক্ করে ওঠে জালের ফাঁকে ফাঁকে। অমাবস্থায় পাকা ধরুয়াদের হাত যেন অবলীলাক্রমেই অন্ধকারের মধ্যে জাল থেকে রকমারী মাছগুলোকে খুলে নেয়—কাঁটার ঘা লাগেনা। প্রায় প্রত্যহ সন্ধ্যায় কালবৈশাখীর দৌরাত্ম্য। তারই মধ্যে বেপরোয়া হয়ে মাছ ধরা চলে,— মাঝে মাঝে কেবল কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে একজন অপর জনের অবস্থিতি জেনে নেয়।

সন্ধ্যা হতে না হতেই পাড়ায় পাড়ায় শিশুদের কাঁসর-ঘণ্টাধ্বনি আর অবিশ্রান্ত কলরব মুখরিত করে তোলে গ্রাম। মাঝে মাঝে খোল করতাল নিয়ে দলবেঁধে এ পাড়া থেকে ও পাড়া, এবাড়ি থেকে ও বাড়ি। আমাদের গ্রাম-পরিবেশের এ ছিল এক আকর্ষনীয় বৈশিষ্ট্য।

মাঝে মাঝে পালা সংকীর্তনের আসর জমে উঠতো আমাদের বাড়িতে কিম্বা আমাদের জ্ঞাতিবাড়ি পশ্চিমের বাড়িতে। গাইয়ে—'বাইলার দল'। আমাদের গ্রাম ও প্রতিবেশীগ্রামের প্রায় দু'ডজন কীর্তনীয়া আর কীর্তন-রসিক নিয়ে গড়া এইদল। বছর পাঁচ পুরাদস্তুর ট্রেনিং দিয়ে এরা সত্যিকারের একটা ভাল দল খাড়া করেছে।—'রাধার বিচ্ছেদ', 'নিমাইসন্ন্যাস', 'মানভঞ্জন', 'লক্ষণের

শক্তিশেল', 'নৌকাবিলাস'—প্রতিটি পালাগানের যেমন মর্মস্পর্শী রচনা, তেমনই তার সুর।

পূর্বের হিস্যার সোনাদার বার্ষিক শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়েছে, সন্ধ্যায় পালা-কীর্তনের ব্যবস্থা। ত্রিপল টানিযে দেয়া হয়েছে বিরাট উঠানের উপর। সবার ঠাই সতরঞ্চি আর মাদুর ইতিমধ্যেই শ্রোতৃসমাগমে ভরে গেছে। তাছাড়া এক পাশে গাছপিড়িতে অত্যন্ত আগ্রহভরে বসে আছেন আমাদের অশীতিপর বৃদ্ধ প্রতিবেশী ও প্রজা মেহেরুল্লা খাঁ এবং তাঁর আশে পাশে ইসমাইল শেখ, হরমোহন খাঁ, হামিদ ভুইঞা, ইয়াসিন গাজী, কলন্তর খাঁ, রহমাণ এবং আরও বহু মুসলমান। ফরমায়েস হল 'নিমাইসন্ন্যাস' হোক!

দলের দলপতি জগদীশ চন্দ আর রমেশ নাহা, মুল গায়েন হরিচরণ মহানন্দ, বায়েন (খোল-বাজিয়ে) বিভূতিদা, ওরফে বিভূতি পাগলা, দোঁহারদের মধ্যে প্রধান অনন্ত আর শিশির কাকা—কালু, ব্রজেন্দ্রকাকা, ছোট্টকাকা এরা দ্বিতীয় পংতির। আর একজন আছেন চিত্তদা। তিনি ক্ষীণদৃষ্টি, সত্যি কোনদিন কোন গান গেয়েছেন কিনা সঠিক কেউ বলতে পারেনা। তাহলেও কথা এবং সুরের সঙ্গে সঙ্গে তার মুখভঙ্গী অব্যর্থরূপে প্রমাণ করে তার কীর্তনপ্রিয়তার কথা। আসলে কীর্তনপ্রিযতা ও তত বড় কথা নয়, যতবড় কথা হচ্ছে দলের লিষ্টিতে নাম রাখা! তবে চিত্তদা কিন্তু গল্পরসিক। শুধু রসিক নন, গল্পস্রষ্টা! বারো হাত কাকুরের তেরো হাত বীচি আর তিলকে তাল করার অসংখ্য গল্প মুহূর্তে বানিয়ে গানের ফাঁকে ফাঁকে আসর জমাতে তাঁর জুড়ি নেই! হরিচরণ হাতের করতাল সহ হাতদুটি তুলে 'সভ্যগণ' সমীপে নমস্কার জানিয়ে শুরু করে :

'বাছা নিমাইরে,—বাছা নিমাই,
কোথায় গেলিরে,
দুঃখিনী মায়েরে ফেলে!'

কণ্ঠ যেমন তীক্ষ্ণ, তেমনই মধুর। প্রধান দোঁহার অনন্ত ও মোটেই 'ফ্যালনা' নয। ওদিকে বায়েন বিভূতি পাগলা এ তল্লাটের ওস্তাদ খোল বাজিয়ে। তাঁর খোল সত্যিই কথা কয়—আর এই খোল সহরতে তার নৃত্যের অপূর্ব ভঙ্গিমা 'বাইলার দলে'র প্রধান আকর্ষণ। উপযুক্ত সংগতের মধ্যে গান সহজেই জমে ওঠে। দ্রুততালে তখন গানের অপর একটি কলি গাওয়া হচ্ছে :

'নিমাই তোরে কোলে লব,
সব দুঃখ পাষরিব,
বড় আশা করেছিলাম মনে—
নিমাইরে !'

গান শুনতে শুনতে পুত্রশোকে শোকাতুরা দক্ষিণহিস্যার মণিদি সুরের মুর্ছনায় মূর্ছিতা হয়ে পড়েন ! তাঁকে নিয়ে উদ্ব্যস্ত হয়ে উঠেন মেয়েরা। গান চলতেই থাকে। গায়েন, বায়েন, দোঁহার শ্রোতা কেউ যে তখন আর এজগতে নেই ! অদ্ভুত অপূর্ব রসানুভূতি—আজও যার রোমাঞ্চ জাগে দেহে ও মনে।

সেনদের বাড়ির দোলউৎসব সুবিখ্যাত। সর্বজনীনতার মাধুর্য দিয়ে মণ্ডিত এ উৎসবের প্রতিটি অঙ্গ। গ্রামের সবাই, এমনকি আশপাশের গ্রামেরও বহু ছেলে-বুড়ো বর্ষঘুরে আসতেই এ উৎসবের প্রত্যাশায় দিন গুনে চলে। পূজোর আনন্দ, আবীরের ছড়াছড়ি তো আছেই—তাছাড়াও অষ্টপ্রহর সংকীর্তনান্তে মহোৎসবের খিচুড়ি আর লাবড়া ! সেদিন সারদা পিসি এসে ধরে পড়লেন উদ্যোক্তাদের—তাঁর গুরুঠাকুব এসেছেন, মহোৎসবের পর তাঁকে দিযে শ্রীশ্রীগীতা পাঠ করাতে হবে ! অতি উত্তম প্রস্তাব, মুহূর্তে পশ্চিম হিস্যার বাঁধানো বারান্দায় একটা বেদীর মত তৈরী করে দেওয়া হল, তার উপরে বসলেন পণ্ডিত কমলাকান্ত কাব্যতীর্থ। সুপুষ্ট বলিষ্ঠ দেহ, গৌড়কান্তি, মুখাবয়বে জ্ঞান-গভীরতার ছাপ সুস্পষ্ট। মেয়েদের মংগলশঙ্খধ্বনির পর তাঁর গুরুগম্ভীর কণ্ঠ থেকে ধ্যানমন্ত্র উচ্চারিত হতে থাকে—

'মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্ ॥'

তারপর বেছে বেছে কয়েকটি শ্লোক পাঠ আর বাংলায় তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন পণ্ডিত মশায়। শ্রোতৃবৃন্দ মন্ত্রমুগ্ধ হযে শোনে অমৃতময়ী শ্রীভগবানবাণী—সারগর্ভ জীবন-দর্শনের মধুর ব্যাখ্যান। হঠাৎ টিপ্রার 'জুম' সর্দার কৈলাস সভায় ছুটে এসে ডুকরে কেঁদে ওঠে—'আমার জোয়ান মর্দ ছেলেটি তিন দিনের জ্বরে মারা গেল !' সভাস্থল থেকে একটা তীব্র বেদনার ধ্বনি উত্থিত হয়। বিভূতিদা, যামিনীকাকা ও আমরা জনকয়েক মিলে কৈলাসকে সান্ত্বনা দিতে দিতে নিয়ে যাই স্থানান্তরে, কেউ কেউ লেগে যায় শ্যামমোহনের সৎকারের ব্যবস্থায়।

এ অঞ্চলে অনেক টিপ্রার বাস। চেহারায় টিপরাদের ত্রিপুরা রাজ্যের রাজাদের সঙ্গে সৌসাদৃশ্য রয়েছে, তাই ওরা ত্রিপুরার আদিম অধিবাসী বলে দাবী করে। ফর্সা রং ছাড়া কাল রং একজনেরও নেই ওদের মধ্যে, অদ্ভুত শক্ত বাঁধন দেহের, যেন লোহা পিটিয়ে গড়া হয়েছে। যতদূর জানা যায়, আমাদের পূর্বপুরুষগণ এদের প্রজাস্বত্ব দিয়ে এনেছিলেন গ্রামরক্ষী ও বিশ্বাসী অনুচররূপে। এদের সকলের পদবীই 'সিং',—কৈলাস সিং, মিষ্ট সিং, যামিনী সিং, রমণী সিং, কামিনী সিং, এমনি সব নাম। মেয়েরাও ব্যাটাছেলেদের মত সমান পরিশ্রমী ও বিনয়ী। সাধারণত ওরা কয়েকটি পরিবার দল বেঁধে এক জায়গায় ছোট ছোট কুঁড়ের মধ্যে বাস করে। এই বাস-ব্যবস্থাকেই বলা হয় 'জুম'। প্রায় প্রত্যহই বিকেলের দিকে আমরা বেড়াতে যেতাম কোন না কোন জুমে। টিপরাদের সঙ্গে আলাপে অফুরন্ত আনন্দ পেতাম। ওদের সরলতা, সৎসাহস, আতিথেয়তার কথাই আজ বড় বেশী করে মনে পড়ে, আর ভাবি আজকের কপট আর অন্তঃসারশূন্য সভ্যতার বন্ধন কাটিয়ে যদি ফিরে যেতে পারতাম সেই যুগে!

এ গ্রামে অধিকাংশই টিনের ঘর। পাকা ঘর শুধু একটি—আমার খুল্লতাত তার মালিক। দোতলা দালান, দক্ষিণ খোলা, অবিশ্রান্ত হাওয়ার আনাগোনা, তারই লোভে সন্ধ্যার দিকে ছেলেবুড়ো জমায়েত হয় কাকার শান-বাঁধানো বারান্দায়। আজগুবি গল্পে জমে ওঠে ভরা বৈঠক। প্রধান গল্পকার এবাড়ির অর্ধশতাব্দীর পুরাতন ভৃত্য সুধন্য। এমনি সময় যথারীতি ডাক পড়ে কবিয়াল গৌরাঙ্গের—বৃদ্ধ দীনদয়ালের বড় ছেলের। গৌরাঙ্গ আমাদের দু'বাড়ির কোন না কোন হিস্যার কাজে আছেই, যদিও কেবল খোরাকী দিয়েও কোন এক হিস্যা তাকে একনাগাড়ে দীর্ঘদিন রাখতে নারাজ। গৌরাঙ্গের পৈটিক দাবীটা বড় মাত্রাতিরিক্ত, ওদিকে কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা। তবু তার সরল নির্বুদ্ধিতার জন্যেই সবাই তাকে ভালবাসত। তাই বেকার হতে হয়নি তাকে কোনদিন। গৌরাঙ্গ নিজেকে কবির দলের সরকার (কবিয়াল) বলতে গর্ববোধ করে। কোন্ কোন্ বিখ্যাত কবির দলে সে সাক্রেদী করেছে তার ইতিহাসও সে নির্ভুল বলে দিতে পারে। আমরা অবশ্য জানতাম, কবি অক্ষয় সরকারের দলে থেকে ফুটফরমাস খেটেছিল ও মাসখানেক, ব্যস ঐ পর্যন্তই তার সাক্রেদী!

অমৃত হালে বিভূতি বায়েনের সাক্রেদ হয়েছে। আমাদের পরামর্শমত সে খোলে চাঁটি মারতেই গৌরাঙ্গ শুরু করে:

রামগুণাগুণ বাদ্য বাজে

গোবর্ধনের বাড়ি হে,

(আমরা দোঁহাররা : রামগুণাগুণ বাদ্য বাজে···)

গোবর্ধনে অম্বল খায়

হাপ্‌পুর হুপ্‌পুর হে।

মুহূর্তে দারুণ হাসির রোল পড়ে যায় 'অম্বল' খাওয়ার দাপটে !

আশ্বিন মাসের শেষ। দুপুরে বাড়ির বৈঠকখানার সম্মুখস্থ একটা বড় আমগাছ তলায় মাদুর পেতে একদিন বিশ্রান্তালাপ করছিলাম আমরা জনকয়েক মিলে। এমনি সময় চণ্ডীপুর (নোয়াখালি) থেকে হরেনকাকা এমন একটা সংবাদ এনে হাজির করলেন যা দুঃস্বপ্নেরও অতীত বলে বোধ হল। তিনি জানালেন, ঐ অঞ্চলে দলে দলে ক্ষিপ্ত মুসলমান কয়েকটি বাড়িতে হানা দিয়ে সমস্ত ঘর অগ্নিদগ্ধ করেছে, লুণ্ঠন করেছে জিনিসপত্র, গরুবাছুর পর্যন্ত। দুটি রোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডের সংবাদও দিলেন তিনি, আর বললেন সর্বত্র এই আগুন ছড়াবার জন্যে সভা-সমিতিতে প্রচারও চল্‌ছে। চব্বিশ ঘণ্টা পার হতে না হতেই খবর পেলাম পাশের গ্রামে অগ্নিকাণ্ড আর লুঠতরাজের। বেলাবেলি মেয়েদের, বুড়োদের আর শিশুদের সরিয়ে দেওয়া হল নিরাপদ স্থানে—শহরের আইন শৃঙ্খলার মধ্যে। রাত্রিশেষে দশসহস্রাধিক মানুষের গ্রামকে শ্মশানপুরীর নিস্তব্ধতার মধ্যে নিঃশেষে শূন্য করে দিয়ে আমরা তরুণরাও জন্মভূমি, জন্মগ্রাম থেকে বিদায় নিলাম। শত শতাব্দীর ভাঙ্গা-গড়ার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছিল যে ইতিহাস, বর্বরতার হিংস্র অভিযান তাকে চুরমার করে দিল নিমেষে। ইতিহাসের এই ছিন্নসূত্র আবার কোনদিন জোড়া লাগবে কিনা কে জানে !

কালীকচ্ছ

গ্রাম-প্রাণ আমাদের বাংলা দেশ। অসংখ্য গ্রাম পূব বাংলায়। আমরা ছেড়ে এসেছি সে সব গ্রাম। সে সব ছেড়ে আসা গ্রামের মধ্যে কালীকচ্ছ একটি নাম—সে অন্যতমা, সে অনন্যা—সে আমার গ্রাম-জননী। পূব বাংলার আর সব গ্রামের মতই জল-বাতাস ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে আমার কালীকচ্ছ মহিমময়ী। আর সবাইর মত আমারও দেহ-মনে শিহরণ জাগে বহু স্মৃতি-বিজড়িত সেই জন্ম-গ্রামের কথা ভাবতে। মায়ের মত করে সেই গ্রামই যে আমায় শিখিয়েছিল সংগ্রামময় এই পৃথিবীতে সংগ্রামী হয়ে বেঁচে থাকতে। আজ তাই তার অভাব মনকে পীড়িত করে, করে তোলে বিষাদ-ভারাক্রান্ত। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে একটি বড় কর্মকেন্দ্র ছিল কালীকচ্ছ। মুক্তি-যুদ্ধের সেই ইতিহাসে কালীকচ্ছের অবদান বড় কম নয়। কিন্তু ভবিষ্যত ভারত ইতিহাসে গৌরবময় অধ্যায় সংযোজনায় সাময়িকভাবে হলেও সে আজ বঞ্চিত।

আজ থেকে চল্লিশ পয়তাল্লিশ বছর আগেকার কথা। সেই ছোটবেলার কত স্মৃতিই না আজ হঠাৎ হঠাৎ মনে পড়ে। আমাদের বাড়িকে বলা হত রামপ্রসাদের রামের পুরী। সাত মহল্লা বাড়ি। তাতে ছিল জঙ্গলাকীর্ণ একটা পুরনো মন্দির। শেয়াল শিকার করতে যেয়ে একদিন একটা কুকুর নিয়ে ঢুকে পড়েছিলাম সেই মন্দিরে। কিন্তু শেয়াল ধরা পড়েনি সেখানে। তাহলেও সেই মন্দিরে পাওয়া গেল একটি সুরক্ষিত বাক্স। খুব খুশি মনেই সেই বাক্স নিয়ে আমি ফিরে এলাম। প্রাণের ভয়ে যে মন্দিরের ধারে কাছেও যায় না কেউ সেখানে যাওয়ার কথা বাড়িতে খুলে বলাও তো মুস্কিল। ও মন্দির নাকি ছিন্নমস্তার। কোন এক সন্ধ্যায় ঐ মন্দির থেকে এক ছিন্নমস্তা মূর্তিকে বার হয়ে যেতে দেখে আমাদেরই এক প্রপিতামহী নাকি চিরতরে জ্ঞান হারিয়েছিলেন। সেই থেকেই নাকি মানব-বর্জিত এই মন্দিরে অপদেবতার ভয়ে কেউ প্রবেশ করতে সাহস পায় না। সেই মন্দিরে বাক্সটি দেখে ভাবলাম হয়তো ঐ দেবতারই ধনরত্ন রাখা আছে তাতে। সাগ্রহে বাড়ি নিয়ে এলাম। বাক্সটি

খুলেই বাবা কি রকম গম্ভীর হয়ে গেলেন এবং এ নিয়ে বেশি হৈ-চৈ করতে বারণ করে দিলেন।

বাক্সটিতে যা জিনিসপত্র ছিল তা নিয়ে দেখানো হল স্বগৃহে অন্তরীণ প্রমথনাথ নন্দীকে। তিনি বললেন, ও-গুলো তাজা কার্তুজ, গ্রামের বিপ্লবীদের সম্পত্তি। আমার বড় ভাই এনে ঐখানে রেখেছিলেন।

তখন প্রমথবাবু ও অন্যান্য কয়েকজন যুবকের গতিবিধির ওপর লক্ষ্য রাখবার জন্য গ্রামে গুপ্তচর ঘোরাফেরা করত। পুলিশ একবার খোঁজ পেলে হাজতে যেতে হবে সকলকেই। তাই বাক্সটি ফেলে দেওয়া হল পচা-ডোবার মধ্যে।

বিপ্লব আন্দোলনে আমাদের গ্রামের যুবকরা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে এসেছে প্রথম যুগ থেকেই। শ্রীঅরবিন্দ আমাদের গ্রামে পদার্পণ করেছিলেন ১৯০৬ সালে। পল্লী-মানুষের মনে বিপ্লব-বহ্নির ছোঁয়া লাগানো ছিল উদ্দেশ্য। বিপিনচন্দ্র পালও দু'বার আমাদের গ্রামে গিয়েছিলেন—কয়েকটি সভায় বক্তৃতাও দিয়েছিলেন। আমাদের গ্রামেই জন্মেছিলেন মাণিকতলা বোমা মামলার বিপ্লবী বীর উল্লাসকর দত্ত। ঐ মাললা তখনো চলছে। ধরা পড়লেন আমাদের অশোক নন্দী। মামলায় জড়াবার আগেই মৃত্যু তাঁকে সরিয়ে নিলে। পরবর্তীকালে কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্রেট হত্যার ব্যাপারেও আমাদের গ্রামের বহু যুবক-যুবতী ধৃত ও অন্তরীণ হয়েছিল। এক পুলিশের চরকে গুলী করা হয় আমাদের গ্রামে। সে ছিল মুসলমান। গুলী করেছিল আমাদের গ্রামেরই বিরাজ দেব এ মামলায় ও আর একটি মামলায় তার জেল হয়েছিল মোট ৪৫ বৎসরের। মুসলমান গুপ্তচরকে মারার জন্য সেদিন মুসলমান বন্ধুরাই সাহায্য করেছিল হিন্দুদের।

গ্রামের সভা-সমিতি ও আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল মহেন্দ্র নন্দীর বাড়ি। মহেন্দ্র নন্দী ছিলেন অশোক নন্দীর পিতা ও উল্লাসকর দত্তের মামা। মহেন্দ্রবাবুকে মহাপুরুষ বলেই জানতাম। তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করতেন। তাঁর ওষুধ খেয়ে সুস্থ হয়নি. এরকম বড় একটা শোনা যায় নি। তাঁর হাতের পরশ পেলেও নাকি রোগী সুস্থ হয়ে যেত। অনেক দূর দেশ থেকে দুরারোগ্য সব ব্যাধি নিয়ে বহু লোক আসত। কলকাতা থেকেও অনেকে ডেকে নিয়ে যেত তাঁকে। বিখ্যাত সেতারী আলাউদ্দিন খাঁ ও তাঁর বড় ভাই আয়েতালি খাঁ ছিলেন মহেন্দ্রবাবুর শিষ্য।

মহেন্দ্রবাবু শুধু ডাক্তার ও স্বদেশী আন্দোলনের নেতাই ছিলেন না, স্বদেশী জিনিস প্রস্তুতের ব্যাপারে তিনি ছিলেন অন্যতম অগ্রপথিক। এক ধরণের

দেশলাইয়ের কল আবিষ্কারের কৃতিত্ব তাঁর। ঝিনুক এবং নারকেলের মালার বোতাম তৈরীর কলও আবিষ্কার করেছিলেন তিনি। বাড়িতে তাঁর বিরাট কারখানায় দেশলাই, বোতাম ও তাঁতের কাপড় তৈরী হত। বহু বাঙালী তাঁর আবিষ্কৃত দেশলাইয়ের কল নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছিল।

মহেন্দ্রবাবু ছিলেন ব্রাহ্ম। মহেন্দ্রবাবুর বাবা আনন্দ নন্দী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এবং কৈলাশ নন্দী এক সঙ্গে ঢাকায় কেশবচন্দ্র সেনের কাছ থেকে দীক্ষা নিয়েছিলেন। দীক্ষা-গ্রহণের পর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এসে বহুদিন আনন্দ নন্দীর বাড়িতে বাস করেছিলেন। আনন্দ নন্দী ছিলেন সিদ্ধপুরুষ। তাঁর সম্বন্ধে অনেক কাহিনী এখনও কালীকচ্ছের ঘরে ঘরে প্রচলিত আছে।

এই সেদিন আমাদের মাষ্টারমশাই বৃদ্ধ নিকুঞ্জ বিহারী দত্ত বল্লেন যে, আনন্দ নন্দী সম্বন্ধে নানা কথা শুনে তাঁরা তিন বন্ধু মিলে একবার তাঁর কাছে গেলেন। উদ্দেশ্য, পরীক্ষায় পাশ করবেন কি-না তাই জানা। তিন জনই তখন আই-এ পরীক্ষা দেবার জন্যে তৈরী হচ্ছেন। তাঁরা প্রশ্ন করবার আগেই আনন্দ নন্দী বল্লেন, 'তোমরা যা জানতে এসেছ তা আমি একটু পরে বলব'। বলে তিনি ধ্যানে বসলেন। ধ্যান শেষ হলে বল্লেন, তিন জনের মধ্যে নিকুঞ্জবাবু পাশ করবেন, একজন ফেল করবে, তৃতীয় জন পরীক্ষা দিতেই পারবে না। এই তিনটি ভবিষ্যদ্বাণীই ফলে গিয়েছিল।

মৃত্যুশয্যায় আনন্দ নন্দীকে তাঁর স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তো চললে, আমার কি হবে ? আনন্দ নন্দী জবাব দিলেন, তিন দিনের মধ্যেই তো তুমিও আমার কাছে আসছ। মৃত্যুর পর আনন্দ নন্দীকে কবর দিতে দিলেন না তার স্ত্রী। বল্লেন, তিন দিন পর যেন তাঁদের উভয়কে একসঙ্গে সমাধিস্থ করা হয়। নিজে বৈধব্যের বেশও পরলেন না। শান্ত মনে স্বামীর কাছে যাবার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলেন। তিন দিনের দিন তিনি হঠাৎ প্রাণত্যাগ করলেন। সাড়ম্বরে তাঁদের উভয়কে সমাধিস্থ করা হল। দয়াময়ের নাম প্রচারের জন্য সেই সমাধির ওপর মহেন্দ্রবাবু একটি মন্দির স্থাপন করেছিলেন। সেই মন্দিরে নিয়মিত উপাসনা হত সকালে-সন্ধ্যায়। কাঙালী ভোজন হত প্রত্যহ।

ঐ মন্দিরটি ছাড়া কালীকচ্ছে আরও একটি ব্রাহ্ম মন্দির ছিল। এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন প্যারীনাথ নন্দী। এত অধিক সংখ্যক ব্রাহ্ম হয়তো কাছাকাছি অন্য কোন গ্রামে ছিল না। আনন্দ নন্দীর পিতা রামদুলাল নন্দী

ছিলেন দেওয়ান। তাঁর রচিত অনেক গান একসময় মুখে মুখে ফিরত। রামদুলাল নন্দী নিজের জন্য এক বিরাট পাকাবাড়ি তৈরী করলেন। তাতে কোঠাই ছিল কুড়িটি। দুই পাশে দুই পুকুর। তাতে বাঁধান ঘাট আর সামনে বিরাট নাটমন্দির। বাড়ি তৈরী সম্পূর্ণ হবার পরে তাঁর গুরুদেব এলেন বাড়ি দেখতে। বাড়ি দেখেই তিনি মুগ্ধ হয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন এবং তা শুনে রামদুলাল গুরুদেবকে বাড়িটি দান করে দিলেন।

ত্রিপুরা জেলার সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে বর্ধিষ্ণু গ্রাম কালীকচ্ছ। চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যতরী ডুবেছিল যে কালীদহে সেই কালীদহের পলিমাটিতে গড়া এই মনোরম গ্রাম। অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তির জন্মভূমি এই কালীকচ্ছ। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট রমেশচন্দ্র দত্ত, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট তারিনী নন্দী, সুরেশ চন্দ্র সিংহ, প্রকাশচন্দ্র সিংহ, এস ডি-ও হেমেন্দ্রনাথ নন্দী, কৃষি কলেজের অধ্যক্ষ ও বহু গ্রন্থের রচয়িতা দ্বিজদাস দত্ত, মেজর জেনারেল সত্যব্রত সিংহরায়, ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে লব্ধপ্রতিষ্ঠ নরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত এই গ্রামের সন্তান। ত্রিপুরা জেলা থেকে মেয়েদের মধ্যে প্রথম বি-এ পাশ করেছিলেন মৃণাল বালা নন্দী। তাঁরও জন্ম কালীকচ্ছে। কুমিল্লা লেবার হাউসের প্রতিষ্ঠাতা পি-চক্রবর্তীও ছিলেন এই গ্রামেরই অধিবাসী।

কালীকচ্ছে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অভাব ছিল না। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল রসিক নন্দীর পাঠশালা। এই পাঠশালায় যার হাতে খড়ি হয়েছে সে যে জীবনে কখনো অঙ্কে ফেল করবে না, এ ধারণা ছিল প্রায় স্বতঃসিদ্ধ। আরও একটি বিষয়ও ছিল একরূপ নিশ্চিত। অভিভাবকরা জানতেন যে, পড়ায় যে ছাত্রের গাফিলতী হবে রসিক নন্দীর বেতের দাগ কেটে বসে যাবে তার পিঠের চামড়ায়। সংস্কৃতে উচ্চ-উপাধিধারী ছিলেন সুরেন্দ্র তর্কতীর্থ, নৃপেন্দ্র তর্কতীর্থ প্রমুখ পণ্ডিতেরা। এঁদের বাড়িতে টোল ছিল। বিভিন্ন জেলা থেকে ছাত্ররা এসে টোলে পড়াশোনা করত। উদাত্ত কণ্ঠের সংস্কৃত পাঠের সুরে মুখরিত হয়ে থাকত কালীকচ্ছের প্রভাতী আর সান্ধ্য আকাশ। আজ সে গ্রামকে ছেড়ে দিয়ে আসতে হল পাকিস্থানের কবলে। সেই বৃহৎ গ্রামের মধ্যে একটি বাড়িও ছিল না মুসলমানের। আশে-পাশে অবশ্য অনেক গ্রামই ছিল মুসলমান-প্রধান, তবে ভয় ভাবনা আমাদের কোনদিনই ছিল না তার জন্য।

তারপর আমোদ আহ্লাদের কথা। সে-কথা ভাবলেও আজ মন চঞ্চল

হয়ে ওঠে। মনে পড়ে উপেন্দ্রবাবুর যাত্রার দলের 'বিজয় বসন্ত' পালার কথা। সরাইল হাই-স্কুলের কেরাণী ছিলেন উপেন্দ্রবাবু। অবসর সময়ে যাত্রার দলের মহড়া হত তাঁর বাড়িতে। তাঁরই প্রচেষ্টায় যাত্রার দলটি গড়ে উঠেছিল। দলটির খ্যাতিও ছড়িয়ে পড়েছিল চারিদিকে। খালি মাঠে সামিয়ানা খাটিয়ে শীতের রাতে আটটা-ন'টার সময় যাত্রা আরম্ভ হত। এখনো চোখে ভাসে কয়েকটি দৃশ্য।··· বসন্তকে মারবার হুকুম দিলেন রাজা। জহ্লাদ এসে উপস্থিত হল। সে যখন সাড়ে ছ'ফুট লম্বা দশাশই চেহারা নিয়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াতো ভয়ে আমাদের শিরদাঁড়া দিয়ে ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে যেত, লোমগুলো হয়ে উঠত খাড়া। আমাদের শিশুকালের সেই রোমাঞ্চকর স্মৃতি আজও একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়নি। এই যাত্রার দলটিকে শ্রীহট্ট-ময়মনসিংহ প্রভৃতি অঞ্চলের লোকেরা টাকা দিয়ে নিয়ে যেত। একবার দলটি মেঘনা নদীর বন্দর ভৈরব বাজারে গেল 'বিজয় বসন্ত' পালা অভিনয় করবার জন্যে। শীতের রাত। পালা এত জমে গেল যে, বিজয় ভুলে গেল সে অভিনয় করছে। বসন্তের বুকে সজোরে ছুরি বসিয়ে দিল। শেষ পর্যন্ত ডাক্তারই ডাকতে হল রক্ত বন্ধ করার জন্যে। এই যাত্রা শোনার জন্যে আমরা সন্ধ্যে না হতেই বাড়িতে কান্না-কাটি করে বাবা-মা'র মত আদায় করে আসরে এসে বসতাম। একেবারে সামনের আসনে বসতে না-পারলে কিছুতেই মন সন্তুষ্ট হত না। কিন্তু আমাদের চেয়েও সেয়ানা লোক ছিল। তারা এসে হঠাৎ 'সাপ সাপ' বলে চেঁচিয়ে উঠত। আমরা তখন সাপের ভয়ে পড়ি-কি-মরি করে দে-ছুট্। তারা সেই সুযোগে এগিয়ে এসে সামনের আসনগুলি দখল করত। কখনো কখনো এ-নিয়ে মারামারি পর্যন্ত লেগে যেত। সেদিন নিজের জায়গাটি পুনরুদ্ধার করতে পারলে স্বর্গরাজ্য পুনরুদ্ধারের আনন্দ পাওয়া যেত।

এর ওপর ছিল পাড়ায় পাড়ায় ফুটবল, দাঁড়িয়াবান্ধা, গুটিদাঁড়া খেলার প্রতিযোগিতা। তেঁতুল কাঠের সার দিয়ে পিংপং-এর বলের মত আকারের কালো-কুচকুচে বল তৈরী হত। সেই বলটিকে মারবার জন্যে কাঁচা বাঁশ দিয়ে তৈরী হতো দাঁড়া, অর্থাৎ ব্যাট। ক্রিকেট খেলার সঙ্গে এর তুলনা চলে; রজনী ডাক্তার প্রচণ্ড জোরে বল পিটাতেন, ক্রিকেটের ওভার বাউণ্ডারীর চেয়ে বেশী আকর্ষণীয় হত তা।

গ্রামেই ছিল বাজার। গ্রামেই ছিল পোষ্ট আফিস। তা ছাড়া রক্ষাকালী,

শ্মশানকালীর বাড়ি। রক্ষাকালীর বাড়ির পুজোর মহিষ-বলির পর দড়ি কে নিবে নিয়ে লেগে যেত পাড়ায় পাড়ায় প্রতিযোগিতা। যে পাড়া দড়ি পাবে সেই জয়ী সাব্যস্ত হবে।

দত্তবংশের দাতা গোপীনাথ দত্তের নাম না করলে কালীকচ্ছের কথা বলা শেষ হয় না। অবশ্য শেষ কোন দিনই হবে না। জন্মভূমির কাহিনী কবে আর শেষ হয়? সে যাক—গোপীনাথ দত্তের কথাই বলি। গোপীনাথ পুকুর থেকে স্নান করে ফিরছেন। হঠাৎ এক ভিখারী এসে সামনে দাঁড়াল। গোপীনাথের কাছ থেকে সে কিছু চায়। দেবার মত কিছুই সঙ্গে ছিল না গোপীনাথের। কিছুক্ষণ ভাবলেন গোপীনাথ। তারপর গামছাটি পরে কাপড়টি দিয়ে দিলেন ভিখারীকে।

সেই দিন ছিল এমনিই, এমনিই ছিল পুব বাংলার গ্রাম আর তার মানুষ। আজ সেই মানুষ ভাগ্যের পরিহাসে ভারতের দ্বারে কৃপাপ্রার্থী।

॥ শ্রীহট্ট ॥

পঞ্চ খণ্ড

বাঙলার পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত শ্রীভূমি। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের পদধূলি লাঞ্ছিত, অদ্বৈতাচার্যের ও দেশনায়ক বিপিন পালের জন্মস্থান পবিত্র শ্রীভূমি। তারই কোলে সদা উজ্জ্বল আমার গ্রাম পঞ্চখণ্ড। বাঙলার হাজার গ্রামের মধ্যে আমার গ্রাম অনন্যা। অদূরে উত্তাল প্রবহমান নদ ব্রহ্মপুত্র, তার শাখানদী কুশিয়ারা। বৈষ্ণবতীর্থ পঞ্চখণ্ড, পার্শ্ববর্তী গ্রাম ঢাকা-দক্ষিণ। অতীতে বাঙলা ও বাঙলার বাইরে থেকে সমাগত বিদ্যার্থী পুণ্যার্থীদের চরণস্পর্শে ধন্য হয়ে যেত এই গ্রাম। যাঁরা আসতেন, তাঁরাও এ গ্রামের সান্নিধ্যে এসে নতুন প্রেরণা অঞ্জলিভরে গ্রহণ করে নিয়ে যেতেন। মহাপ্রভুর বৈষ্ণব ধর্মের দীক্ষায়, জ্ঞানে-গরিমায় পুণ্যব্রতা এই গ্রাম। তার কথাই বলছি।

বলতে গিয়ে মন চলে যায় অতীতে, অনেক দূরের অতীতে। মনের অলিতে-গলিতে এলোমোলো ভাবনার ভীড়। তন্ময়তায় একেবারে ডুবে যাই। হঠাৎ যেন একটানা বাঁশীর শব্দে চমকে উঠি। ওপার থেকে যাত্রী নিয়ে স্টীমার ছাড়ল। আমিনগাঁও রেল-কোম্পানীর বিজলী বাতি ঝিক্‌মিক করছে এপার থেকে। নদ ব্রহ্মপুত্র। নিস্তরঙ্গ জলরাশি। একখানি শূন্য নৌকা ধীরে ধীরে ভিড়ছে পারে। কয়েক বছর আগে কুশিয়ারার তীরে বসে শেষ-দেখা সেই খেয়া নৌকা পারাপারের দৃশ্য মনে পড়ে গেল। কোন মাঝি উদাস সুরে গান ধরেছে: ওরে বধূর লাইগ্যা পরান কান্দে মোর। সে গান আর শোনবার সৌভাগ্য হয় না। মনে পড়ছে গ্রামের সুধীনদাকে। গৌরবর্ণ দীর্ঘকায় হৃষ্টপুষ্ট মানুষটি। সব সময় মুখে হাসি লেগেই রয়েছে। আমাদের শৈশবকালে তিনি ছিলেন এক পরম বিস্ময়। এই লোকটিকে ধরতে কত পুলিশ-দারোগাকে কতবার নাজেহাল হতে হয়েছে। কত দিন মুগ্ধবিস্ময়ে সে যুগের কীর্তি-কাহিনী শুনেছি তার মুখে। রূপকথার মত মনে হয়। বনজঙ্গলে ঘুরে ঘুরে ক্লান্তি ধরে গেছে। পেছনে ঘুরছে প্রেতের মতো বিদেশী আমলের আই, বি-র দল।

বোমা তৈরী আর পিস্তল চালাবার ট্রেণিং দেওয়া হয় শিয়ালকুচির জঙ্গলে। সে যুগও চলে যায়। আসে অসহযোগ আন্দোলনের দিন। মাঠের মাঝখানে সার দিয়ে দেশ কর্মীদের দাঁড় করায় অত্যাচারী দারোগা কেশব রায়। পিঠ ফুটে রক্ত বেরোয়। চোখ অন্ধকার হয়ে আসে। তবুও প্রাণপণে অস্ফুটস্বরে প্রতিকণ্ঠ উচ্চারিত হয় 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র।

সুধীনদা আশা দিয়ে বলতেন ঃ আর দুঃখ কী ? স্বাধীনতা এল বলে। ভাবী-দিনের ভাবীমানুষ তোরা, দুঃখজয়ী কিশোর তরুণের দল।... আর কথা শেষ করতে পারেন না। দু'হাত দিয়ে বুক চেপে ধরেন। অনেকদিন ধরে এই এক যন্ত্রণায় ভুগছেন সুধীনদা। সেই যে-বার পুলিশ সুপারের সংগীনের আঘাতে বুকের একটি পাঁজর ভেঙ্গে গিয়েছিল, তখন থেকেই একটানা কথা বলতে কষ্ট হত সুধীনদার। আজ কোথায় তিনি। হয়তো স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরে কোন এক উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রয় নিয়ে তিনি প্রাণ রক্ষার দুস্তর প্রয়াস করছেন।

গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে আমরা গড়ে তুলেছিলাম কিশোর লাইব্রেরী। করোগেট টিনের ছাউনী দেওয়া ছোট ঘর। কিশোরদের জন্য হলেও সেটা ছিল গ্রামের সকলের প্রাণ। যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ সকলের অবসর বিনোদনের একমাত্র আশ্রয়কেন্দ্র। লাইব্রেরীর পাশেই খেলার মাঠ। ফুটবল খেলার মরশুমে একটা না একটা প্রতিযোগিতা লেগেই থাকত প্রতিদিন। অগণিত দর্শক। শুধু ছেলেরাই নয়—হুঁকো হাতে নিয়ে প্রৌঢ়-বৃদ্ধরাও মাঠের সামনে এসে জড় হতেন।

বর্ষাকালে খালে বিলে মাঠে ধূ-ধূ করছে জল—সমুদ্রের বুকে যেন গ্রামটি নির্জন একটি দ্বীপ। শুরু হয় নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা। প্রতিপক্ষের চীৎকার —নৌকার দাঁড়ের শব্দ আর অসংখ্য দর্শকের উচ্ছল কলরব—কি ঊর্মিমুখর জীবন! মনে পড়ে ছোট গ্রামখানার ছোট ছোট মানষগুলোকে। বহির্জগতের সঙ্গে হয়তো তাঁদের সম্পর্ক ছিল না,—নিজের গ্রাম এবং আশ-পাশে আত্মীয়-স্বজন ছাড়া বহু মানুষের সঙ্গে হয়তো তাঁরা মিশেনি,—তবু কত সরল তাঁদের অন্তর, কত বিষয়ে কত বাস্তব অভিজ্ঞতা! আকাশের দিকে চেয়ে ঠিক বলতে পারবে তারা, বৃষ্টি কখন হবে। সবুজ মাঠটার দিকে একবার স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি বুলিয়েই আনন্দে হয়তো মুখ-মণ্ডল উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠল একজনের সে বল্লে—ফসল এবার হবে ভাল। আর ডোবার জল দেখে নির্ঘাৎ

বলে দিল—প্রচুর মাছ আছে এর ভিতর। আশ্চর্য মানুষ এঁরা, বিচিত্র বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ এঁদের জীবন। নবীন মাঝি, তারক দাস, করিমুদ্দিন, শেখ সমীব এঁদের কি কখনও ভোলা যায়? প্রতিবার বাড়ি গেলে ঠিক এসে একবারটি খবর নেবে সমীর—ক্যামন আছ। তারপর এক কাদি কলা, নিজ হাতে ফলানো শাকসব্জী নিয়ে এসে বাড়ি উপস্থিত—দাদাবাবুর লাইগ্যা আনলাম। পাষাণ-হৃদয় ছিল করিমুদ্দিন। একে একে তিনটি ছেলে এবং বউ একই মাসের ভিতর কলেরায় মরবার পরও লোকটাকে বিচলিত হতে দেখেনি কেউ। কিন্তু আমি জানি সেটা যে কত মিথ্যা। তার ভিতরের রূপ যে বাইরের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।...একা রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে গ্রাম ছাড়িয়ে কবরখানার কাছে পেঁৗছেচি। সন্ধ্যার আবছায়া অন্ধকার মিলিযে গেছে। সমস্ত শরীর ভয়ে শিউরে উঠল। ওই যে অল্প দূরে কি যেন নড়ছে, কে ও? স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িযে রইলাম। কিন্তু একি, মুর্তিটা যে ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে। তবে যাই হোক এ প্রেত নয়। কাছে আসতে বিস্ময়ের সীমা রইল না। আমায় সামনে দেখে হাউ হাউ করে কান্না শুরু করল করিমুদ্দিন। হঠাৎ খেয়াল হল। বহু দিনের নিরুদ্ধ আবেগ আর বাধ মানছে না করিমুদ্দিনের। মাথায় হাত দিয়ে রাস্তার ওপরেই বসে পড়ল আকাশের দিকে হা করে চেয়ে। সান্ত্বনা দেবার মত আমার কিছুই ছিল না, ধীরে ধীরে হাত দুটো ধরে অনেক দূর অবধি আনলাম ওকে। ওর মনের ভাষাটা তখন ঠিক রূপ নিয়েছে যেন—'মোর জীবনের রোজ কেয়ামত, ভাবিতেছি কতদূর!'

সেদিন আর আজ। দুস্তর সমুদ্রের ব্যবধান। রাজনৈতিক পঙ্কিলতায় ডুবে আজ মানুষের মন বিষাক্ত, হিংস্রতায় পরিপূর্ণ। কিন্তু চিরকালই কি এমন ছিল? হিন্দুর বহু ধর্মীয় উৎসবে যোগদান করেছে মুসলমান। আমাদের বারোয়ারী কালীপূজায় যে সখের যাত্রা হত, তাতে বহু মুসলমানকে দেখেছি ছড়ি হাতে নিয়ে অশান্ত জনতাকে শান্ত করতে। আর প্রতি বছর মহরমের দিন গাজনতলায় যে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হত, তাতে নিজ গ্রামের খেলোয়াড়দের অপূর্ব ক্রীড়া নৈপুণ্যে আমার বুকও কি গর্বে দশহাত উঁচু হয়ে উঠেনি! সে সব তো আজ অতীতের বিস্মৃত-প্রায় স্বপ্ন কাহিনী!

আগে গ্রামে বিদ্যাচর্চার খুবই সুযোগ সুবিধা ছিল। তর্করত্ন পণ্ডিত মশাইদের চতুষ্পাঠিতে বহু দূর দেশ থেকে লোক বিদ্যার্জন করতে আসত। আজ আর

তার চিহ্ন নেই। ছিল ভাঙ্গা আটচালায় গুটিকয় ছাত্র নিয়ে অপুর পাঠশালা। সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। সবই পরিবর্তিত হয়ে গেছে। শুধু বাইরে নয়, অন্তরেও চিড় ধরেছিল বহুদিন থেকেই। শ্রীহট্টে গণভোটের সময় চির-শান্ত রসিদ, যাকে শ্রদ্ধা করতাম, গ্রাম্য সম্পর্কে চাচা বলে সম্বোধন করতাম তার কথা-বার্তায় পর্যন্ত উষ্মা ও অবর্ণনীয় ক্রোধ প্রকাশ পেয়েছে দেখে বিস্মিত হয়েছি, দুঃখ পেয়েছি। মর্মান্তিক দুঃখে বিষণ্ণ বোধ করছি রাণীদির কথা ভেবে। লক্ষ্মীর প্রতিমার মত রূপ। স্নেহমধুর ব্যবহার। বিয়ের কিছু দিন পরই বিধবা হয়ে অবাঞ্ছিতারূপে ফিরে এসেছিলেন বাপ-ভাইয়ের সংসারে। তবু আমাদের জন্যে তাঁর স্নেহধারায় কার্পণ্য হয়নি কোনদিন। আজ শ্রীকান্তের মতই বলতে ইচ্ছে করে, 'বাংলার পথে ঘাটে মা-বোন। সাধ্য কি এঁদের স্নেহ এড়িয়ে যাই।' সেদিন কলকাতার 'মেসে' এক রুদ্ধ কোঠায় অঝোরে অশ্রুপাত করে ডেকেছি রাণীদিকে।

গ্রামের কথা বলতে বলতে গ্রামের যত সব সোনার মানুষেরই ভীড় জমে ওঠে মনে। যদি এতে ইতিহাস না থাকে, চিত্র না থাকে আমি নিরুপায়। আমার কাছে এদের প্রত্যেকেই অপরিহার্যরূপে আজও চির অমলিন। আমার পঞ্চখণ্ডকে আমি ফিরে পেতে চাই, ফিরে পেতে চাই আমার আপনজনকে। হয়তো পাব। ইতিহাস তো আগে থেকে কোন কথা বলে না।

রামচন্দ্রপুর

স্বদেশ স্বদেশ করিস কেন এদেশ তোদের নয় চারণ-কবির এই গান আমরা সমবেত কণ্ঠে গেয়েছি ছোটবেলা আমাদের সোনার গ্রামের পথে পথে। গ্রামের মেয়ে-বধূ আর শিশু-বৃদ্ধের দল সার বেঁধে এসে দাঁড়িয়েছে পথের দুধারে, স্বেচ্ছা-সেবকদলের গানে তারাও উন্মাদনায় অভিভূত হয়েছে। এক এক সময় তাদের চোখে দেখেছি জল, মুখময় যেন কী বিষের বেদনা! পরদেশী শাসনের তীব্র জ্বালা। কিন্তু আজ! বৃটিশ শাসন-মুক্ত দেশের মাটিতেও আজ আমার অধিকার নেই! পিতৃপুরুষের যে ভিটেকে মায়ের মত ভাল বেসেছি, যে মাটিকে প্রণাম করে বিদেশী শাসকের রোষবহ্নিকে বরণ করে নিয়েছিলাম, স্বপ্নময় কৈশোরে আমার জন্মভূমি জননীকে একদিন নবারুণালোকে স্বাধীনতার স্বর্ণ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত দেখব আশায়, সেই মাটিই যেন আজ বিরূপ! স্নেহময়ী সেই মাটির মায়ের কোথায় সেই অভয়া রূপ? তার কোল-ছাড়া ভিটে-ছাড়া হয়ে আজ ছিন্ন-ভিন্ন আমরা। কোথায় মায়ের অভয় আহ্বান? কবির গানই কি তবে সত্যি—স্বদেশ মোদের নয়, দেশের মাটিতে নেই আমাদের কোন অধিকার? মাতৃপূজার এই কি পুরস্কার?

মনে পড়ে স্বদেশী যুগের কথা। কবিগুরুর রাখীবন্ধনের গান গেয়েই আমরা ক্ষান্ত হইনি, মণেপ্রাণে রূপায়িত করেছি কবির বাণী ও প্রেরণাকে। কে হিন্দু কে মুসলমান এ প্রশ্ন বড় করে কোন দিনই আমাদের মনে আসেনি। ভাই ভাই হয়েই আমরা কাজ করেছি পল্লীউন্নয়নে, দেশ ও দেশবাসীর সেবায়।

আমার প্রতিবেশী মুসলমান বন্ধু যেদিন গাঁয়ের মাটি ছেড়ে দূরপথের যাত্রী হল অর্থান্বেষণে সেদিন তাকে বিদায় দিতে যে বেদনা বোধ করেছিলাম সে তো আত্মীয়-বিরহেরই ব্যথা। সেই দূরবাসী বন্ধুর পত্রের আশায় ডাকঘরে যেয়ে যেয়ে আমার কৈশোর-জীবনের কতদিন যে হতাশায় ভরে উঠেছে আজও মনে জাগে তার বেদনাময় স্মৃতি, আবার এক এক দিন তার পত্র হাতে নিয়ে যে কত উৎফুল্ল হয়ে বাড়ি ফিরেছি সে কথাও ভুলে যাই নি। কিন্তু কোথায় আজ সেই বন্ধু? আজ আমি যখন ছন্নছাড়া শরণার্থীর বেশে কলকাতার জনারণ্যে নিজেকে

হারিয়ে ফেলেছি, আমার সেই প্রাণের বন্ধু আমার কথা কি মুহূর্তের জন্যেও ভাবছে? সাত পুরুষের ভিটেমাটি পুণ্য জন্মভূমি ছেড়ে আমরা যেদিন মান-প্রাণের দায়ে বেরিয়ে পড়লাম নিরুদ্দেশ যাত্রায় সেদিন তো বন্ধু এসে বাধা দিল না বা আর কোন মুসলমান প্রতিবেশী এসে বারণ করল না চলে আসতে গ্রাম ছেড়ে!

টম যেন বুঝতে পেরেছিল দুদিন আগেই যে, আমরা চলে যাচ্ছি কোথায় কোন অজানা দেশে। আসার আগের দিন সারা রাত ধরে টমের সে কি কান্না! রওনা হবার দিন সকাল বেলাও খোকন মুঠো মুঠো ভাত দিয়েছে টমকে, কিন্তু টম শুধু তার ল্যাজ নেড়ে নেড়ে খোকনের গা ঘেঁষে এসে কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে, সে ভাতে আর মুখ দেয় নি।

মিনি বেড়ালটাও পিছু নিয়েছিল কদিন ধরে। বাড়ির ছেলেমেয়েগুলোর কতই না প্রিয় সে। শেষ দুদিন দেখেছি আমাকেই আটকে দেবার জন্যে সে যেন একটা প্ল্যান করেছিল। তা না হলে কোনদিন সে যা করেনি তা করবে কেন? চলে আসার আগের পর পর দুরাত মিনি আমার বিছানায় ঠিক আমার পায়ের তলায় শুয়ে কাটিয়েছে। ঘুমের আবেশে তার মিনতি-ভরা স্পর্শও যেন অনুভব করেছি। সকাল বেলা জেগে উঠে লক্ষ্য করেছি তার সকরুণ বিমর্ষতা!

খোকন একবার বলেছিল, টম আর মিনিকে সঙ্গে করে নিয়ে চল না বাবা! খোকনের মাও সায় দিয়েছিলেন তাতে। আমার মনে প্রশ্ন জাগল: ওরা কি দোষ করেছে? ওদের কেন অকারণে দেশছাড়া, ভিটেছাড়া করব? রাজনীতির পঙ্কিলতায় ওরা তো মাথা গলায়নি!

কিন্তু তাতে কি? মানুষেরই প্রতিপালিত জীব ওরা, মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত ওদেরও কিছুটা করতেই হবে। তাই আমাদেরই পাপে দেশবিভাগের সম্মতির পরিণামে পরিজনহীন কত টম কত মিনি যে বেদনা-বিহ্বল হয়ে দিন কাটাচ্ছে আজ কে তার হিসেব রাখে?

আচ্ছা আমাদের টম, আমাদের মিনি এখনও কি আমাদেরই বাড়িতে আছে? টম কি আজও শুয়ে থাকে ঢেঁকী ঘরের বারান্দায় তারই গড়া গর্তটার মধ্যে? অপরিচিতের পদশব্দে আজও কি টম তেমনি গর্জে ওঠে প্রহরীর কর্তব্য পালন করতে? ইঁদুর, পোকা-মাকড় এমন কি সাপ দেখেও মিনি কি এখনও তেমনি তেড়ে যায়? ওরা হয়তো আজও খুঁজে বেড়ায় খোকনকে এঘরে ওঘরে, বাড়ির

উঠানের পেছনে, আর তার সঙ্গ না পেয়ে, আমাদের কাউকে না দেখে হয়তো ডুকরে কাঁদে !

আর আমাদের মুসলমান প্রতিবেশীরা ? যুগ যুগ ধরে পারস্পরিক সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়ে যাদের সঙ্গে পাশাপাশি বাস করেছি, তারা একটুও কি দুঃখবোধ করল না আমাদের ছেড়ে দিতে ? ওরা দাদা ডেকেছে, মামা ডেকেছে, আমরাও ওদের কাউকে ডেকেছি চাচা আবার কাউকে ডেকেছি নানা। রাজনীতির খাঁড়ার কোপে যুগ-যুগান্তের সেই আত্মীয়তার সম্পর্কে কি চিরতরে ছেদ পড়ে গেল ? ওদের কারো কারো মনের মণিকোঠায় হয়তো আজও আমাদের কথা জাগে। কিন্তু ওদের সঙ্গে প্রতিবেশীরূপে আর কি কোন দিন দেখা হবে না ?

গ্রাম ছেড়ে আসার দিনই অসময়ে একটা কাক ডেকে গিয়েছিল আমাদের বাড়ির ওপর দিয়ে। সে ডাকে শুনেছিলাম কান্নার সুর। কাকের কণ্ঠ মনে রাখার মত নয়। তবু যেন পল্লীমায়ের কোল-ছাড়া হয়ে আসার একটু আগে-শোনা শেষ কাক-স্বর আজো কানে বাজে !

নিতান্ত গণ্ডগ্রাম হলেও শ্রীভূমি শ্রীহট্টে একটা গৌরবময় স্থান অধিকার করে রয়েছে আমার সাধের গ্রাম রামচন্দ্রপুর আর তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল। ক্ষুদ্র নবদ্বীপ বলে পরিচিত যে পঞ্চখণ্ড, সংস্কৃত শিক্ষার অন্যতম সেই কেন্দ্রভূমিরই একাংশ আমাদের গ্রাম। মোট আটদশ হাজার অধিবাসীর মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয় ভারতীয় শিক্ষিতের গড়পড়তা হারের তুলনায়। তাঁরা প্রত্যেকেই গর্ব করে এসেছেন এতকাল এই বলে যে, এমন এক ঐতিহাসিক গ্রামে তাঁদের বাস যার অন্তত হাজার বছরের প্রাচীনত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ রয়েছে তাঁদের সামনে।

কুমার ভাস্কর বর্মার তাম্রশাসনের কথা বলছি। কামরূপের রাজা ছিলেন কুমার ভাস্কর বর্মা। থানেশ্বরের অধীশ্বর দানশীল হর্ষবর্ধন শিলাদিত্যের তিনি ছিলেন সম-সাময়িক। আমাদের গ্রাম থেকে মাত্র দুমাইল দূরে নিদনপুরে আবিষ্কৃত হয়েছে ভাস্কর বর্মার তাম্রশাসন। সেই তাম্রশাসনে বর্ণিত কুশারী নদী আজও বয়ে চলে আমাদেরই গ্রামের পাশ দিয়ে। গাঙ্গুলী ও চন্দ্রগ্রামের ইতিকথা কিছু না জানা থাকলেও তাম্রশাসনের উল্লেখ থেকে আমাদের অঞ্চলবর্তী এ দুটি গ্রামের প্রাচীনত্ব ধারণা করা যেতে পারে।

শুধু কি এই ? কত স্মরণীয় কত বরণীয়ের আবির্ভাব ঘটেছে আমাদের এ

অঞ্চলে। পাশের গ্রাম দীঘিরপারে জন্মেছিলেন সুবিখ্যাত নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি। ছেলেবেলায় পড়েছি রঘুনাথের ছোটবেলার কথা। কী অপরিসীম বুদ্ধি ছিল তাঁর অতটুকু বয়সে! পরবর্তীকালে যাঁর প্রতিভার দীপ্তি সারা ভারতকে প্রদীপ্ত করেছিল তিনি ছিলেন আমারই পূর্বপুরুষের প্রতিবেশী, বন্ধুজন হয়তো—একথা ভাবতেও শিহরণ অনুভব করি। সেকালে ছিল না বৈদ্যুতিক আলো, ছিল না দেশলাই। আগুন ধরানো হত চকমকির সাহায্যে। তাও গরীবের পক্ষে ছিল দুর্লভ। পাঁচ বছরের শিশু রঘুনাথকে তাঁর মা বলেছিলেন একটু আগুন নিয়ে আসতে উনুন ধরাবার জন্যে। রঘুনাথ পাশের বাড়ির গিন্নীর কাছে গিয়ে চাইলেন একটু আগুন। গিন্নী জিজ্ঞেস করলেন আগুন নেবার পাত্র কোথায়? রঘুনাথ তখন এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখতে পেলেন রান্না-ঘরের পাশেই এক ছাইয়ের স্তূপ। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি দুহাতভরে ছাই তুলে নিয়ে আবার গেলেন প্রতিবেশী গিন্নী মায়ের কাছে। গিন্নী মা বিস্মিত হয়ে একবার চাইলেন তাঁর দিকে, তারপর একহাতা আগুন তুলে দিলেন হাতের ওপরকার সেই ছাইয়ের ওপর। রঘুনাথ হাসতে হাসতে এগিয়ে চললেন তাঁদের বাড়ির দিকে। সম্মুখেই টোল। পণ্ডিত মশাইয়ের চোখে পড়ল এই বিস্ময়কর ব্যাপার। রঘুনাথকে ডেকে তিনি জিজ্ঞেস করে শুনলেন সব কথা। সব দেখে শুনে তাঁর মায়েরও বিস্ময়ের অবধি রইল না। নিতান্ত দরিদ্র পরিবারের ছেলে রঘুনাথ। ছেলেকে টোলে পড়াবার সাধ থাকলেও বাপ-মায়ের সে সাধ্য ছিল না। কিন্তু সেদিনকার সে ঘটনায় বিমোহিত পণ্ডিত মশাই রঘুনাথকে নিজে ডেকে নিয়ে বিনে পয়সায় তাঁর টোলে পড়াতে লাগলেন। সেই কবে পড়েছি এই গল্প, আজও ভুলি নি। ভোলা যে যায় না।

শ্রীচৈতন্যের জন্মপূত ঢাকা-দক্ষিণ সারা ভারতের তীর্থক্ষেত্র। মাত্র সাত মাইলের পথ সে গ্রাম আমাদের বাড়ি থেকে। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বাড়িতে যথারীতি পূজার্চনা চলছে শুনে এসেছি। নিত্য কীর্তনের ব্যবস্থাও নাকি এখনও অব্যাহত আছে। চৈতন্যদেবের জ্ঞাতি বংশের লোকেরা আজও সেখানে রয়েছেন। কতদিন থাকতে পারবেন তাঁরা জানি না। তবে প্রেমময় শ্রীগৌরাঙ্গের সংকীর্তনে নবদ্বীপের পথে পথে একদিন যেমন ভক্তিরসে মেতে উঠেছিল হিন্দু-মুসলমান একযোগে, 'ক্ষুদ্র নবদ্বীপ' পঞ্চখণ্ডে তেমনি দিন দেখা দেবে সে আশা নিতান্তই দুরাশা। এ যুগে যবন হরিদাসের আবির্ভাব একান্তই

যেন অসম্ভব, ব্রাহ্মণ কালাপাহাড়েরই ছড়াছড়ি চারদিকে। তাইতো দেশমাতৃকার দেহ-খণ্ডন, তাইতো আজকের এই সর্বনাশ—এই হাহাকার!

অমাবস্যার আকাশে পূর্ণচন্দ্র! এও কি সম্ভব? সম্ভব নাকি হয়েছিল এরূপ জনশ্রুতি রয়েছে। অমাবস্যায় পূর্ণিমার চাঁদ দেখিয়েছিলেন আমাদেরই প্রতিবেশী ত্রিপুরা জেলার মেহের কালীবাড়ির সুপ্রসিদ্ধ সাধক সর্বানন্দ ঠাকুর আর আমাদের গুরুবংশের আদি পুরুষ 'ত্রিশূলী' মশাই। 'ত্রিশূলী'র কালী আজও নাকি পূজা পায় আমার গাঁয়ের মানুষের কাছে। কিন্তু পাপশক্তির বিনাশে মায়ের খড়্গ তো আর নেচে উঠে না! 'ত্রিশূলী'র বংশধরেরা তাই বুঝি আজ ত্রিপুরা রাজ্যে পলাতক!

ছোট্ট গ্রাম রামচন্দ্রপুরের অধিকাংশ জমির মালিকই ছোট ছোট জমিদার আর তালুকদার। তাঁদের মধ্যে হিন্দুও আছেন, মুসলমানও আছেন। গ্রামের মধ্যে বিশেষ করে তাঁরাই সম্পন্ন, তাঁরাই শিক্ষিত এবং তাঁদেরই অর্থে ও চেষ্টায় গড়ে উঠেছে পল্লীর ছেলে-মেয়েদের বিদ্যায়তন, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ডাকঘর, ক্লাব ইত্যাদি। তবে শিক্ষা-দীক্ষায় স্থানীয় হিন্দুরাই বেশী উন্নত এবং এ গ্রামের প্রতিষ্ঠাতাও কায়স্থ ভূস্বামীরাই। আর সব জায়গার মত আমাদের গ্রামেও ঝগড়াবিবাদ ছিল। লড়াই ও লাঠালাঠির কথা শুনেছি, দেখেছিও। কিন্তু সে সবই ছিল জমিদারীর লড়াই। সে সব লড়াই আর লাঠালাঠি তালুকদারে তালুকদারে হয়েছে—হিন্দু-মুসলমানের কথা তাতে কোনদিন ওঠেনি। হয়তো কোন ধান ক্ষেতের একটা আল নিয়ে ঝগড়া বেঁধেছে একজন হিন্দু আর একজন মুসলমান তালুকদারের মধ্যে। দেখা গেল বাকী কয়জন মুসলমান তালুকদারই যোগ দিয়েছেন হিন্দু তালুকদারের পক্ষে, আবার কয়েকজন হিন্দু ভূস্বামী সাহায্য করছেন তাঁদের বিবদমান মুসলমান প্রতিবেশীকে। এমন ঘটনা অনেকবারই নাকি ঘটেছে আমাদের গাঁয়ে এবং পাশাপাশি এলাকায়।

সাধারণ হিন্দু-মুসলমান একে অন্যকে সাহায্য করছেন, পাকিস্তান সৃষ্টির বছরেও এমন ঘটনা খুঁজে বেড়াতে হত না। কিছুকাল আগের কথা। সম্ভ্রান্ত তালুকদার উজির আলী ভাগ্য বিপর্যয়ে অত্যন্ত বিপন্ন হয়ে পড়েছেন। বাবার চেয়ে বয়েস কিছু ছোট হলেও একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তাঁদের মধ্যে। উজির আলী সাহেবকে একদিন ডেকে পাঠালেন বাবা। তিনি এলেন এবং বন্ধুর মতই বাবা তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, 'উজির, শুনছি

পারিবারিক মর্যাদা বজায় রেখে সংসার চালানোই নাকি তোমার পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠেছে। তার জন্যে চিন্তা করো না ভাই।' এই বলে বাবা বিনে খাজনায় ভোগস্বত্ব দিয়ে বার বিঘের একটা ধান-জমি লিখে দিলেন উজির আলী সাহেবকে।

বেশ ছিলাম এতকাল। স্বাধীনতার সংগ্রামী সৈনিক হিসেবে বিদেশী শাসক আর তার পদলেহীদের হাতে লাঞ্ছনা সয়েছি দীর্ঘকাল ধরে ; কিন্তু মনের আনন্দে ভাঁটা পড়েনি তাতে কোন দিন। বরং 'ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে, মোদের বাঁধন টুটবে।'—মহাজনের এই মহাবাণী লক্ষ্য সাধনে আমাদের মনোবলকে চতুর্গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। শত নির্যাতনের মধ্যেও দেশবাসীর অপার স্নেহ ও প্রীতি আমাদের করেছে কৃতজ্ঞতায় ভারাক্রান্ত। সেই দেশবাসীরই একাংশ বিষের বাঁশী বাজিয়ে আমাদের করল ঘরছাড়া।

॥ যশোহর ॥

অমৃতবাজার

নিজের গ্রাম সম্পর্কে কিছু বলতে হলে প্রথমেই কি মনে আসে আপনার? মাটি আর মানুষ দুই-ই। দেশের মাটিতে ফলে ফসল, আর সে ফসলের অংশীদার মানুষ গড়ে তোলে গ্রামের সম্মান ও সমৃদ্ধি। আজ নিজের গ্রামকে বিশেষভাবে লক্ষজনের সানুরাগ দৃষ্টির সম্মুখে তুলে ধরবার এই প্রচেষ্টা উত্তর-কাল কিভাবে গ্রহণ করবে কে জানে? ছেড়ে এসেছি যে গ্রাম, একি তার জন্যে অশ্রুবিসর্জন? না, কি ছায়াসুনিবিড় সেই জন্মভূমির প্রিয় সযত্নলালিত স্মৃতি নিয়ে এ এক ঐতিহ্য বিলাস? এ প্রশ্নের জবাব আজ নাই বা দেওয়া হল। তবু গ্রামের কথা বলতে বসে প্রথমেই মনে পড়ছে, দেশবদলের পালায় শরণার্থীর অশ্রু দিয়ে জন্মভূমির এ অর্ঘ্য হয়তো একেবারে ব্যর্থ হবে না। হয়তো গ্রামের মানুষ আবার তার গ্রামকে গভীরতর মমতায় ফিরে পাবে শান্তি ও মৈত্রীর মধ্য দিয়ে।

কোলকাতা-খুলনা রেললাইনে যশোহর জেলার ঝিকরগাছা স্টেশন কোনদিন দেখেছেন? ঝিকরগাছা এ অঞ্চলের অন্যতম বৃহৎ স্টেশন। সুদীর্ঘ সুড়কির প্ল্যাটফর্ম, সন্ধ্যার নরম অন্ধকারে ট্রেণটি গিয়ে পৌঁছলেই গ্রামের গন্ধ পাওয়া যায়। পাশেই স্বচ্ছসলিল কপোতাক্ষ নদ। ঝিকরগাছা থেকে চার মাইল দূরে এ নদের এ পারে আমার গ্রাম অমৃতবাজার, অমৃতবাজারের পূর্বনাম পলুয়া-মাগুরা। গত শতাব্দীর মধ্যভাগে নদীয়া জেলার হাঁসখালি গ্রাম থেকে মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের পূর্বপুরুষেরা এ গ্রামে চলে আসেন বসবাস করবার জন্যে।

বাঙলায় তখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আধিপত্য। এই সুযোগে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে যশোহর জেলায় নীলকুঠিয়াল সাহেবদের অবাধ অত্যাচারে বাঙলার চাষী সম্প্রদায় মুমূর্ষুপ্রায়। কুঠিয়ালদের এই অত্যাচারের নিখুঁত চিত্র সাহিত্যে রূপায়িত করলেন নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র তাঁর 'নীল-দর্পণ'-এ। চাঞ্চল্য জাগল সারা দেশে। বাঙলার অত্যাচারিত কৃষক-জনসাধারণের

দুঃখ-দুর্দশার কথা স্মরণ করে তাদের দাবী জানাবার ভার গ্রহণ করলেন শিশির-কুমার। তিনি নিজের গ্রামের ক্ষুদ্র কুটীর থেকে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' প্রকাশ করতে শুরু করেন। পলুয়া-মাগুরার নূতন নামকরণ হল 'অমৃতবাজার', আমার জন্মভূমি অমৃতবাজার। জনসাধারণের মুখপত্ররূপে অমৃতবাজার পত্রিকার সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকাটিকে জাতির প্রাণকেন্দ্র কলিকাতায় স্থানান্তরিত করতে হল। কিন্তু বাঙ্‌লার এক নিভৃত কোণে এই গ্রামে আজিকার বিশ্ব-বিশ্রুত অমৃত-বাজার পত্রিকার সূতিকা-গৃহের প্রাচীন স্মৃতির সাক্ষ্য এখনও বর্তমান।

গ্রামের পাশ দিয়ে প্রবহমান কপোতাক্ষ, তারই হাত ধরাধরি করে চলেছে চৌগাছা রোড। নদীর সমান্তরালে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে শিশিরকুমার দাতব্য চিকিৎসালয়, শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী বাড়ি, হরিসভা-ভবন ইত্যাদি। মহাত্মা শিশিরকুমারের কৃতীসন্তান তুষারকান্তি ঘোষের প্রচেষ্টায় ১৯৩০ সালে এই দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হয় আর্ত দরিদ্র জনসাধারণের সেবার জন্যে। চিকিৎসালয়ের অনতিদূরেই পথিকদের তৃষ্ণা নিবারণের জন্যে 'পীযূষ-পয়োধি'। সকাল, সন্ধ্যায় সে সরোবরের ঘাটে গ্রামবাসীদের ভিড় জমে।

প্রকৃতির মায়া মালঞ্চ অমৃতবাজার গ্রাম। কপোতাক্ষের বুকে দেশ-বিদেশের পণ্যসম্ভার নিয়ে মাঝিমাল্লারা সারি গেয়ে চলেছে 'হেইয়ে হেয়ো, হেইয়ে হেয়ো' —লগি ঠেলে গুড়-বোঝাই দুহাজারমণী নৌকো এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওরা। সুরটা কানে এসে বাজছে। চৌগাছা সড়ক দিয়ে গোরুরগাড়ি চলেছে ক্যাঁচ্‌-ক্যাঁচ্‌। রাস্তার দুধারে শাল, সেগুন, তাল, কৃষ্ণচূড়া, নিম, নিশুন্দি গাছের সারি। 'পীযূষ পয়োধি'র তীরে গন্ধরাজ, চামেলী, হেনা আর ভাটফুলের গন্ধে বিভোর হাওয়া বাতাস। আঃ, নিঃশ্বাসে তার কত প্রাণ, কত আশ্বাস!

দক্ষিণে ধু ধু করে ধান-কড়াইয়ের ক্ষেত। দূরে দেখা যায় দেওয়ানগঞ্জ, ঝিকরগাছা বন্দর আর তার ঝুলন-সেতু। পুবদিকে বিশাল বিল 'ডাইয়া'। 'ডাইয়া' বিল সত্য সত্যই দর্শনীয়। তার গভীর জলে মৎস্যকন্যার রূপকথার দেশ। যশুরে কৈমাছও মেলে অগাধ। শিকারীদের প্রমোদস্থান এ বিল। ধান পাকার প্রাক্কালে অসংখ্য পাহাড় আর সামুদ্রিক পাখি আসে ঝাঁকে ঝাঁকে। কোলকাতা থেকে ফিরিঙ্গি শিকারীরা ও পক্ষী ব্যবসায়ীরা বন্দুক ও ফাঁদ নিযে আসে শিকারে। সাদা-কালো-ধূসর তাঁবুতে ছেয়ে যায় গাঁয়ের আশপাশ।

সাহেব শিকারীরা খুবই দিলদরিয়া। শিকার সন্ধানে এসে বেশ দুপয়সা খরচা করে যায় তারা। গ্রামবাসীদেরও কিছু অর্থাগম হয় এই মরশুমে।

গ্রামের মধ্যে শ্রীশ্রীকালীমাতার একটি বিগ্রহ আছে। গ্রামবাসীদের বিশ্বাস তিনি নাকি জাগ্রত। জাতিধর্ম নির্বিশেষে হিন্দু-মুসলমান সকলকেই এই কালী-মাতার কাছে পুজো দিতে দেখেছি। আগে নাকি এই পীঠস্থান কপোতাক্ষের কূলে অবস্থিত ছিল। কালের গতি ও ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তনের ফলে এই নদী বর্তমানে অনেকখানি পশ্চিম দিকে সরে গেছে।

বহুজাতের বাস এই গ্রামে। কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, ডাক্তার, কবিরাজ, কবিয়াল্, লাঠিয়াল, কীর্তনীয়া, মৌলভী, পটুয়া কোন কিছুরই অভাব ছিল না। গ্রামটি বহু পাড়ায় বিভক্ত। হিন্দু পল্লীতে মজুমদার, বিশ্বাস, সেন, মিত্র, ঘোষ ইত্যািদি বহু পাড়ার মতন মুসলমান পল্লীতেও কাজী, বেহারা, সর্দার, মোল্লা, পাঠান ইত্যাদি পাড়া রয়েছে। হিন্দু-মুসলমানে কোনদিন কোন বিদ্বেষের ভাব ছিল না। হিন্দুর পূজা-পার্বণে, তার দুর্গোৎসবে, চড়কপূজায় মুসলমান ভাইরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। ভাই-ভাইরূপেই বাস করেছে তারা। একসঙ্গে মিলেমিশে কাজ করে হিন্দু মুসলমান সকলেই গ্রামের উন্নতির জন্যে আত্মনিয়োগ করে এসেছে। হিন্দু চাষী ছিল মুসলমান চাষীর দরদী ভাই, মুসলমানেরাও সুখে-দুঃখে হিন্দুদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। গ্রামবাসী হিন্দু-মুসলমান দৃঢ়কণ্ঠে একটি সত্যই ঘোষণা করে এসেছে ঃ

রাম রহিম না জুদা কর ভাই
দিলটা সাচ্চা রাখো জী।

কালচক্রে আজ রাম রহিম কী করে যে জুদা হয়ে গেল তাই ভাবি। মাটির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত ছিল যে মানুষ, যে চাষী তারা আজ কোথায়, কোন দেশে বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে পড়েছে কে জানে? এই গ্রামেই কৃষাণ-বধূদের গান গাইতে শুনেছি ঃ—

মাটি আমার স্বামী-পূত,
মাটি আমার প্রাণ;
মাটির দৌলতে এবার
গড়িয়ে নিব কান।

এই চাষীদের জন্যে ধান বিলিয়ে দিতেন মহাজন মহেশ কুণ্ডু। হিন্দু-মুসলমান কৃষক সকলেই তাঁকে ডাকত 'ধানীদাদা' বলে।

পাশের গ্রাম ছুটিপুরে পুজোর সময় বসত মেলা। দূর দূরান্তর থেকে গ্রামবাসীরা আসত এই মেলায়। বিজয়ার দিন নদীতে নৌকো-বাইচ দেখতেও বহু দর্শনার্থীর সমাবেশ হত।

গ্রামে সখের যাত্রার দল ও নাট্য-সমিতি গঠিত হয়েছিল। পূজা-পার্বণে গ্রামবাসীদের আনন্দানুষ্ঠানের সময় এদের ডাক পড়ত।

গ্রামের উত্তরে পলুয়া মহম্মদপুর, মুসলমান গরিষ্ঠ গ্রাম। ধীরে ধীরে সে গ্রামের অনেকেই এসে অমৃতবাজারে বসতি স্থাপন করেছিল। নদীর ওপারে 'বোধখানা' ও 'গঙ্গানন্দপুর'। গঙ্গানন্দপুর একটি শিক্ষিত উন্নতিশীল গ্রাম। এ গ্রামের মদনমোহনের মন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সবকিছু মিলিয়েই একটি সুন্দর গ্রাম অমৃতবাজার। এ গ্রামের নামাংকিত সংবাদপত্র আজ বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছে। তুলসীতলার প্রদীপের মৃদু আলোয় ঘেরা সেই গ্রাম তেমনি নীরবে নিভৃতে তার অধিবাসীদের মনে শান্তি ও আশা সঞ্চার করে আসছিল। গ্রাম নিয়েই তাদের সুখ, দুঃখের দিনে গ্রামই ছিল তাদের সান্ত্বনা। আমিও সেই হাজার হাজার গ্রামবাসীরই একজন। রাজনীতির পাকচক্রে কেমন করে যে সে গ্রামকে ছেড়ে আসতে হল জানিনা, জানলেও সে মর্মন্তুদ কাহিনী বর্ণনার ভাষা আমার জানা নেই। গ্রাম ছাড়ব, একথা ভাবতে মন চায়নি। তবু ছেড়ে আসতে হল। বিদায়ের দিন তুলসীতলায়, ঠাকুরঘরে, এমন কি গোয়ালদোরে শেষ প্রণাম জানাল সবাই। বৃদ্ধা পিসিমা ঠাকুরঘরের দোর ছাড়তে চাইলেন না,পিসিমার চোখের জলে সজল ও করুণ মুহূর্তে আমারও মন ভিজে গেল। পূর্বপুরুষদের বহু স্মৃতি বিজড়িত যে গ্রাম আমার কাছে তীর্থস্বরূপ, সেই গ্রাম জননীর উদ্দেশ্যে শেষ সন্ধ্যায় একটি সশ্রদ্ধ প্রণাম রেখে যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হ'লাম। পায়েহাঁটা পথে এগিয়ে চলেছি, মন পড়ে রয়েছে পেছনে। সামনে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, তবু জন্মভূমির আশা লোপ পায়নি। মন বলছে, এ মেঘের অন্তরালেই রয়েছে সূর্যকরোজ্জ্বল উদার নীলাকাশ। কিন্তু সে দিগন্ত আর কতদূর ?

সিঙ্গিয়া

ছায়াচ্ছন্ন সমুদ্রের মতই সীমান্ত-ছোঁয়া রাত্রির মায়া ঘনিয়ে আসে নিঃশব্দে। নিঃসীম নিস্তব্ধতা চারিদিকে—সৃষ্টি যেন নিঃশ্বাস বন্ধ করে আছে অনাগতের অবগুণ্ঠণ উন্মোচনের ব্যাকুলতা নিয়ে। প্রতীক্ষা-প্রখর মুহূর্তগুলি আপনা হতেই ভারী হয়ে ওঠে। দিগন্ত-প্রসারী এই অচঞ্চল স্তব্ধতার মাঝে, অন্ধকারের বুক চিরে পুরী এক্সপ্রেস' উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলে তীর্যক গতিতে—গোটা পৃথিবীর জীবন-শক্তিকে যেন ছুটিয়ে নিযে চলেছে সে।

ধূলি-ধূসর কাঁচের জানালার ভিতর দিয়ে তাকিয়ে আছি বাইরে—কত গ্রাম, কত প্রান্তর, কত বনছায়া একে একে সরে যায় চোখের সুমুখ দিয়ে, কিছুই দাগ কাটে না মনে। অজানা শংকায়, দুর্নিবার সংশয়ে মন আন্দোলিত হতে থাকে। আজন্মের চেনাপরিবেশ ছেড়ে, গৃহহারা আমরা, বেরিয়েছি পথে—নূতন ঘরের সন্ধানে, ঠাঁই খুজে নিতে দেশ-দেশান্তরে। বাস্তুহারা জীবনে সুদূরের আহ্বান, চোখে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের স্বপ্নের ঘোর—দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হয়ে আসে।

সহসা আলোর শিখায় কাঁপন লাগে। ষ্টেশন অতিক্রমের সাংকেতিক ধ্বনি মুখর হয়ে ওঠে—শূন্য মন্দিরে বাঁশীর তীক্ষ্ণ স্বর বড় বেসুরে বাজে। গতির আনন্দ ভুলে যাই। পুঞ্জীভূত চিন্তারাশির জটলা জটিল হ'য়ে ওঠে। ভীরু মন পিছন পানে ফিরে চায় নিতান্তই অসহায়ের মত।

বনানীর অন্তরালে অপস্রয়মান অচেনা গ্রামগুলির মতই ফেলে আসা-জীবনের বিস্মৃতপ্রায় কাহিনী ছায়া ফেলে মনের পাতায়, সুখ দুঃখের স্মৃতি-বিজড়িত ছিন্ন-বন্ধন গ্রামখানি তাজা ফুলের হাসির মতই ভেসে ওঠে চোখের তারায়। অতীতের পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যৎ ম্লান হয়ে আসে, একটা অনিশ্চয়তা ম্রিয়মান করে তোলে মনকে—জীবনের জয় প্রতিষ্ঠার অহঙ্কার নিষ্প্রভ হয়ে আসে।

আমাদের নূতন পরিচয়—এপারে শরণার্থী, ওপারে পরবাসী, স্বাধীনতার সৈনিকদের জীবনে এ এক মর্মান্তিক পরিহাস। শরণার্থী হিসাবে অনুকম্পার পাত্র হতে ঘৃণা জাগে, ব্যথা ঘনায় মনে। আর পরবাসী? সে কথা ভাবতেও মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে—নিষ্ফল আক্রোশে গুমরে গুমরে মরে। স্বার্থোদ্ধত অবিচার বেদনাকে পরিহাস করে। প্রশ্ন জাগে, কেন এমন হয়?

সেদিনও ত দ্বন্দ্ব ছিল, কলহ ছিল, বিরোধ ছিল,কিন্তু পুঞ্জীভূত মালিন্য সেদিন ত আবহাওয়াকে এমন বিষিয়ে তোলেনি, এমন অব্যক্ত বেদনার সৃষ্টি করেনি। স্বার্থে স্বার্থে অপরিহার্য সংঘাত কোন দিন যৌথ পরিবারের পারিপার্শ্বিকতা অতিক্রম করেনি। বিরোধবিসম্বাদে আত্মীয়তার সীমা লঙ্ঘিত হয় নি। বাঙলার আর পাঁচখানা গ্রামের মতই আমাদের গ্রামেও হিন্দু-মুসলমান পরস্পরকে আপন জেনে সদ্ভাবে বসবাস করেছে। শরতের স্বচ্ছ আকাশে কাজল কালো মেঘের আবিলতা স্থায়ী হতে পারে নি—ক্ষণিকের বর্ষণেই মলিনতা ধুয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

খরস্রোতা 'চিত্রা' ও 'নবগঙ্গা'র মোহনায় যশোহরের বিশিষ্ট ব্যবসাকেন্দ্র নলদির প্রান্তবর্ত্তী আমাদের এই ছায়া-ঢাকা গ্রামখানি, প্রকৃতির মায়া মালঞ্চ যেন। বাইরে থেকে বোঝাই যায় না—ঘরবাড়ি আছে, রাস্তাঘাট আছে, না হাজার লোকের বসতি আছে। কবে কোন্ এক অজ্ঞাত প্রভাতে কে যে এর নাম দিয়ে ছিল 'সিঙ্গা' সে কথা কেউ মনে করতে পারে না। ব্রিটিশ আমলে ডাকঘর প্রতিষ্ঠা কালে গ্রামের নূতন নামকরণ হল 'সিঙ্গিয়া', এই কথাই শুধু মনে পড়ে।

সবুজ স্নিগ্ধ গ্রামখানির সারা অঙ্গে অপূর্বশ্যামলিমা। নিত্য কালের অতিথির মতই 'বারো মাসে তের পার্বণ' এই পল্লীরও মধুর আকর্ষণ।

এই সব উৎসবে, আনন্দে হিন্দু মুসলমান সমভাবেই অংশ গ্রহণ করেছে—মেলায়, নৌকা বাইচে, ঘোড়-দৌড়, গরু দৌড়ের তীব্র প্রতিযোগিতায় সে কী উদ্দীপনা! সেই আনন্দ গ্রামের নিস্তরঙ্গ জীবনকে সাময়িকভাবে হলেও মুখর করে তুলেছে। আবার কখন গভীর রাতে ধান খেতের কিনারে দেখা গেছে অসংখ্য টিম টিমে আলো—আলেয়ার আলোর মত কখনও স্পষ্ট হয়ে চোখে পড়ে, কখনও বা ধানের শীষের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়। কাছে গিয়ে অবাক হয়ে দেখতে হয়, হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে 'কোচ' দিয়ে মাছ মেরে চলেছে। আলোয় মাছ মারার এই মরশুমেও মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কত নিবিড় তারই পরিচয় প্রতিভাত হয়েছে। অনেক উঁচু ঐ আকাশ, চাঁদ-সূর্য হাত ধরাধরি করে সেদিনও সেখানে ঘুরে বেড়িয়েছে।

এই সেদিনের কথা। চারজন মুসলমান আসামী, নারী নিগ্রহের দায়ে অভিযুক্ত। মিত্র বাবুদের সদর কাছারীতে বিচার শুরু হয়েছে। গ্রামের লোক ভেঙ্গে এসে কাছারী বাড়ির বিস্তীর্ণ অঙ্গনে ভিড় জমিয়েছে। হিন্দুর কাছারী

বাড়িতে বিচার, বিচারকদের মধ্যে আছেন বাবুরা ছাড়া কয়েকজন সম্ভ্রান্ত মাতব্বর মুসলমান। কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা হল। আসামীরা নির্বিবাদে শাস্তি মাথা পেতে নিলে। পুলিশ নেই, আদালত নেই, দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নেই, নেই কোন কোলাহল। সুস্থ পরিবেশে সুষ্ঠু ব্যবস্থা। কঠোর দণ্ডাজ্ঞার মধ্যে ভবিষ্যৎ প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর পরিস্ফুট হয়ে উঠল। অপরাধীর শাস্তি দিতে উভয় সমাজকেই একযোগে এগিয়ে আসতে দেখেছি সেদিন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরেই গো-হত্যার ব্যাপারেও অনুরূপ ব্যবস্থায় বিচার সভা বসতে এবং গ্রাম্য পঞ্চায়েতের কঠোর সিদ্ধান্ত নির্মমভাবে প্রযুক্ত হতেও দেখেছি। তথাপি ধর্মের জিগির ওঠে নি, ধর্মের নামে জোটপাকানর কথা কেউ ভাবে নি। স্বাভাবিক জীবনধারায় ব্যতিক্রম সৃষ্টি শাস্তিবিধানের যোগ্য বলেই বিবেচিত হয়েছে।

মাষ্টার সাহেবের পাঠশালাতেই বা না পড়েছে কে? পরবর্তী জীবনে যারা প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন, বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডার হতে আহরণ করে যাঁরা সমাজে মর্যাদার আসন লাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে এমন কে আছেন যিনি মৌলবী আব্দুল বিশ্বাসের পাঠশালায় হাতে খড়ি দেন নি এবং মাষ্টার সাহেবের শাসানি চোখরাঙ্গানি ও চাবুক সহ্য করেন নি। শনের মত সাদা একগাল দাড়ি, দারিদ্র্যের কুঞ্চিত রেখা সর্ব অবয়বে, সৌম্য-মূর্তি মাষ্টার সাহেব। বড় ঘরের ছেলেদেরও তাঁর কাছে পাঠ নিতে আটকায় নি, শাস্তি গ্রহণেও অমর্যাদা হয় নি। একটানা জীবনস্রোতে কখনও বিস্ময়কর ছন্দ-পতন ঘটে নি।

'ছুটি, বটি দিয়ে কুটি' হাঁক দিতে দিতে ছেলের দল ছুটির পর মাঠে এসে নেমেছে। 'হাডুডু', 'বুড়ি ছোঁয়া' 'কানা মাছি', প্রভৃতি নিভাঁজ গ্রাম্য খেলাধুলার মধ্যে কিশোর জীবনে যে অনাবিল আনন্দের সঞ্চার হয়েছে, সে আনন্দের অংশ থেকে মিনু, হারাণ, ভোলাদার সঙ্গে আজিজ, করিমও বাদ পড়ে নি। খেলার মাঠে হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ দেখি নি, বিত্তশালী ও বিত্তহীনের প্রশ্ন ওঠে নি। কিন্তু কখনওই কি কোন গোলযোগ বাধে নি? খেলায় হারজিত নিয়ে মারপিট পর্যন্ত হতেও দেখেছি, কিন্তু মাষ্টার সাহেবকে ডিঙ্গিয়ে অভিযোগ অভিভাবকের কানে কোন দিন পেঁাছতে পারে নি। আজও তো সেই গ্রামই আছে।

এই তো সেই গ্রাম, যেখানে একটি পল্লী পাঠাগারকে কেন্দ্র করে একদিন রাজনৈতিক চেতনা গ্রাম হতে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল।

কলেজের ছাত্র 'কালোদা' সেবার পূজোর ছুটিতে বাড়ি এসে সকলকে কাছে ডেকে বোঝালেন, ক্লাসের পড়াই সব নয় রে, জীবনে বড় হতে হলে চাই মনীষা, চাই জ্ঞানার্জনের নেশা। এই লক্ষ্যের পথে গ্রন্থাগার যে অপরিহার্য, সে সম্বন্ধে তাঁর কথায় নিঃসংশয় হয়ে ছেলের দল আমরা মেতে উঠলাম লাইব্রেরী গড়ে তুলতে। 'বিবেক লাইব্রেরী' ভূমিষ্ঠ হল। মুখ্যতঃ স্বামীজীর গ্রন্থাবলী আর স্মরণীয় যাঁরা তাঁদের কয়েকজনের জীবনী নিয়ে গ্রান্থাগারের উদ্বোধন হল। কিশলয় অঙ্কুরিত হল, ক্রমে ক্রমে কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনে যেদিন পা দিল সেদিন থেকে এই সাংস্কৃতিক কেন্দ্রকে অবলম্বন করে রাজনৈতিক চক্র গড়ে উঠতে লাগল। মহাত্মাজীর অসহযোগ আন্দোলন কিম্বা অগ্নিযুগের আত্মাহুতির আহ্বান কোনটাই বাদ পড়েনি গ্রাম্য জীবনে প্রতিফলিত হতে—প্রান্তবর্তী এই গ্রামখানির সঙ্গে আশেপাশের গ্রামগুলিকেও আলোড়িত করতে। সেদিনের সেই জাতীয় আন্দোলনকে পুষ্ট করতে, প্রেরণা দিতে এই পল্লী পাঠাগারের অবদান যে কতখানি, তার হিসাব আজ আর কে করবে ?

পুলিশ সাহেব এলিসন ও পূর্ণ দারোগা নির্বিচারে তল্লাসী, গ্রেপ্তার, গৃহদাহ ও লুণ্ঠন চালিয়েও জনতার কণ্ঠ রুদ্ধ করতে পারেনি, কংগ্রেস ভবনটিকে পুড়িয়ে দিয়েও গ্রামের মানুষের মন থেকে কংগ্রেসকে নির্বাসিত করতে পারেনি। বিপ্লবী সন্দেহে এগারজন যুবককে যেদিন একসঙ্গে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল, নারী-পুরুষনির্বিশেষে গ্রামের সকলে সেদিন রাস্তায় রাস্তায় মিছিল করে তার প্রতিবাদ জানিয়েছিল। ভিতর বাড়ির অংগন ও নদীর ঘাটের বাইরে যাদের কোন পরিচয় নেই সেই সব পুরললনারাও সেদিন রাস্তায় নেমে এসেছিলেন ধৃত তরুণদের অভিনন্দিত করতে। স্বতঃস্ফূর্ত হরতালে মুসলমান সমাজও যোগ দিতে এগিয়ে এসেছিলেন। নারীপুরুষের মিলিত কণ্ঠে বন্দেমাতরম ধ্বনির মধ্যে বন্দীদের নিয়ে পুলিশ সাহেবের লঞ্চ ছেড়ে গেল। জাতীয় ধ্বনির মধ্যে জনতার প্রতিবাদ ও রুদ্ধ আক্রোশ ফেটে পড়তে লাগল। লঞ্চ চলে গেল। নদীর এপারে ওপারে তখনও গাঁয়ের লোকের ভিড়, চোখে তাদের প্রতিবাদের স্ফুলিঙ্গ।

গ্রন্থাগারের সঙ্গে সঙ্গে ব্যায়ামাগারও গড়ে উঠতে থাকে। শরীর চর্চায় এমনি অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি হয় যে, খেলার মাঠে লোক-অভাব বিস্ময়ের বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। যে খেলা তরংগ তোলে মনে সেই ফুটবল, ক্রিকেট থেকে লাঠিখেলা, ছোরাখেলার আকর্ষণ প্রবল হয়ে ওঠে। গ্রাম হতে গ্রামান্তরে

'আন্দোলনের ঢেউ গিয়ে লাগে। জোয়ান ছেলে জোর কদমে চলে অটুট সংকল্প নিয়ে।

প্রবীণদের ও মধ্যবয়স্কদের আড্ডা বসে বসুবাটীতে, রাজকাছারীতে, আর মিত্রবাবুদের বৈঠকখানা ঘরে। দুমাইল দীর্ঘ গ্রামখানির অধিকাংশ লোক জমাজমির উপর নির্ভরশীল, অভাবের তাড়না নেই তেমন। তাছাড়া সম্পন্ন পরিবারের যারা, আড্ডা জমাতে তাদেরই উৎসাহ বেশী। তাস, পাশা, ও দাবাকে ভর করে নৈশ আড্ডা জমে ওঠে। এই আড্ডার আনুষঙ্গিক পান-তামাক এবং কোন কোন ক্ষেত্রে চা। রাত্রি আটটায় গ্রাম যখন ঘুমোয়, এদের খেলার আসর সবে তখন জমে ওঠে। রাত্রি বারোটায় সুপ্তিমগ্ন গ্রামের জনবিরল পথে যে যার গৃহের পানে চলে। ডরে আশংকায় কেউ বা হাততালি দেয়, কেউ বা লাঠি ঠক-ঠক করে চলে। আর বলে দস্যি ছেলেদের হাতের কোদাল পড়ে' বর্ষা-ধোয়া গ্রামের দুর্গম পথও এমনি সুগম হয়েছে যে চোখ বুজে চলতেও বাধা নেই আর। সোয়াস্তিতে চলে আর আশীর্বাদ করে মনে মনে।

পথের প্রান্তে চালাঘরের মধ্যে লণ্ঠন জ্বালিয়ে সখের যাত্রার মহড়া চলে। নারীকণ্ঠের ব্যর্থ অনুকরণে পুরুষের কর্কশ স্বর অন্ধকারের বুকে আছড়ে পড়তে থাকে। হারমোনিয়ামের চড়া আওয়াজ নিশুতি রাতের স্তব্ধতাকে ব্যঙ্গ করে মাঝে মাঝে, আকাশে তারার মালা তখনও মিটমিট্ করে।

গ্রামের ছেলেরা প্রতিবছর দলে দলে পড়তে যায় পার্শ্ববর্তী শহরের স্কুলে, লজিং-এর অথবা বোর্ডিং-এ আশ্রয় খুঁজে নিতে হয়। তবু গ্রামে হাই-স্কুল গড়ে ওঠে না। চাষী প্রজারা ইংরেজী লেখা-পড়া শিখলে বাবুদের মান্য করবে না, এই আশংকাতেই নাকি গ্রামের কর্তারা গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠায় বাদী হন—সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশকেও হার মানিয়ে ছাড়েন। কেরাণীর অভাব পূরণের জন্যে একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও বৃটিশকে একদিন বাধ্য হয়েই ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তন করতে হয়েছিল। এঁদের তো সে বালাই নেই। উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যা হলেই নায়েব গোমস্তার কাজ আটকায় না। তাই স্কুল স্থাপনের প্রয়াস কয়েকবারই ব্যর্থ হয়েছে, ফলপ্রসূ হতে পারেনি। কিন্তু কৃতী ছেলেরা সেবার ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি সামনে রেখে কাজে নেমে গেল। প্রধান শিক্ষক বাইরে থেকে এলেন, বহুজনের সমবেত চেষ্টায় স্কুল গড়ে উঠল। যথাসময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনও পাওয়া গেল। দুই শতাধিক ছাত্র প্রতিষ্ঠানটির পাকা ভিত গড়ে

তুলল। চালু প্রতিষ্ঠান স্বাভাবিক নিয়মেই চলতে লাগল। কর্তারা বললেন, 'এইবার গ্রাম গেল, মানীর মান-সম্ভ্রম বিপন্ন হল' কিন্তু সেদিনও গ্রায় যায়নি। বিদ্যাপীঠ পল্লবিত হয়ে জীবন্ত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হল। সম্ভ্রম কিন্তু তখনও বিপন্ন হয়নি, আত্ম-প্রত্যয় ও আত্ম-প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র রচিত হয়ে জীবনের জয় সুচিত হল। নীল আকাশের আস্তরণের নীচে আজও স্কুল ভবনটি তেমনি আছে। সেইসব শিক্ষক আজ আর নেই, যাঁরা ত্যাগের আদর্শকে ছাত্রদের সামনে তুলে ধরেছিলেন, আর সেই সব ছাত্রও নেই যারা আর্তের সেবায় বিপদের ঝুঁকি নিতে অকুণ্ঠিত ছিলেন। আর সবই আছে, নেই শুধু প্রাণের স্পন্দন, জীবনের সাড়া নেই কোথাও।

জেলা-বোর্ডের রাস্তাটি আজও একইভাবে গ্রাম ও বিলের স্বতন্ত্র সত্ত্বার সাক্ষ্য হ'য়ে আছে। আজও এই পথে দেশ-দেশান্তরের লোক যাতায়াত করে; গ্রামের লোক বাজারে যায়, ডাকঘরে যায়, ষ্টীমার ঘাটে যায় এই পথে। কিন্তু সংকীর্তনের দল আর বেরোয় না, শিবের গাজন এ পথে চলে না।

শারদোৎসবে, চড়ক মেলায়, কালীপূজায় ও হোলি খেলায় যে স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণ-বন্যা গ্রামখানাকে প্লাবিত করে দিত, বাজী-বাজনায়, সাজে-সজ্জায়, আমন্ত্রণে-নিমন্ত্রণে যে প্রাণের পরিচয় প্রত্যক্ষ হয়ে উঠত, আজ তা অলীক কাহিনী।

ছেড়ে-আসা-গ্রামের ছায়া-শীতল ঘরের মায়া নিত্য পিছন টানে, তবু চলতে হয় অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পথে। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ একাকার হয়ে দৃষ্টিকে ঝাপসা করে দেয়। পারিপার্শ্বিক ভুলে যাই, মনের গভীরে জাগে—মাটি চাই, ঠাঁই চাই, জীবনের বিকাশের পথ উন্মুক্ত পেতে চাই।

ট্রেণের গতি আবার স্তব্ধ হয়ে আসে। চোখ-ঝলসানো আলো এসে চোখে লাগে। বড় স্টেশন—বালেশ্বর। অগ্নিযুগের রোমাঞ্চময় স্মৃতি বিজড়িত এর সাথে। বিপ্লবের পূজারীর ঐতিহাসিক বীরত্বগাঁথা সহসাই প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে —চলচ্চিত্রের মতই ছায়া ফেলে যায় মনে। অমাবস্যার অন্ধকারের পারে একফালি চাঁদ চিক্ চিক্ করে ওঠে। বাঙালী বীরের বিপ্লব সাধনার তীর্থপীঠ বালেশ্বরে দাঁড়িয়ে সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের স্বপ্ন জাগে চোখে। ভরসা জাগে, পূর্বাঞ্চলের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে মানুষের শব-দেহের সারে অংকুরিত হবে নবীন শস্য অনাগত ভবিষ্যতে। বিপ্লবের বহ্নিশিখায় পূর্ণ হবে আবর্তন।

বিপ্লবী বীর, এই সংকটক্ষণে তোমাকে স্মরণ করি, স্মরণ করি তোমার সংগ্রাম ও সংগঠন প্রতিভাকে। পথের দিশারী তুমি, তোমাকে নমস্কার।

॥ খুলনা ॥

সেনহাটী

নদীর নাম ভৈরব। নদী নয় নদ। কিন্তু ভৈরবের সে রুদ্র প্রকৃতি এখন আর নেই। কয়েক বছর আগে খুলনা জেলার গ্রামান্তে এই নদী একবার তার রুদ্ররূপ ধারণ করেছিল। দু'তীরের জনবসতি কুক্ষিগত করে নিয়েছিল সে উদ্দাম উত্তাল ভৈরব। তারপর আর নয়। মন্ত্রশান্ত ভুজংগের মত সে পড়ে আছে পদপ্রান্তে, আমার গ্রাম সেনহাটীর পদপ্রান্তে। পূর্ব বাঙলার অন্যতম বিখ্যাত গ্রাম এই সেনহাটী। অনেক ইতিহাস বিজড়িত হয়ে আছে এর সঙ্গে। জনশ্রুতি আছে, বল্লাল সেন তার জামাতা হরি সেনকে 'জামাইভাতি' স্বরূপ এই গ্রামখানি দান করেছিলেন। হরি সেনই তার নাম রাখেন 'সেনহাটী'। কবিরামের 'দিগ্বিজয়-প্রকাশ' গ্রন্থে বলা হয়েছে লক্ষণ সেন সুন্দরবনের জংগল কেটে যশোহরের কাছে 'সেনহাটী' নামে একটি নগর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সে যাই হোক, ইতিহাসে আজ আর প্রয়োজন নেই। সেনহাটী আজ স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত।

সে গ্রমেরই ছেলে আমি। সে জন্যে আমি গৌরবান্বিত। গ্রামের দক্ষিণ দিকে ভৈরব নদ। এ গ্রামে প্রবেশের প্রধান পথ দক্ষিণ দিকেই। নদীপথে এলে গ্রাম-প্রবেশের যে প্রথম ঘাট, তার নাম 'খেয়াঘাট'। স্কুলঘাট দিয়েও গ্রামে প্রবেশ করা যায়। সবচেয়ে বড় ও প্রশস্ত ঘাটের নাম 'জজের ঘাট'। এর কিছুদূরেই শ্মশান ও ষ্টীমারঘাট। জজের ঘাট থেকে শুরু করে একটি প্রশস্ত বাঁধানো রাস্তা গ্রামের হৃদপিণ্ড ভেদ করে যেন অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত গিয়ে পেঁৗছেচে। গ্রামের মধ্যে এই জজের ঘাটটি সর্বজনপ্রিয়। বহু বছর ধরে গ্রামের সমস্ত তরুণদের বৈকালিক আড্ডার আসর ছিল এটি। ডালহৌসী স্কোয়ারে টেগার্টকে হত্যার চেষ্টায় বিফলকাম যে বিপ্লবী শেষে ফাঁসীরমঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়েছিল সেই অনুজা সেন ও 'ষ্টেটসম্যান' সম্পাদক ওয়াটসন্‌কে হত্যার চেষ্টায় বিফল হয়ে যে বিপ্লবী প্রাণ দিয়েছিল—সেই অতুল সেন ও অন্যান্য কত সাহসী তরুণকে দেখেছি নদীঘাটের এই বৈকালিক আড্ডা থেকে বাজী রেখে হঠাৎ

নদীগর্ভে ঝাঁপিয়ে পড়ে তরংগসংকুল সুপ্রশস্ত ভৈরব-নদ পারাপার করছে। সে দুর্বার প্রাণচাঞ্চল্য আজ কোথায় যেন মিলিয়ে গেছে। এও মনে পড়ে নদীর অপর-পারে পল্লীতে হঠাৎ একদিন নিজেদের ভেতর যখন দাংগা বাধে তখন ওপার থেকে ভীত শিশু ও নারীর আর্তনাদ এপারে ভেসে আসতেই এপারের ছেলেরা নৌকোর জন্যে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করে নির্বিচারে স্রোতবহুল নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওপারে গিয়ে দাংগাকারীদের শান্ত করে এসেছিল। এসব ঘটনা আজ মধুর স্মৃতিতে পরিণত হয়েছে।

রাজনৈতিক জীবনে সেনহাটীর নাম উল্লেখযোগ্য। সেই 'হিন্দু স্বদেশী মেলা'র যুগের বিপ্লবী নেতা স্বর্গত হীরালাল সেন থেকে আরম্ভ করে শহীদ অনুজা ও অতুল পর্যন্ত সকলেই গ্রামে সাধারণ সরল জীবন-যাপন করতেন। এই প্রসংগে মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথ একবার বিপ্লবী হীরালাল সেনের পক্ষে সাক্ষ্য দেবার জন্যে খুলনার আদালতে হাজির হয়েছিলেন। হীরালালবাবু কিছুদিন রবীন্দ্রনাথের কোন জমিদারীর ম্যানেজার ছিলেন। এই সূত্রে তাঁকে সাক্ষী-মানা হয়েছিল। বিশ্বকবি বিনাদ্বিধায় সেই বিপদের দিনে বিপ্লবী হীরালালের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। সেই মোকদ্দায় হীরালালের জেল হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজে তার পরিবারের তত্ত্বাবধানের সকল ব্যবস্থা করেছিলেন। সেনহাটীর অনতিদূরবর্তী 'দৌলতপুর' গ্রামে বিপ্লবী কিরণ মুখার্জি প্রতিষ্ঠিত 'সত্যাশ্রম' আমাদের গ্রামের তরুণদের মনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। সেখানেই অনেক বিপ্লবীর প্রথম দীক্ষা। আশ্রমটির কার্যকলাপ বাহ্যতঃ সমাজসেবায় পরিস্ফুট থাকলেও এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক। সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের গ্রামেও অনুরূপ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। 'প্রবুদ্ধ সমিতি' প্রতিষ্ঠানটি এদের অন্যতম। শহীদ অনুজা ও অতুল এই সমিতির সভ্য ছিলেন। আজ মনে জাগছে এঁদের মত কত নিঃস্বার্থ তরুণ-তরুণীর আত্মদানে এই দেশের স্বাধীনতা এসেছে, কিন্তু তাদেরই মা, ভাই, বোনরা সব আজ একটু আশ্রয়ের খোঁজে দিশেহারা। তাঁদের শত আবেদন-নিবেদনেও রাজমসনদে বাদশাজাদার তন্দ্রা টুটে যায় না।

বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের বাস সেনহাটী। খ্যাত, অখ্যাত বহু লোকের জন্মভূমি এই গ্রাম। দুর্গাপূজা উপলক্ষে গ্রামের তিনটি বিশিষ্ট বাড়ি 'কবিরাজ-বাড়ি', 'বক্সীবাড়ি' ও 'ডাক্তার বাড়ি'তে পূজোর তিন-রাত্রি যাত্রাগান হত। স্থানে স্থানে

সৌখীন সম্প্রদায়ের থিয়েটার হত 'ভেনাস ক্লাব' 'বান্ধব, নাট্য সমিতি' ও 'ছাত্র নাট্য সমিতি' এ তিনটি সৌখীন নাট্য সম্প্রদায় তাদের অভিনয় নৈপুণ্যে বিশেষ সুনাম অর্জন করেছিল। কোলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি এস, আর দাশগুপ্ত, ব্যারিষ্টার নীরদ দাশগুপ্ত প্রভৃতি 'ভেনাস ক্লাবে'র সভ্য ছিলেন। এঁদের অভিনয় কৃতিত্বের কথা আজ গ্রামবাসীরা গর্বের সঙ্গে স্মরণ করে। নাট্যকার শচীন সেনগুপ্তও এ গ্রামের লোক। তিনিও গ্রামে কয়েকবার কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনয় করেছেন।

এই সব যাত্রা, থিয়েটারে কত মুসলমান হিন্দুর পাশে বসে গান শুনতেন। কত মুসলমান 'ধ্রুব', 'প্রহ্লাদের' দুঃখে বিগলিত হতেন, 'সীতা হরণ' দেখে ক্রুদ্ধ হতেন। আজ সেই সব সরল প্রাণ গ্রামবাসী মুসলমান প্রতিবেশীরা কোথায়? বিজয়া-দশমীর দিন সন্ধ্যায় নদীর-তীরে অভূতপূর্ব দৃশ্যের সমাবেশ হত। প্রায় পঞ্চাশখানা প্রতিমা সারি সারি জোড়া নৌকোর বুকে বাজনার তালে তালে নেচে বেড়াত। ষ্টীমারে করেও অনেক দর্শক আসত প্রতিমা বিসর্জন দেখবার জন্যে। অসংখ্য নৌকার বাজনাদারদের বাজনার দাপটে ও নৌকো-ষ্টীমারের ভিড়ে এক মাইলব্যাপী নদী-পথে 'সামাল সামাল' রব পড়ে যেত। সমস্ত জায়গা জুড়ে একটা নৌ-যুদ্ধের আবহাওয়া সৃষ্টি হত। তারপর 'বিসর্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে' বিষণ্ণচিত্তে সবাই ঘরে ফিরতেন। দশমীর প্রীতি আলিংগনে পরিবেশ মধুর হয়ে উঠত।

ব্যবসায়িক জীবনেও সেনহাটীর মান ছিল উন্নত। গ্রামটি নদী-তীরে অবস্থিত বলে নানাদেশের পণ্য বিশেষ করে 'সুন্দরবন' থেকে আনীত বহু জিনিস এখানে ক্রয় বিক্রয় হত। গ্রামের প্রধান বাজারটি নদী-তীরেই বসত—এ ছাড়া কয়েকটি হাট সপ্তাহে দু-এক দিন গ্রামের অন্যত্র বসত। ক্রেতা-বিক্রেতারা বিভিন্ন শ্রেণীর হলেও কিছু সময়ের জন্যে হিন্দু মুসলমান সকলেই মিলেমিশে এক পরিবার বনে যেতেন—'খুড়ো', 'ভাই'-'দাদা' সম্বোধনের পরিবেশে বিভিন্ন শ্রেণীগত লোকের এরূপ আন্তরিক মিলন আর কখনও সম্ভব হবে কিনা কে জানে। এই হাট-বাজারেই গ্রামবাসীদের দৈনন্দিন জীবনের অধিকাংশের সুখ-দুঃখের, আশা-নিরাশার কথা হত। সে সবই আজ স্বপ্ন বলে মনে হয়।

গ্রামের কয়েকটি প্রাচীন কীর্তি উল্লেখযোগ্য। 'সদ্ভাবশতক'-এর অমর কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের বাড়িতে বাসুদেব মূর্তি এক অতি প্রাচীন কীর্তি। মূর্তিটি

কষ্টিপাথরের বলে মনে হয় এবং উচ্চতায় হবে দু'ফিট্, মূর্তির মাথায় কিরীট, পরিধানে আজানুলম্বিত কটিবাস, গলায় কটি-দেশাবলম্বী বক্ষোপবিত ও আজানুলম্বিত বনমালা। দক্ষিণাধঃ-হস্তে পদ্ম, দক্ষিণোর্ধ্বে গদা, বামোর্ধ্বে চক্র ও অপর বামহস্তে শঙ্খ এবং দক্ষিণপার্শ্বে পদ্মহস্তা শ্রী ও বাম-পার্শ্বে বীণাহস্তা পুষ্টি দণ্ডায়মানা। মূর্তির পদনিম্নে গরুড় ও গরুড়ের দক্ষিণে দুটি ও বামে একটি অপরিচিত মূর্তি। এই মূর্তি কোন্ সময়ে, কোথা থেকে, কার দ্বারা, কীভাবে আনীত হয়েছিল সে সম্বন্ধে একটি কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে।

সাড়ে চারশ বছর আগে সেনহাটী গ্রামের নরহরি কবীন্দ্র বিশ্বাস কামাখ্যা-ধিপতির রাজধানীতে কিছুদিন দ্বারপণ্ডিত নিযুক্ত ছিলেন। এই সময় তিনি কামাখ্যা মহাপীঠস্থানে উৎকট তপস্যা করে মহামায়ার কৃপায় লক্ষ্মীদেবীর মূর্তি-সহ বাসুদেব মূর্তি লাভ করেন। কিন্তু মায়াতরীযোগে গৃহে ফিরে এসে বাসুদেবের মূর্তি পূর্বে গৃহে নিয়ে যাওয়ায় লক্ষ্মীদেবী নৌকোসহ অন্তর্হিতা হয়ে যান এবং কবীন্দ্র আকাশবাণী শুনতে পান—'আমাকে উপেক্ষা করে তুমি আগে ঠাকুরকে ঘরে নিয়ে গেছ—আমি তোমার ঘরে আর যাব না। তুমি ঠাকুরকে ভালবাস, তাঁকেই পূজা কর—তাতেই তোমার মংগল হবে।' সেই থেকে বাসুদেবের মূর্তিটি সেনহাটীতে পূজিত হয়ে আসছে।

সেনহাটীর দ্বিতীয় প্রাচীন কীর্তি ইতিহাস-বিখ্যাত মহারাজ রাজবল্লভ নির্মিত একটি শিবমন্দির, একটি রাসমঞ্চ ও তাঁর খনিত একটি দীঘি। সাধারণের চক্ষে এ সবের মূল্য অল্প হলেও ঐতিহাসিকের নিকট এর যথেষ্ট আদর আছে। কারণ মোগল স্থাপত্যের আদর্শ অনুকরণে রাজবল্লভ তাঁর বাসভূমি রাজনগরকে যে সকল কারু-কার্যময় বিবিধ সৌধ ও সপ্তরত্ন ও শতরত্ন নামক বিশাল বিরাট মঠাদির দ্বারা সজ্জিত করেছিলেন, কীর্তিনাশা পদ্মার বিরাট গ্রাসে পড়ে তা চিরদিনের জন্য লোকচক্ষুর অগোচর হয়েছে। সুতরাং রাজবল্লভ-নির্মিত সৌধাবলীর গঠন প্রণালী ও বাঙালীর কলা কুশলতার ও স্থাপত্য নৈপুণ্যের সাদৃশ্য অনুভব করতে হলে এই দুটি থেকে তার কতক পরিচয় পাওয়া যাবে।

সেনহাটীর তৃতীয় প্রাচীন কীর্তি 'শিবানন্দ' ও 'সরকার ঝি' নামক দুটি প্রাচীন দীঘি। দ্বিতীয় দীঘিটির নামকরণ কাহিনীটি বড়ই করুণ ও মর্মস্পর্শী। এ সম্বন্ধে জনশ্রুতি এই যে, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে যশোহর মৃজানগরে নূর-উল্লা খাঁ নামক একজন ফৌজদার ছিলেন। তাঁর সৈন্যসামন্তের ভার ছিল তাঁর

জামাতা লাল খাঁর হাতে। যুবক লাল খাঁ অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির লোক ছিল। লাল খাঁর অত্যাচারে গৃহস্থ বধূগণ ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতেন। অবশেষে তার অত্যাচার চরমে ওঠে। তার পাপদৃষ্টি নূরউল্লার হিসাবনবীশ রাজারাম সরকারের বিধবা কন্যা সুন্দরীর ওপর পড়ে। তাকে লাভ করবার জন্য লাল খাঁ নূরউল্লার অনুপস্থিতিতে বৃদ্ধ রাজারামকে কারারুদ্ধ করে— তার পরে তাঁর ওপর ভীষণ অত্যাচার করতে শুরু করে।

সুন্দরী অল্পবয়স্কা হলেও বুদ্ধিমতী ছিলেন। পিতার নির্যাতনের সংবাদ জানতে পেরে তিনি লাল খাঁর প্রস্তাবে সম্মতির ভান করে বলে পাঠালেন— আমার পিতাকে ছেড়ে দিলেই আপনার প্রস্তাবে সম্মত হতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু তার পূর্বে আমি আমার পিত্রালয় সেনহাটীতে একটি পুকুর কাটিয়ে সাধারণের কিছু উপকার করতে চাই, আপনি সেই বন্দোবস্ত করে দিন।' সুন্দরীর কথা সত্য মনে করে লাল খাঁ আহ্লাদে উৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌ল ও বহুসংখ্যক চেলৃদার দিয়ে সুন্দরীকে সেনহাটীতে পাঠিয়ে দেন। এদিকে মৃজানগর থেকে যাবার সময় সুন্দরী পিতাকে সংবাদ পাঠালেন—'শুধু সময়ক্ষেপ করবার জন্যে এই কৌশল অবলম্বন করেছি। ফৌজদার সাহেব বাড়ি এলেই তাঁকে সব জানিয়ে মুক্ত হবার চেষ্টা করবেন। যদি মুক্ত হন তবে অবিলম্বে বাড়ি চলে যাবেন। আর যদি না পারেন, তবে শিক্ষিত পারাবত ছেড়ে দেবেন। পারাবত দেখলেই আমিও আমার সম্মান রক্ষার জন্যে যথা-কর্তব্য করব।'

যথা সময়ে লোকজন সেনহাটীতে পেঁাছে দীঘি খনন করতে থাকে। ক্রমে বহুদিন অতিবাহিত হয়ে যায়। সুন্দরী পিতার কোন সংবাদ না পেয়ে উৎকণ্ঠিতা হয়ে পড়লেন। এদিকে দীঘির খননকার্য শেষ হওয়ায় তা উৎসর্গের আয়োজন করা হল। এই উপলক্ষে সুন্দরী যেমনি ঐ দীঘির জলে অবতরণ করলেন, এমন সময় পিতার শিক্ষিত পারাবতটি উড়ে এসে তাঁর কাঁধে বসল। পারাবত দেখে তাঁর প্রাণ উড়ে গেল—মুহূর্ত মধ্যেই তিনি আপন কর্তব্য স্থির করে নিলেন। নিজের মর্যাদা রক্ষার জন্যে সন্তরণচ্ছলে তিনি দীঘির গভীর জলে গিয়ে ডুব দিলেন—আর উঠলেন না!

এ-দিকে কিছুদিন আগেই ফৌজদার সাহেব দেশে ফিরে লাল খাঁর অত্যাচারের কথা শুনে তাকে দেশ থেকে বহিষ্কৃত করে রাজারামকে মুক্তি দিয়েছেন। কারামুক্ত রাজারাম জন্মভূমি সেনাহাটীতে ফিরে আসবার অভিপ্রায়ে যখন অশ্বারোহণ

করতে যাবেন—ঠিক তখনই তাঁর শিথিল বস্ত্র থেকে শিক্ষিত পারাবতটি উড়ে যায়। বিপদ বুঝে রাজারাম তখনই বেগে অশ্ব ছুটিয়ে দেন। কিন্তু যখন নিজ বাসভূমি দীঘিরপাড়ে তিনি এসে উপস্থিত হলেন, তখন দেখেন সব শেষ হয়ে গেছে। কন্যাস্নেহ-কাতর বৃদ্ধ রাজারাম আর মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে দীঘির জলে ঝাঁপ দিয়ে কন্যার অনুগমন করে সকল জ্বালা থেকে মুক্তিলাভ করলেন।

'সরকার ঝি' সুন্দরী বহুকাল এ মরধাম ত্যাগ করে গেছেন। তাঁর বাসভূমির চিহ্ন পর্যন্ত লোপ পেয়েছে। কিন্তু তাঁর খনিত দীঘি 'সরকার ঝি' আড়াইশ বছর ধরে গ্রাম্য বালক-বালিকা, পল্লীর যুবতী ও বয়োবৃদ্ধার হৃদয়ে তাঁর স্মৃতি জাগিয়ে রেখেছে—তাঁর দুরদৃষ্টের করুণ কাহিনী শুনতে শুনতে এতকাল ধরে তাদের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু হাল আমলে শতশত সেনহাটীবাসীকে ঘর হারিয়ে যে সবহারা হতে হল তাদের জন্যে আজো যারা সেনহাটীতে আছে তাদের কেউ এক ফোঁটা চোখের জলও কি ফেলছে ?

শ্রীপুর

বান এসেছে ইছামতীতে। জল নয়, প্রাণের বন্যা। উপনিবেশের সন্ধানে যশোর থেকে রওনা হয়েছিল একদল লোক রাজা প্রতাপাদিত্যের মৃত্যুর পর। সে দলের নেতা রাজা ভবানী দাস দেশ খুঁজতে খুঁজতে এসে থমকে দাঁড়ালেন এখানে ইছামতী আর যমুনার তীরে। এদিকে সাহেবখালির একটু দূরে রায়মংগল। বিস্তীর্ণ বনভূমি ছিল সেদিন। তাঁবু ফেললেন রাজা ভবানী দাস। প্রাণ-চঞ্চল হয়ে উঠল ইছামতীর তীরভূমি। মানুষের হাতে বন-জংগল সাফ হল। গড়ে উঠল সুন্দর এক গ্রাম। শ্রীহীন বনভূমি মানুষের উপনিবেশে রূপান্তরিত হয়ে নতুন নাম পেল শ্রীপুর। ধীরে মধ্য যুগের শাসন শেষ হয়ে এল শ্রীপুরে। এল ইংরেজ। বণিক-সভ্যতার আওতায় প্রকৃতির সন্তানেরা উঠল হাঁপিয়ে। গ্রামে এসে প্রবেশ করল রেলগাড়ি। কাঁচের বিনিময়ে নিয়ে গেল কাঞ্চন। শুধু শ্রীপুর নয় বাঙ্‌লাদেশের অনেক বর্ধিষ্ণু, উন্নত গ্রামই এমনি করে বণিক সভ্যতার শোষণে পর্যুদস্ত হয়ে গিয়েছে। তবু বাংলা দেশের মানুষ মরেনি। শ্রীপুরও মরেনি। কিন্তু আজ ষড়যন্ত্রের চাপে বাঙ্‌লা দেশের লক্ষ গ্রামের মত শ্রীপুর থেকেও শরণার্থীর বেশে মানুষের দল সীমান্ত অতিক্রম করে আবার আসছে নতুন উপনিবেশের আশায়। কোথায় মিলবে সে আশ্রয় কে জানে ?

খেয়াঘাট থেকে কালো মাটির পথটা গ্রামের মধ্যে পাকা রাস্তায় গিয়ে মিশেছে—দুপাশে সাজানো গাছের সারি, চরশ্রীপুর আর পাটনী পাড়ার মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে গোপখালি নদী। ছোট্ট কূলটা দূর থেকে দেখা যায়—আরও, আরও একটু দূরে ঐতিহাসিক মজুমদার বাড়ি চোখে পড়ে। এদের দাপটে নাকি একদিন বাঘে-গরুতে একই ঘাটে জল খেত। মজুমদার বাড়ির কোল বেয়ে এক সড়ক চলে গেছে দাদপুরের মধ্য দিয়ে সোজা। দুপাশে খেজুর গাছ আর ধান ক্ষেত। আর ঐতো, অদূরে পাতনার বিল—যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু বিলই চোখে পড়ে। সন্ধ্যের পর এই বিলের ওপর দিয়ে লোক চলাচল করে না। গা ছম্ ছম্ করে। রাত্রে কারা যেন ঘোড়া ছুটিয়ে বেড়ায়

খটা-খট্, খটা-খট্। বোসপুকুর আর মুচিপোতা লোকশূন্য। আজও মায়েরা ছেলেদের ভয় দেখিয়ে বলতেন: 'মুচিপোতার স্কন্ধকাটাকে ডাকব। চল্ চল্ বোস পুকুরধারে তোকে দিয়ে আসি।' ঝোপে-ঝাড়ে বনে-জংগলে ভরে গেছে এর সবদিক—সন্ধ্যের পর যে কোন অতি সাহসী ব্যক্তিরও বুকটা ধড়াস করে কেঁপে ওঠে।

সরকার পাড়ার পাশ কাটিয়ে লাল সড়কের পথ—এ প্রান্ত হতে ও প্রান্ত অবধি চলে গেছে। এ পথ চলে গেছে যেন কোন্ এক অজানা পথের ডাক দিয়ে। সরকারদের দাপট একদিন ছিল—চৌধুরীরাও বড় কম যেতেন না। মিউনিসিপ্যালিটি, ডাক-ঘর, উচ্চ ইংরাজী ও মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয়, মেটারনিটি হোম, বাঁধা থিয়েটার, ষ্টেজ কিছুরই অভাব নেই। কত ত্যাগ স্বীকারের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে এই আদর্শ গ্রাম, এই অপূর্ব গ্রাম।

সত্যি তো একটা গ্রামে এমনি শিক্ষার ব্যবস্থা, লাইব্রেরী, এমন বাঁধানো স্টেজ, চিকিৎসালয়, ক্রীড়া ব্যবস্থা কোথায় দেখতে পাওয়া যায়? আশা ও অনুরাগের স্বচ্ছন্দ গতি প্রবাহ নিয়ে এগিয়ে চলছিল এই জীবন। স্যার পি, সি, রায় এই গ্রামকে গভীর ভাবে ভালবাসতেন। মাঝে মাঝে এসে তিনি বাস করতেন এখানে। তিনি ভালবেসেছিলেন ইছামতীকে, ইছার জলকল্লোল তাঁকে ডাক দিত, আর এর শ্রী তাঁকে দিত হাতছানি—এ গ্রামেই পশ্চিম বাংগলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের জন্ম।

তবু চোখটা ঝাপসা হয়ে আসে কেন? দূরের রাঙাদির চরটা যেন ঝাপসা বলে মনে হয়। সাহেবখালি আর ইছামতী যমুনার সংগমস্থলে মাইল দীর্ঘ চর বন-জংগলে ছেয়ে আছে, কেউ কেউ বলে রাণীচর। গভীর রাত্রে কার যেন কান্না শোনা যায়।

অনেক পিছনে দৃষ্টি যায় ফিরে। প্রতাপের সঙ্গে যখন মোগলদের চলছিল লড়াই, জয়লাভের যখন কোন আশাই ছিল না তখন প্রতাপের নির্দেশে নাকি রড়া পুরনারীদের জাহাজে করে এনে এখানে ডুবিয়ে দেয়। তারপরই নাকি এই চরের জন্ম—তাই লোকে বলে রাণীচর। এ কাহিনীর সত্য-মিথ্যা নিয়ে কেউ তর্ক করে না।

কত, কতদিন এই চরে এসেছি, এর বনের মধ্যে পথ করে চলতে কত আনন্দ পেয়েছি। কত অজানা জীব-জন্তুর হাড় পেয়ে অবাক হয়ে বিচিত্র পৃথিবীর

কথা ভেবেছি। আরও, আরও কিছু পাওয়ার আশায় যেন অধীর আগ্রহে ছুটে চলেছি সামনের দিকে।

মেঘ জমেছে—কালবৈশাখীর প্রচণ্ড দাপট বুঝি সবকিছু ভেঙে চুরমার করে দিয়ে যাবে। ভয়ে নৌকো করে পালিয়ে এসেছি তরংগ-বিক্ষুব্ধ নদীর বুক বেয়ে। অজানা আনন্দে মনটা উঠেছে ভরে। ঝড় আসে তার অমিত শক্তি-বেগ নিয়ে। নদী গর্জে গর্জে ওঠে—আছড়ে পড়ে তীরের ওপর—তীরের মাটি ধ্বসে পড়ে নদীর বুকে—সর্বগ্রাসী ক্ষুধায় নৃত্য করে নদী। কত চালা যায় উড়ে, কত জীর্ণ প্রাচীর যায় ধ্বসে, কত বাগানে কত গাছের ডালপালা যায় ভেঙে, দুর্ভাবনার অন্ত থাকে না সাধারণের। ঝড়ের গতিবেগ ক্রমে থেমে আসে। নামে বৃষ্টি। বৎসরের প্রথম বর্ষা। পড়শীর ছেলেরা মনের আনন্দে খেলা করে সেই জলধারার সংগে। জোরে জোরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে : এই বৃষ্টি ধরে যা, নেবুর পাতা করমচা। জেলেরা জাল কাঁধে মাছ ধরতে বেরিয়ে পড়ে। গ্রীষ্মের দাপটে অস্থির চঞ্চল মানুষের চিত্ত শান্ত হয়। ছেলেরা আম কুড়োতে বেরোয়—আমিও তাদের দলে ভিড়ে গেছি কতদিন। গ্রীষ্মের উত্তাপদগ্ধ পৃথিবী শীতল হয়। তৃষিত মৃত্তিকা জল পায়। গাছের একটা ভাঙা ডালে বসে চাতক তখন ডাকে—'দে ফটিক জল'। কিষাণ লাঙল ঠিক করে। চাষের সময় হয়ে এসেছে। মেঘভরা আকাশ—সেদিকে চেয়ে তাদের চোখগুলো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সামনে যে বর্ষা!

মর্ণিং স্কুল। খুব ভোরে স্কুলে যাওয়ার আনন্দ। বোস-পুকুরকে পিছনে রেখে, ঘোষের বাড়ির পাশ দিয়ে সদর বিলের ওপর দিয়ে স্কুল যাওয়ার সে আনন্দ কোনদিন ভুলবার নয়। পথে যেতে যেতে আমরা বকুল ফুলের মালা গাঁথি, কোন কোন দিন যেতে দেরি হয়ে যায়। ছুটির পর মনে হয় : মাষ্টার মশাই যেন কি? একটু দেরি হলেই কি মারতে আছে! মালা গাঁথতে যে দেরি হয়ে গেল। সূর্য তখন তালগাছের মাথার ওপর। পাগলা তালের রস পাড়ছে! মাথাভাঙা খেজুর গাছটায় বসে একটা দাঁড়কাক ডাকছে। কি যেন আনন্দ, কি যেন অনুভূতি, হঠাৎ ছুটে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরি। মা মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। আস্তে আস্তে বলেন : গ্রীষ্মের ছুটি কদিন দিলরে? একমাস বুঝি। হ্যাঁ এক মাস। কি আনন্দ! কাঁঠাল, আম, জাম, জামরুলের সময়। যাদের গাছ আছে তারা অনেক খাবে। আমাদের তো কোন গাছ নেই। শিশু মন

বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। দূর—বোসেদের বাগানের আম রাখব নাকি? সব টিলিয়ে পেড়ে নেব। তাড়া করলে দে ছুট্। একে তো আর চুরি বলে না।

বর্ষা আসে তার কেশপাশ এলিয়ে দুলিয়ে। মেঘভার আকাশ, মাঝে মাঝে মেঘের ডাক—শিশু মনে ভীতির সঞ্চার করে। মেঘ-মেদুর আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে কি আনন্দ না জাগে! অঢেল বর্ষা। 'এ বর্ষা বুঝি থামে না।' মাঠঘাট ডুবে যায়, জলা-ডাঙা সব এক হয়ে যায়। ছেলেরা মাছ ধরতে যায়। জলে উজান নিয়ে মাছ উঠছে। মাছধরার আনন্দে মেতে ওঠে সবাই। বর্ষাঘন সন্ধ্যা। ঝিল্লীর ডাকমুখর সন্ধ্যা। বাগানের কোন কোণে একটা বিরহী পাখি যেন ডাকছে—বউ কথা কও। রাত্রি বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে মেঘ ফিকে হয়ে আসে—ক্রমে আকাশ পরিষ্কার হয়। চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে চারিদিক। নীল নিবিড় আকাশে জ্যোৎস্নার অনন্ত উচ্ছ্বাস। সেদিক তাকিয়ে কত কি ভাবি। আকাশের সঙ্গে মানুষের মনের গভীর সম্পর্ক। নাড়ীর সম্পর্কের চাইতেও যেন গভীর। এই সম্পর্ক অনন্ত জীবনের সঙ্গে জীবনের। নদ-নদী, গাছ-পালা সবই যেন ধরা দেয়। কবে কোন্ অতীতে যুগ-মধ্যাহ্নে কোন্ তাপস কোন্ বৃক্ষের তলায় তপস্যা করে হয়েছিলেন ঋষি জানি না। আবার কত মানুষ শুধু পথ চলেছে—পথ, পথ আর পথ, তাদের পথ চলার সঞ্চয় রেখে গেছে ভাবীকালের জন্যে। কত ঘুমভাঙা রাত্রি তারা জেগে কাটিয়ে দিয়েছে। মনে হয় তেমন রাত্রি যেন বারবার আসে, আসুক মহা-জীবনের আহ্বান জানিয়ে—আসুক স্বপ্নের বেসাতি নিয়ে। আসুক রঙীন ফানুষ হয়ে, তবু আসুক।

চাষীরা চাষ করে। জেলেরা জাল ফেলে। পাটনীরা খেয়া পারাপার করে, কুমোররা তৈরী করে হাঁড়ি-কলসী। মধুসূদনের বাজার বসে, সবাই একহাটে এসে কেনা-বেচা করে। মাঝে মাঝে গ্রামপ্রান্তে মেলা বসে। মেলায় গিয়ে কতদিন নাগোরদোলায় চড়েছি। পুতুল খেলা দেখেছি। সীতার দুঃখ দেখে চোখের জল ফেলেছি। লক্ষ্মণ-ইন্দ্রজিতের যুদ্ধ দেখে অবাক বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছি। মেলায় যাত্রাগান হয়। দেশ-দেশান্তর থেকে যাত্রাদল আসে। অভিমন্যুর বীরত্ব দেখে হাততালি দিয়েছি। মনে মনে ভাবি, আমি যদি অভিমন্যু হতাম। দলু দত্তর গান শুনেছি—'এম-এ, বি-এ পাশ করে সব মরছে কলমপিযে; বলি, বাঙ্গালী বাঁচবে আর কিসে?' মনের আনন্দে বাড়ি ফিরে আসি। কত আনন্দ ছিল সেদিন!

খেলার ধুম পড়ত। কেদার-মাঠে ফুটবল খেলার শেষে সবাই ইছামতীর ধারে বেলতলাঘাটে গিয়ে বসি। জ্ঞানদার দোকানে ভিড় করি। চায়ের দোকানটা ভালই চলে। গান চলে, গল্প চলে। পশ্চিমাকাশে সন্ধ্যা-তারাটা কেবলি জ্বলে। ওপারের আলো চোখে ভাসতে থাকে। ট্রেণ ছাড়ার বাঁশী বাজে।

পূজার কটা দিন চলে যায়। বিজয়ার দিন কিসের বিয়োগ ব্যথায় যেন সকলের চোখে জল নেমে আসে। নদীর বুকে ভাসে হাজার হাজার নৌকো। বাইচ খেলা হয়; বাজী ফোটে। কত আনন্দ অথচ কত দুঃখে মানুষের মন ভারী হয়ে ওঠে। বিজয়ার শেষে সবাই আসে—সবাই আলিংগন করে সবাইকে। রাত্রিতে বাড়ির ছাদে এসে দাঁড়াই। বিপ্লবী দাদাদের কথা মনে পড়ে। আজ তারা কোথায়? যিনি আমাকে বিপ্লব-মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলেন সেই শচীন সরকারই বা কোথায়? জ্যোৎস্নাস্নাত গ্রাম, বেশ লাগে এই গ্রামকে।

শীতকালের কথা বেশ মনে পড়ে।

গ্রামবাসীদের শীতের পোশাক বড় জোটে না। তাই ভোরবেলা তারা গাছের পাতা, বিশেষ বরে নোনাপাতা জোগাড় করে আনে, তাই দিয়ে আগুন করে। তারা আগুনের চারপাশে এসে ভিড় করে বসে। আগুন পোহায়।

এই গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হবে। আমার পূর্বপুরুষ যারা এই উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল আজ তাকে ছেড়ে যেতে হবে আবার নতুনের সন্ধানে। আবার যে নতুন উপনিবেশ গড়ে উঠবে তাকে এমনি আপনার করে আর পাব কি? শ্রীপুর ছেড়ে আসার আগে এ কথাটাই বার বার মনে হয়েছিল।

ডাকাতিয়া

বাঙ্‌লার গ্রাম আজ কথা বলছে; নিজের কথা, লক্ষ লক্ষ সন্তানের কথা। শুনে মনে জাগছে আমারও জননী-জন্মভূমি 'ছেড়ে আসা গ্রামে'র হৃদয়-নিঙ্‌ড়ানো স্মৃতি। বাঙ্‌লাদেশের লক্ষ গ্রামের মধ্যে একটি গ্রাম। যেখানেই থাকি, যত দূরেই থাকি সে গ্রামকে ভুলতে পারি না। সে গ্রামের সঙ্গে আমার রক্তের সম্পর্ক, আমার নাড়ীর টান। বহু দূরে পশ্চিমবাঙ্‌লার উপান্তে এই মফঃস্বল শহরে বসে আকাশ আর মাটির নীরব ভাষা আবিষ্কার করতে চেষ্টা করি। এখানেও গ্রামের মানুষকে আপন করে নিয়েছি। এরাও আমাকে আর শরণার্থী ভাবে না। আমি যেন এদেরই একজন। তবু কোন এক বৃষ্টি-ঝরা অলস অপরাহ্নে পশ্চিমবাঙ্‌লার রৌদ্র-রুক্ষ এই অবারিত প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে মন চলে যায় বহু দূরে, সেই সুদূর পূব বাঙলায় স্নিগ্ধ ছায়া-নিবিড় আমার জন্মভূমি ছেড়ে আসা গ্রামের সেই নদী মাটি আর আকাশের আঙিনায়। মন বলে: যাই, আবার যাই।

ভাবি, আর কি ফিরে যেতে পারব না আমার ছেড়ে আসা মায়ের কোলে? মা—আমার মাটির মা—সত্যিই কি পর হয়ে গেল আজ? মন মানতে চায় না। অব্যক্ত ব্যথায় ভাবাতুর হয়ে ওঠে। সহস্র স্মৃতি-সৌরভে জড়ানো মায়ের স্নিগ্ধ-শ্যাম-আঁচলের পরশ কি আর এ জীবনে পাব না? ললাটে তাঁর সব-ব্যথা-ভোলানো স্নেহ-চুম্বন আর কি সম্ভব নয়?

ওপার থেকে এপারে পাড়ি জমাতে হল—এ কার অমোঘ বিধান? ঘরছাড়া মানুষ কি আর ফিরবে না ঘরে—তার পূর্বপুরুষের ভিটেমাটিতে? শরণার্থীর বেশে মানুষ আসছে দলে দলে—দেহ ক্লান্ত—মন বিষণ্ণ—দুচোখে অশ্রুর প্লাবন। জলো হাওয়ার দেশের ভিজে মাটির সবুজ তৃণলতা এরা; শেকড় উপড়ে কঠিন মাটির দেশে এদের বাঁচাবার যে চেষ্টা চলছে তা কি সফল হবে? প্রাণরসের অভাবে শুকিয়ে যাবে না কি ভাবীযুগের সোনার ফসল?

দিগন্ত-ছোঁয়া বিলের একপাশে ছোট সেই চাষীপ্রধান গ্রাম। বিলভরা অথৈ জল। সবুজের সমুদ্র—ধানগাছের ওপর বাতাস দিয়ে যায় ঢেউ-এর দোলন।

মাঝে মাঝে শাপলা কচুরিপানার ফুল; নল-হোগ্‌লা-চেঁচোবন। বিলের ওপরে ওড়ে বক, পানকৌড়ি, গাঙশালিক, ক্ষণে ক্ষণে লাফিয়ে চলে গংগা ফড়িং।

আশ্বিন-কার্তিকে সোনার রঙ লাগে মাঠে মাঠে—লক্ষ্মীর অংগের আভা ওঠে ফুটে। অঘ্রাণে-পৌষে দেবীকে বরণ করে চাষীরা তোলে ঘরে। তাঁর দেহের সৌরভে বাতাস মধুময় হয়ে ওঠে। পথে ঘাটে-মাঠে ঘরের আঙিনায় নতুন ধানের প্রাণ-মাতানো সুবাস। ঘরে ঘরে আঁকা হল আলপনা, চলল উৎসব—নবান্ন, পৌষ-পার্বণ—নারিকেল-নলেন গুড়ের গন্ধে ভুরভুর চতুর্দিকে। চাষীর ঘরে দারিদ্র্য আছে, কিন্তু অলক্ষ্মী নেই। দীঘল-ঘোমটাটানা ছোট্ট ছোট্ট বধূরাও জানে বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীকে মাটির ঘরে বেঁধে রাখবার মন্ত্র। তাদের ডাগর ডাগর কালো চোখের সরল চাউনি—আজও যেন চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

নৌকা-ডোঙা নিয়ে বিলের বুকে আনাগেনো করে ছেলে থেকে বুড়ো সবাই। ধরে মাছ, ধরে পাখি, কাজকর্মের অবসরে। মাছ নইলে ওদেরও মুখে অন্ন রোচে না। এপাশে ফুলতলা আর ওপারে দৌলতপুর স্টেশন। রেলগাড়ির যাওয়া-আসা দেখে চাষীরা সময়ের ঠিক করে নেয়। ওরা বলে ৫টার গাড়ি, ৮টার গাড়ি, ১২টার গাড়ি। অসময়ে যায় মালগাড়ি। রেলগাড়ি চলে দেশ হতে দেশান্তরে, চাষীরা মাঠ থেকে, চাষী বৌরা ঘাট থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে যন্ত্রদানব ধুম উদ্গীরণ করতে করতে চলে গেল। কোথায় কোন দেশে গেল কে জানে?

রেল লাইন পার হয়ে ইউনিয়ন বোর্ডের কাঁচা সড়ক মুসলমান পাড়ার মধ্য দিয়ে চলে গেছে। জোলা পাড়ার তাঁতগুলো চলচে ঠক্—ঠক্—ঠক্। দুপাশ থেকে বাঁশঝাড় নুয়ে পড়ে প্রায় সারা পথটাই ঢেকে রেখেছে। বাঁশপাতা পচা একটা সোঁদা গন্ধ নাকে আসে।

'বাবু, দ্যাশে আল্যেন নাহি?'—মুসলমান চাষী সহজ সৌজন্যে কুশল প্রশ্ন করে। সৈয়দ মুন্সীর বাড়ির কাছে এলে ওষুধের তীব্র কটু গন্ধ নাকে আসে। উনি কবিরাজীও করেন আবার মাষ্টারীও করেন। এঁর কাছেই আমার জীবনের প্রথম পাঠ গ্রহণ। সদা হাসিমাখা মুখ—শুদ্ধ বাংলায় কথা বলেন। মাষ্টারী ও কবিরাজী ওঁর উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। ওঁর বাবা ছিলেন রহিম মুন্সী তখনকার দিনের জি. টি. পাশ। দীর্ঘদেহ রাশভারীগোছের লোক ছিলেন। আমাদের গ্রামে ছোট ছেলেপুলের কিছু হলেই এঁদের ডাক পড়ত। ভিজিটের কোনও দাবী ছিল না—দেওয়ার কথা কারুর মনেও হত না। তবে বাড়ির

ফলটা তরকারিটা দেওয়া হত প্রায়ই। আজও যেন তাঁদের আত্মার আত্মীয় বলে মনে হয়। হিন্দু-মুসলমান এতদিন আমরা পাশাপাশি বাস করেছি ভাই-ভাই-এর মতন—চিরকাল সকলের সঙ্গে একটা আত্মীয়তার যোগ অনুভব করেছি। হিন্দু মুসলমান পাশাপাশি জমি চাষ করেছি; এ আলের ওপর একদল খেয়েছে পান্তা—আর একদল করেছে নাশ্‌তা। কল্কে চাওয়াচাওয়ি করে তামাক খেয়েছে। কুস্তি, মেলা, আড়ং-এ সবাই সমানভাবে অংশ গ্রহণ করত—আবার কবিগান, জারিগান, গাজীরগান, রামায়ণগান—সব কিছুরই রস উপভোগ করত রাত জেগে পাশাপাশি বসে। আর আজ?

মুসলমানপাড়া ছাড়ালেই আম কাঁঠাল তাল খেজুরের ভিটে পড়ে আছে। কোথা থেকে ঘুঘুর একটানা উদাস ডাক কানে ভেসে আসে। কোকিল ডাকে। কখনও বা শোনা যায়, 'চোখ গেল, চোখ গেল'। মন উধাও হয়ে যায় যেন কোন্ স্বপ্নরাজ্যে। সরষে ফুলে, তিল ফুলে মাঠ গিয়েছে ছেয়ে। ফিঙে লাফায় ফুলেভরা বাবলা গাছে। বনফুলের গন্ধে উতল মেঠো হাওয়া দেহে বুলায় মায়ের হাতের পরশ। দূর থেকে দেখা যায় ঠাকুরণতলা। বিশাল এক বটগাছ—অসংখ্য ঝুরি নেমেছে বিরাট বিরাট ডালপালা থেকে। সর্বজনীন দেবস্থান। গ্রামের সাধারণ ক্রিয়াকর্ম যা কিছু এখানেই হয়ে থাকে। গাজন, কালীপূজা আরো কত কি! এই ঠাকুরণতলার এক পাশে ছিল আমাদের সৈয়দ মুন্সীর পাঠশালা। বটগাছের শীর্ষদেশে বংশানুক্রমিক সন্তান-সন্ততি নিয়ে কয়েকটা চিল বাস করত —অন্যান্য ডালপালায় কোটরে থাকত আর সব নানা জাতের পাখি। শেষরাতে চিলের ডাকে পল্লীবধূরা রাতের শেষপ্রহর জানতে পেরে শয্যাত্যাগ করত। তারপর ছড়া, ঝাট, প্রাতঃস্নান প্রভৃতি থেকে দিনের কাজ হত শুরু। আর পুরুষেরা লাঙল-গরু নিয়ে ছুটত মাঠে।

ছোট্ট গ্রাম ডাকাতিয়া। তাই বলে ডাকাত বাস করে না এখানে—কিংবা নেই তাদের কোন অনুচর। দিগন্তপ্রসারী ডাকাতিয়ার বিল। সচরাচর এতবড় বিল দেখা যায় না। তার পাশের ছোট্ট এই গ্রামটি তারই নাম পেয়েছে। ডাকাতিয়ার বিলের হয়ত কোনও ঐতিহাসিকতা আছে—কিন্তু আজকের দিনে সে কথা কেউ জানে না। তবে খালপারের মাঠে লাঙল দিতে দিতে চাষীরা নাকি অনেক সময় কোম্পানীর আমলের পয়সা পেয়ে যায়। খালপারের ভিটের কাছেই একটা মজা পুকুর আছে—পূর্বে নাকি এখানেই ছিল মস্ত বড় এক দীঘি। পুকুরের পাড়ে

একটি বুড়ো আম গাছ আজও আছে। কয়েক পুরুষ আগে নাকি কখনও কখনও চাষীরা দেখতে পেত—দীঘির মধ্যে ছোট্ট একটা রূপোর নৌকো ভেসে উঠত —আর নৌকোটি ঐ আমগাছের গুড়ির সঙ্গে শিকল দিয়ে বাঁধা। ঐ নৌকোয় মোহরভরা সোনার কলসীও নাকি ঝিক্‌মিক করে উঠত। কিছুক্ষণ ভেসে থেকে আবার ইচ্ছামত সে নৌকো তলিয়ে যেত দীঘির অতল কালো জলে।

বিলের ওপারে দিনের শেষে সূর্য ডোবে সোনার একখানা বড় থালার মত কাঁপতে কাঁপতে। সেই সূর্যের লালরশ্মি ছড়িয়ে পড়ে দিগ্‌দিগন্তে। ছোটবেলায় বসে বসে দেখতাম—কত যে ভাল লাগত! সূর্যাস্তের পর যখন গোধুলি ম্লানিমা কাঁপতে থাকত—স্বপ্নবিহার থেকে মন নেমে আসত মাটিতে। বাঁশঝাড়ে—তেঁতুল কিংবা আমগাছে বিলে-চরা বকের ঝাঁক সাদা ডানা মেলে এসে কোলাহল করত —অসংখ্য শালিকরা কিচিরমিচির ডাকে কীর্তন জমিয়ে তুলত। গ্রামের মেয়েরা সাঁঝের পিদিম নিয়ে আলো দেখাত তুলসীতলায়, ধানের গোলায়, ঠাকুরঘরে। অন্ধকার নিবিড় হয়ে আসত। ঝোপেঝাপে, লতাকুঞ্জে জোনাকির ফুলঝুরি ফুটত। কোন কোন দিন বাঁশ বাগানের মাথার ওপর যেন পথিক চাঁদ পথভুলে এসে তাকিয়ে থাকত।

সন্ধ্যাকালে সংকীর্তনের সুর ভেসে আসত কানে। গাঁয়ে এক সাধুর আড্ডা ছিল—সেখানে বাউল-কীর্তন বেশ জমে উঠত গোপীযন্ত্রের সঙ্গে। ঠাকরুণতলার স্কুলঘরে চলত গ্রামের যাত্রাদলের মহড়া। চাষী যুবকদের অশুদ্ধ উচ্চারণে বীররস প্রকাশ, স্ত্রীভুমিকায় পুরুষকণ্ঠের বিকৃত চিৎকার আজও স্পষ্ট যেন শুনতে পাই।

মেঠো পথে অন্ধকারে পথ চলছে হাটুরে লোক—হাট থেকে ফিরছে হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি ঘরকন্নার কথা বলতে বলতে। অন্যান্য বেসাতির সঙ্গে ছেলেমেয়ের জন্যে হয়ত নিয়ে চলেছে এক পয়সার বাতাসা—ওরা বলে 'ফেনী'; বৌ-এর জন্য কাঁচের চুড়ি আর নিজেদের জন্য তামাক—যা না হলে ওদের একদণ্ড চলে না। তা ছাড়া পরস্পরের আলাপের যোগসূত্র হল এই তামাক।

ছায়াছবির মত কত স্মৃতির ছবি ভিড় করে আসে মনের পর্দায়। তাল খেজুর নারিকেল সুপারি আম কাঁঠালের দেশ, জলকাদায় স্নিগ্ধ যার কোল, জলো হাওয়ায় আন্দোলিত যার সবুজ আঁচল, মেঘেরৌদ্রে হাসিকান্নায় মুখর যার গৃহাংগন—সেই জন্মভূমি পল্লীমায়ের মুখখানি আজ বারবার মনে পড়ছে। ঋতু-বিবর্তনের বিচিত্রতা, পল্লীর সবুজ চোখ-জুড়ানো স্নিগ্ধতা, আকাশের প্রসারতা,

দিগ্‌বলয়ঘেষা বিলের রহস্যময়তা আজও আমাকে নীরবে হাতছানি দিয়ে ডাকে। সোনার বাঙ্‌লার লক্ষ গ্রামের সেই এক গ্রাম—তাকে আজ আমি কেমন করে ভুলি ? শিশু কি কখনও মায়ের কোল ভুলতে পারে? মহাকালের নির্মম পরিহাসে যাকে ছেড়ে চলে আসতে হল দূর-প্রবাসে অশ্রুজল সম্বল করে ; ওপারের মানুষ এপারে এলাম শরণার্থীর বেশে। সেই বিলের জলের মত ছল ছল করা আমার জননী জন্মভূমির চোখের জল প্রাণের গহনে যে কাঁদন জাগায়—কেউ কি তা বুঝবে ? আমাদের সেই ঠাকরুণতলায় কালী পূজোর জন্যে সংগৃহীত ছাগশিশুদের মত রাজনৈতিক যুপকাষ্ঠে আজ লক্ষ লক্ষ মানব শিশু বলি হতে চলেছে। কিন্তু সত্যি কি তাই হবে ? ঘরের ছেলেরা কি আর ঘরে ফিরবে না ? কে বলবে—কাকে শুধাই—ওগো সেদিন আর কতদূরে ?

॥ রাজসাহী ॥

হাজারা নাটোর

বর্ষণ নেমেছে চলনবিলের বুকে। জলে টই টুম্বুর। যতদূর চোখ যায় জলে জলময়। শালুক ফুলে বিল যায় ভরে। সকালের কাঁচা রোদ সস্নেহ চুম্বন দিয়ে যায় উত্তর বাঙলার এই গ্রাম হাজরা নাটোরের ধূলিকণায়। রাঙ্গা মাটির দেশ এই বরেন্দ্রভূমি। প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানীর দেশ এই নাটোর। আজকের দিনে শিল্পীমন এই নাটোরেই হয়ত বনলতা সেনকে খুঁজে পেয়েছেন। সব কিছু মিলিয়ে এ গ্রাম আমার স্মৃতির সবটুকু জড়িয়ে আছে। আজকে দেখছি ছেড়ে আসা গ্রামের কাহিনীর মধ্য দিয়ে হাজার বছরের বাঙলার গ্রাম কথা কয়ে উঠেছে। জেগে উঠেছে দীর্ঘ দিনের সুষুপ্তি থেকে। সে কাহিনী শুনে মন ভরে যায়। বাঙলার মূক মাটি এমনি করে মুখর হয়ে উঠেনি কোনদিন। হাঁসুলী বাঁকের উপকথার মতই পদ্মা মেঘনা আর চলনবিলের তীরের বাসিন্দারা নতুন ইতিবৃত্ত বলতে শুরু করেছে। সে কাহিনীর অনন্ত মিছিলে আমার গ্রাম নাটোরও একান্তে মিশে যাক।

শৈশবের কথা মনে পড়ে। নাটোরের আকাশে শীত ঘনিয়ে আসে। কাকলি-মুখর শীতের ভোর বেলাটায় উঠি উঠি করেও মা'র কোল ছেড়ে কিছুতেই উঠতে ইচ্ছে করত না। বাগানের শিউলিতলায় একরাশ শাদা ফুলের গন্ধটা কেমন করে জানি টের পেতুম। সেই ভোরে হরিদাসী বোষ্টমি করতাল বাজিয়ে প্রত্যেক বাড়ির দুয়ারে দুয়ারে হরিনাম কীর্তন করে সকলকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলত। হরিদাসী বোষ্টমির সুরেলা কণ্ঠের সে গান আজো ভুলতে পারি না—

আর নিশি নাই ওঠরে কানাই,
গোঠে যেতে হবে—দ্বারে দাঁড়ায়ে বলাই।

সে গানের শব্দ অনেক দূর থেকে ভেসে আসত। আর বিছানায় থাকা সম্ভব হত না। কাঠ বাদাম আর ফুল কুড়োবার লোভে খুব শীতের মধ্যেও উঠে পড়তাম। বাড়ির পাশেই জমিদারদের বাগানবাড়ি। সে বাগানে সব

রকম ফলের গাছই ছিল। উদ্যান-বিলাসী জমিদার বাবুরা বংশানুক্রমে এ বাগানে নানারকম নিত্য নতুন ফলের গাছ পুঁতেছিলেন। আমাদের কৈশোরের দৌরাত্ম্যময় রোমাঞ্চকর দিনগুলো অতিবাহিত হত সে বাগানের গাছে গাছে। সেজন্যে যে কতদিন বাগানের মালীর হাতে তাড়া খেয়েছি তার ইয়ত্তা নেই। গ্রীষ্মের দুপুরে চারধার যখন নিঃসাড় নিঝুম হয়ে যেত, মধ্যাহ্নিক অলসতায় দ্বাররক্ষী তন্দ্রারত, সেই অবসরে পাঁচিল টপকে গাছে গিয়ে উঠতাম। এমনি করে প্রতিদিন গাছগুলোকে তছনছ করে চলে আসতাম আমরা। আরেকটি বিশেষ আনন্দের দিন ছিল শ্রীপঞ্চমীর পুজোর দিনটি। শীতের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই মন ওই দিনটির জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকত। সরস্বতী পুজো এলেই গ্রামের তরুণদের মন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠত। পুজোর আগের দিন সারারাত খেটে পুজোর আটচালা মণ্ডপ তৈরী করতাম, গেট সাজাতাম। সব কাজের শেষে মধ্যরাত্রির অন্ধকারে চুপি চুপি খেজুরের ভাঁড় নামিয়ে রস চুরি করার মধ্যে যে রোমাঞ্চ ছিল তা আজও ভুলতে পারি নি। মিলাদ শরিফ উপলক্ষে স্কুলে মুসলমান ছেলেদের উৎসবেও সকলে মিলে যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ করতাম। মুসলমান ছাত্ররা আমাদের মিষ্টি খাইযে আপ্যায়িত করত। আমরাও নিঃসংকোচে তা গ্রহণ করেছি, সবাই মিলে আনন্দ করেছি।

বৈশাখের ঝড়ে সে এক রুদ্রমূর্তি চোখে পড়ত। শ্রাবণের বর্ষণে দিগন্তের কোণে কালো মেঘ নিরুদ্দেশ হয়ে যেত চলন বিলের ওপারে। আমাদের বাড়ির ঘরের টিনের চালে বিষ্টির আওয়াজ এক অদ্ভুত ঐক্যতানের সৃষ্টি করত। ধান লাগানোর জন্যে কৃষকের মন তখন চঞ্চল হয়ে উঠত। সময় সময় আমিও বাবার সঙ্গে ধান লাগানো দেখতে যেতাম। কাদার মধ্যে উপুড় হয়ে এক সঙ্গে কৃষকদের ধান লাগানোর দৃশ্য অবর্ণনীয়। হেমন্তে যখন ধান উঠত কৃষকদের গোলায় তখন ভোরের দিকে পাশের পাড়া থেকে কৃষক-বৌদের ধান ভানার আওয়াজ শুনতে পেতাম। সেই ঢেঁকির আওয়াজে কেমন জানি একটা গ্রামীণ আত্মীয়তার স্পর্শ লাগত মনে। মেয়েরা ধান ভানছে, কেউ বা ধান ঢেলে দিচ্ছে গর্তে। আর নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে নানা রকম ঘর-গেরস্তির কথা। চমৎকার ঘরোয়া সেই রূপটি আজ কোথায় যেন হারিয়ে ফেলেছি। কখনো কখনো ধান ভানতে ভানতে মেয়েরা সুর করে গান ধরেছে। সে গানের কলি আজ মনে নেই, কিন্তু সুরটা আজও বাজছে হৃদয়ের মাঝখানে।

বিকেলের দিকে আমরা কয়েকজন প্রায়ই কুঞ্জবাড়ির দিকে বেড়াতে যেতাম। নির্জন, নিস্তরঙ্গ সন্ধ্যা। রথের মেলা বসত এইখানটায়। দু'ধারে বন্য জামগাছের সারি। সামনে বিল। সূর্যাস্তের ছায়া পড়ে বিলের জল কেমন জানি অতীত-মুখর হয়ে উঠত। বহু দূর অতীতের কথা, রাণীভবানীর আমলের কথা, বাঙলার বিগতশ্রীর অবিস্মরণীয় দিনের কথা। কুঞ্জবাড়ির পথের বাঁ দিকে একটা বটগাছের তলায় মুসলমানদের একটি পীঠস্থান আছে। গ্রামের হিন্দু-মুসলমানদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে বৎসরে তিন দিন সেখানে গানের পালা হত। বিরাট চাঁদোয়া খাটানো হত উপরে। সত্যপীরের গান, কৃষ্ণলীলার গান, দেহতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, মুক্তিতত্ত্ব সমস্ত কিছুই সেখানে গান গেয়ে আলোচনা করা হত। হিন্দু-মুস্লিম সমস্ত গ্রামবাসী স্তব্ধ কৌতূহলী হয়ে সে গান শুনত। গানের পালার মাঝে মাঝে ঢাক ঢোল বেজে উঠত। পরচুলা ঝাঁকানি দিয়ে ঘন ঘন নৃত্য হত। অনেক হিন্দুও সেই দরগায় সিন্নি দিত, কেউ রুগ্ন ছেলের রোগমুক্তির জন্যে, কেউ হয়ত স্বামীর সুস্থতার জন্যে।

হাজরা-নাটোর গ্রামের পাশ দিয়ে চলে গেছে জেলা বোর্ডের রাস্তা। দু'পাশে ঝাউগাছের সারি। তরুণদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তোলবার জন্যে গ্রামে আমরা একটা পাঠাগার স্থাপন করেছিলাম। পাঠাগারের ভেতর দিয়ে গ্রামের তরুণদের রাজনীতিমূলক শিক্ষা দেওয়া হত। ভেবেছিলাম, আমরা সমস্ত তরুণরা মিলে সংঘবদ্ধ হয়ে গ্রামের সেবা করব, সে আশা আজ ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। এমনি ধূলিসাৎ-হওয়া স্বপ্ন নিয়ে কোলকাতার রাজপথে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল গ্রামের এক প্রতিবেশীর সঙ্গে। 'হঠাৎ আপনি এখানে ?'—বহুদিন পর দেখা হওয়ায় বিস্ময়ের প্রশ্ন করি। 'এই এলুম একটু এদিকে, দেখি যদি কিছু সুবিধে হয়।'—নিস্তেজ হতাশ উত্তর। কৃপাপ্রার্থীর ভাব তার কথায় আর হাবভাবে। দেশসেবার পুরস্কারস্বরূপ বহুকাল কারাজীবন অতিবাহিত করেছেন তিনি। কোনদিন ভেঙে পড়েন নি। আজ যেন সত্যিই তিনি ভেঙে পড়েছেন। একদিন এঁকে দেখেছি বিপুল প্রাণশক্তির প্রতীকরূপে। আজ কোলকাতার জনারণ্যে তাঁর মধ্যে কোন বিশেষত্ব খুঁজে পেলাম না। মিছিলের মধ্যে তিনিও মিশে গেছেন শরণার্থী হয়ে।

এমনি শতশত শরণার্থীর মর্মছোঁয়া করুণ কাহিনীর পশ্চাতে রয়েছে বাঙলার এক একটি গ্রাম। দিগন্তপ্রসারী তার বিস্তৃতি, অতল স্নিগ্ধ তার স্নেহ। তেমনি একটি গ্রাম আমার জন্মভূমি হাজরা-নাটোর।

তালন্দ

উত্তরবঙ্গের রাজসাহী জেলার ছোট্ট একটুকরো গ্রাম। তালন্দ তার নাম। পাশেই একদিকে ছড়ানো রয়েছে উত্তর বাঙলার দীর্ঘ-প্রসারিত বিল। অন্যদিকে ছোট একটি জলরেখার মত শীর্ণকায়া শিব নদী। নদীটি ছোট, কিন্তু উত্তর বাঙলার ঐতিহ্যে নদীটি বিশিষ্ট। অনেক ইতিহাস-মুখর দিনের নীরব সাক্ষ্য বহন করছে এই নদী। আজ সে বিগতযৌবনা। বর্ষাকালে বিলের সঙ্গে মিশে নিজের অস্তিত্বটুকুও হারিয়ে ফেলে। পশ্চিম দিকে সজাগ প্রহরীর মত ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চওড়া রাস্তাটা আরও উত্তরে বিলটিকে লাফিয়ে পার হয়ে দূরান্তের গ্রামের সঙ্গে মিশে গেছে।

গ্রামটি ছোট। কিন্তু সুখ-সুবিধা অপ্রচুর নয়। রাজনৈতিক দ্যূত ক্রীড়ায় উলুখড়দের জীবনাবসান হয়েছে। কিন্তু তবুও ভুলতে পারি না 'ছেড়ে আসা গ্রামে'র রাঙামাটির স্পর্শ। নূন-তেল, রেশনকার্ড আর চাকরীর বাইরে যখন মনের অবসর রেণু রেণু হয়ে উড়ে যায়, স্মৃতির টুকরো তখন ঘা দেয় অবচেতন মনের দরজায়।

প্রাণ-চঞ্চল গ্রাম্য-আবহাওয়া প্রতি ঋতুর সঙ্গেই পরিবর্তিত হয়ে যায়। গ্রীষ্মকালে কালবৈশাখীর ঝড়ের সঙ্গে যখন আম কুড়োবার ধুম পড়ে, যখন আম-জাম-কাঁঠাল-এর রসাল চেহারা লুব্ধ করে আমাদের, তখন গ্রামের বুকে দেখা দেয় 'মাসনা' খেলা। ঢাকের বাজনার সঙ্গে বিভিন্ন ঢঙের মুখোশ পরে নাচতে থাকে স্থানীয় খেলোয়াড়গণ এবং অনেক সময় চেতনা হারিয়ে ফেলে দর্শকদের রুদ্ধ-বাক্ চেহারার সামনে। গ্রীষ্মের শেষে আম-কাঁঠালের বিদায়কালে আকাশের চক্ষু যেন সজল হয়ে আসে,—দেখা দেয় 'শ্যামাঙ্গী বর্ষাসুন্দরী'। বিলের দেহে আস্তে আস্তে জল জমতে থাকে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ছোট্ট এক একটা হাত-ছিপ নিয়ে জল ঘুলিয়ে মাছ ধরে। দেখতে দেখতে তাদের ছোট ছোট 'খলই' কই, সিঙ্গি, ট্যাংরা, পাবদা মাছে ভরে ওঠে। বিলের বুকে তখন দেখা যায় নৌকোর কালোরেখা। দু'দিক থেকে নৌকোগুলো পরস্পরের কাছে এগিয়ে এসে পরমুহূর্তেই ছিটকে বেড়িয়ে যায় বিপরীত দিকে। সেই সময় প্রশ্নোত্তর চলে—'লাও কোতদুর কারা ?' 'তানোরের' ইত্যাদি। এরই সম-

সাময়িক আর এক অনুষ্ঠান শীতলা পুজো। ভক্তের ভক্তিনম্র ডাক পাষাণ-প্রতিমার প্রাণে সারা জাগায় কিনা জানি না, তবে এমনি করেই কেটে যায় বর্ষার দুঃস্থ পরিবেশ। মাটির বুকে জেগে ওঠে গুচ্ছ গুচ্ছ কাশ ফুল। হাত ছানি দিয়ে তারা যেন ডাকে শরতের মেঘদলকে। টুকরো টুকরো মেঘও তাই মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়িয়ে কাশ ফুলের শুভ্র অঙ্গে স্নেহের পরশ দেয়—নেমে আসে এক পশলা বৃষ্টি। নির্মল আকাশের বুকে বকের ঝাঁক উড়ে চলে শরৎকে অভিনন্দন জানাতে। শুভ মুহূর্তে ধরণীর বুকে নেমে আসেন দশপ্রহরণধারিণী মা। গ্রামের প্রান্তে প্রান্তে আনন্দের বন্যা ছুটে চলে। থিয়েটারে, নাচে, গানে, ঢাকের বাজনায় বছরের জমান ক্লেদ যেন পরিষ্কার হয়ে যায়, মায়ের মুখে হাসি ফুটে ওঠে। মায়ের বিদায়ে সান্ত্বনা দিতে হেমন্তে উঠে আসেন ধান্য-লক্ষ্মী। নবান্নের উৎসবে আবার নতুন করে আলপনা পড়ে দুয়ারে দুয়ারে। মঙ্গলঘটের ওপর ধানের গুচ্ছ রেখে পুজো সারা হলে বাড়ি বাড়ি ঘুরে উৎসবের ভাগী হতে হয়। আস্তে আস্তে শীতের আমেজ পাওয়া যায়। পৌষ-সংক্রান্তিতে রাখালদের 'বাস্তুপুজো'র লোক-সঙ্গীত ভেসে উঠে সারা দেশ ধ্বনিত করে। তার পরেও আছে পিঠাপুলি, চড়কপুজোর হৈ-হৈ। এমনি করেই বৎসরের বারোটা মাস ঘুরে ঘুরে আসে ছোট গ্রামখানির বুকের ওপর এবং তারা চিহ্নও রেখে যায় নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যের।

মনে পড়ে গ্রামের ডাকঘরটিকে। সারা দুনিয়ার পরিচয় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এই ক্ষুদ্র ঘরটি। তার পাশেই দাতব্য চিকিৎসালয়, ছেলেমেয়েদের হাই-স্কুল, মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়। সংস্কৃত শিক্ষার্থীদের জন্যে টোল। তা ছাড়াও আছে পল্লী পাঠাগার ও ক্লাব। সব মিলিয়ে গ্রামটি স্বয়ংসম্পূর্ণ।

মাঝখানে একবার গিয়েছিলাম আমার 'ছেড়ে আসা গ্রামে'র লাল মাটিতে। নজরে পড়ে গেল বাঁশবাগানের মাঝে পুরোন মসজিদটার ওপর। দুধারের দুটি অশ্বত্থ গাছের চাপে অবস্থা তার বিপর্যস্ত। মনে হয় মুসলমানরাই এখানে প্রাচীন। পরে ক্রমশ হিন্দুপল্লী গড়ে উঠেছে এবং হিন্দু ধর্মের নিদর্শন ছড়িয়ে পড়েছে এধারে ওধারে। তালন্দের শিব মন্দিরের নাম-ডাক আছে—তার প্রমাণ পাওয়া যায় একটি জনশ্রুতিতে—

বিল দেখিস্ তো 'চলন'।
আর শিব দেখিস্ তো 'তালন'॥

পথে দেখা হল বকরুতুল্লার সঙ্গে। কি জানি কেন এড়িয়ে গেলাম ওর সঙ্গ। অথচ এরাও ছিল আমাদের আপন জন। পুজো-পার্বণে এদের অনেক সাহায্য পেয়েছি। গ্রামের কাজে এরা করেছে সহযোগিতা। কিন্তু আজ? এক সুরে বাঁধা বীণার তার কোথায় যেন ছিঁড়ে গেছে। তাই আজ সুরহীন হয়ে পড়েছে সব। প্রাণমাতান সংগীতের মীড়ে কোথায় যেন ঘটেছে ছন্দপতন। যে কদিন ছিলাম গ্রামে, গমকে গমকে এই কথাটাই প্রাণের ভেতর বেজেছে বেশী করে।

স্কুল দুটি প্রাণহীন, পাঠাগার অগোছালো, ক্লাবঘর স্তব্ধ; হাট, ঘাট ও মাঠে বিষাদের সুর। সারা গ্রামখানিই যেন ছেড়ে যাওয়া একটা বাড়ি, স্থানে স্থানে পড়ে রয়েছে ছেঁড়া কাগজ, জিনিসপত্রের টুকরো—উঠে-যাওয়া বাসিন্দাদের অবস্থানের চিহ্ন।

শুধু একজনকে দেখলাম গ্রাম ছেড়ে চলে যাননি। তিনি হচ্ছেন গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠ দাদু। মাটি-মায়ের প্রতি তাঁর ভালবাসার তুলনা হয় না। প্রাণের মায়ায় মাটি ছেড়ে গিয়ে জন্মভূমিকে যারা ব্যথিত করেছে, তাদের দলে দাদু নন। তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন মানুষের শুভ বুদ্ধির আশায়। তিনি যে দেশকে ভালবাসেন।

তাঁর সম্বন্ধে অনেক টুকরো টুকরো ঘটনা মনে পড়ে। মনে পড়ে রাস্তা ছায়াচ্ছন্ন করবার জন্যে নিজের হাতে তাঁর গাছ লাগানোর কথা। যাতায়াতের সুবিধের জন্যে নিজের জমি কেটে রাস্তা করার কথা। গরীব কৃষকদের জন্যে কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার কথা। জনসাধারণের প্রত্যেকটি ভাল কাজে দেখেছি তাঁর মঙ্গল হস্তের স্পর্শ। তাঁকে শ্রদ্ধা জানাই।

রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে একবার ঠিক হয়েছিল, কিছু চাঁদা তুলে তাঁর স্মৃতি ভাণ্ডারে পাঠানো হবে। দাদু শুনে বললেন—টাকা পাঠাবে সেত ভাল কথা। কিন্তু সেখানে টাকা পাঠাবার জন্যে অনেক বড়লোক রয়েছেন। তোমাদের এই সামান্য টাকা সেখানে না পাঠিয়ে, তাই দিয়ে রবীন্দ্রনাথের বই কিনে সবাইকে পড়াও। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দাও। তবেই ত এরা বুঝবে রবীন্দ্রনাথ আমাদের কি ছিলেন।' তাঁর কথা তখন কেউ শোনেন নি। আত্মকেন্দ্রিক বলে সবাই তাঁর কথা উড়িয়ে দিয়েছিলেন। আজ কিন্তু তাঁর সে কথার মর্মার্থ বেশ বুঝতে পারছি।

তিনি আধুনিক বাণীসর্বস্ব নেতাদের মত বিশ্বপ্রেমিক না হতে পারেন, কিন্তু তাঁর দেশপ্রেম যে খাঁটি, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

গ্রামের দেওয়ালে দেওয়ালে বর্ণপরিচয়ের প্রথম পাঠ তিনি লিখে দিয়েছিলেন জবাফুলের সাহায্যে। সংখ্যা তত্ত্বের পাঠও ছিল তার সঙ্গে। উদ্দেশ্য—গণ-শিক্ষার প্রসার। গরীব কৃষকদের বই কিনে স্কুলে পড়া না হতে পারে, কিন্তু দেওয়ালের বড় বড় অক্ষরগুলো পড়ে অনায়াসেই তারা শিখতে পারবে মাতৃভাষা। পাঠাগারের গায়ে তিনি লিখে দিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের মাতৃমন্ত্র—বন্দে মাতরম্। হায় সে মন্ত্র আজ বিফল হতে চলেছে মুগ্ধ জননীর মানুষ-না-হওয়া সাত কোটী সন্তানের হাতে !

দাদুর আর একটি জিনিস আমার আজও মনে আছে। রাস্তার ওপরেই ছিল তাঁর বাড়ির চওড়া দেওয়াল। ওটাই হল দাদুর প্রচারকেন্দ্র। প্রায় দিনই দেখা যেত পঞ্চমুখী জবাফুল দিয়ে দাদু ঐ দেওয়ালের গায়ে প্রাণ-ঢালা ভাষায় লিখে চলেছেন গ্রামের খবর। সেই সঙ্গে থাকত কোথায় রাস্তা করতে হবে, গ্রামের কোন্ পুলটার মেরামত প্রয়োজন, কৃষকরা ঋণ পেয়ে কি করবে ইত্যাদি। এছাড়াও ছিল তাঁর চিঠিপত্র লেখা ও বৈঠকে ছোট ছোট বক্তৃতা দেবার বাতিক। এমনি করেই দেশসেবায় তিনি নিমগ্ন থকতেন সব সময়, আর থাকবেনও জীবনের বাকি কয়টা দিন। দাদুর অর্থ-প্রাচুর্য নেই, দল নেই, দলীয় প্রচারপত্রও নেই, কিন্তু যে জিনিসের তিনি অধিকারী সে জিনিসেরই আজ বড় বেশী অভাব। সে হচ্ছে তাঁর হৃদয়। বাঙলার গ্রামের মানুষের সেই হৃদয় আজ হারিয়ে গেছে; সেই হৃদয়কে আবার উদ্ধার করতে হবে।

বীরকুৎসা

বীরকুৎসা কি কোন গ্রামের নাম হতে পারে? যদি-ই বা হয় তাহলে কি করে এ নাম হল সে সম্পর্কে কোন প্রশ্নের জবাব হয়ত দিতে পারতেন গ্রামের প্রাচীন প্রাজ্ঞরা। কিন্তু আমার তা জানা নেই। তবু আমার গ্রামের নাম বীরকুৎসা। রাজসাহী জেলার ছোট্ট একটি গ্রাম। আজ তার ইতিবৃত্ত বলতে বসে কেবলি মনে প্রশ্ন জাগে, সে গ্রাম কি করে এরই মধ্যে এত দূরের হয়ে গেল! ভাবতে কষ্ট হয়, তবু ভাবি। এখনো যেন স্পষ্ট দেখতে পাই ভোর হয়ে আসছে গ্রামের দিগন্তে। জেগে উঠেই দেখতাম তছির সর্দার আর শুকাই প্রামাণিক লাঙ্গল কাঁধে নিয়ে সেই কুয়াসাছড়ানো নরম ভোরের আলো-আঁধারিতেই গরু নিয়ে চলেছে মাঠে। ও পাড়ার নলিন জেলে জনকয় সঙ্গী নিয়ে খুব বড় একটা বেড়া-জাল কাঁধে ফেলে শীতে কাঁপতে কাঁপতে ছুটে চলেছে আত্রাই নদীর দিকে। এ সবই আজ আমার কাছে অতীত। অনেক দূরের ব্যাপার। তবু তো থেকে থেকে মন বলে, চল সেখানেই যাই।

শহরে সময় চলে দৌড়ে, গ্রামে যেন তার কোন তাড়াই নেই। ধীরে সুস্থে গড়িয়ে যায় প্রহরের পর প্রহর। ভোরের সূর্য ওঠে। পাশের গ্রাম দুর্লভপুরের উঁচু বটগাছটার মাথার ওপর দিয়ে সূর্যের আলোক ছড়িয়ে পড়ে বীরকুৎসার আনাচে কানাচে। দেখতাম ও পাড়ার পূর্ণ সাহা কম্বল মুড়ি দিয়ে নিমের ডাল দাঁত ঘষতে ঘষতে আমাদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াত। আর এ বছরের শীত যে খুব বেশী এবং গত আট দশ বছরের মধ্যে তার কোন তুলনা পাওয়া যায় কিনা তারই ব্যর্থ আলোচনা নিয়ে সকালটা মাত করে রাখত। শহরে এসে যেদিকে তাকাই, মানুষের হাতে গড়া ইট, কাঠ, পাথরের সৌধ। কিন্তু গ্রাম যেন মানুষের গড়া নয়। প্রকৃতির দাক্ষিণ্যে সে যেন আপনাতে আপনিই বিকশিত। নরম মাটির গন্ধ, ভাঁটফুল, বনতুলসী আর ঘেঁটু ফুলের আরণ্যক সমৃদ্ধি মনকে এমনিতেই কেমন জানি উতলা করে রাখত।

বাড়ির দক্ষিণদিকে ছিল ছোট একটি খাল। বর্ষায় সেই বিশীর্ণ খালে আসত যৌবনের জোয়ার। উত্তর বঙ্গের মাঝিরা সে খাল বেয়ে যেত গ্রাম

গ্রামান্তরে। নৌকোর লগি ঠেলার আর বৈঠার টানের শব্দে কত রাতে ঘুম যেত ভেঙে। মনে হত গ্রাম মৃত্তিকার স্পন্দন ধ্বনি শুনতে পাচ্ছি বুকের কাছটিতে।

গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠ আশু দাদুর প্রকাণ্ড বৈঠকখানায় প্রতি সন্ধ্যায় বসত তরুণদের জলসা। সর্বজনীন কালীপুজো, দুর্গাপুজো প্রভৃতি উৎসব উপলক্ষে যাত্রা, থিয়েটারের গৌরচন্দ্রিকা অর্থাৎ মহড়া চলত সেখানে। পাঁচন মোল্লা, সরিতুল্লা, বৈদ্যনাথ আর ফকির পাল প্রভৃতি হিন্দু-মুসলমান মিলে যাত্রা গান প্রভৃতি অনুষ্ঠানে মেতে থাকত। সেদিনতো কোন বিচ্ছেদ, বিভেদের প্রশ্ন ওঠেনি! বাহারদা ছিলেন বাঁশী বাজাতে ওস্তাদ। তাঁর বাঁশের বাঁশীর সুর-যোজনা গ্রামবাসীকে মুগ্ধ করেছে কত অলস অপরাহ্নে, কত সন্ধ্যায়। তিনি মুসলমান ছিলেন বলে তো হিন্দুর উৎসবে তার আমন্ত্রণ বাদ পড়েনি আনন্দ পরিবেশনে? গ্রামের পোষ্টমাষ্টার ধীরেন মজুমদার ও পুরোহিত রুক্মিণী চক্রবর্তী ছিলেন রসিকপ্রবর। এঁদের মুখে সত্যি-মিথ্যে অতিরঞ্জিত কাহিনী শোনবার জন্যে গ্রামবাসীরা সাগ্রহে ভিড় করত। এঁদের সকলকে নিয়েই তো গ্রাম। তাদের ভুলি কি করে?

স্কুলের মাঠে খেলাধুলোর প্রায় সকল রকম ব্যবস্থাই ছিল। স্টেশনের অদূরে 'কুচেমারা' নামে একটি রেলের সাঁকোর ওপড়ে ভিড় জমত ছেলে বুড়ো অনেকেরই। এই আড্ডাটির লোভ সম্বরণ করতে পারত না কেউ। শত কাজ ফেলেও সন্ধ্যের দিকে 'কুঁচেমারা' সাঁকোর কাছে যাওয়া চাই-ই। চমৎকার সে জায়গাটির পরিবেশ। এক ধারে সবুজ গ্রাম, আর এক ধারে বিস্তীর্ণ মাঠ। সূর্যাস্তের সময় কবিগুরুর কথা মনে হত—'সৃষ্টি যেন স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে।' সাঁকোর তলা দিয়েই চলে গেছে খাল। সেখানে জেলেরা খেয়া পেতে মাছ ধরত। বড় বড় নৌকো পাল তুলে চলে যেত অনবরত। কোন কোন নৌকো জেলে নৌকোর পাশে ভিড়িয়ে মাছ কিনে নিত।

গ্রামের জমিদার বাড়ির প্রাংগণে অতীতকালের সাক্ষী রয়েছে এক বিরাট বকুল গাছ। চিরদণ্ডায়মান গাছটি পথক্লান্ত পথিকদের যেন আহ্বান জানায়। গাছের তলাটি বহুদিন আগে জমিদার বাঁধিয়ে দিয়েছিলেন। বিরাট বাঁধানো বেদীর ওপর কেউ কেউ তাস-পাশা খেলায় মগ্ন থাকত, ছেলেরা ছক্ কেটে বকুলের বিচি সাজিয়ে 'মোগল পাঠান' প্রভৃতি খেলায় জমে যেত। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা বকুল ফুলের মালা গাঁথবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ফুল কুড়োত।

নিকটেই ছিল ডাকঘর। ডাক হরকরার প্রতীক্ষায় যুবক-বৃদ্ধ সবাই গাছটার তলায় জড় হত এবং ডাক পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গেই দু'তিনখানা পত্রিকা নিয়ে বকুলতলার আড্ডার প্রথম পর্ব শেষ করত। সংবাদপত্রের খবর নিয়ে মাঝে মাঝে বচসাও হত। এখন সেই বেদীটিতে বড় বড় ফাটল ধরেছে, সেখানে খবরের কাগজও আর পড়া হয় না, বকুল ফুলও আর ছেলেমেয়েদের আকর্ষণ করে না!

বৈশাখে এক মাস ধরে 'নগর-কীর্তন'—এ প্রথা বহুকালের। গ্রামের প্রান্তরে এক ঘন জঙ্গলে বুড়ো কালীর বাঁধানো বেদী এবং তারই পাশে প্রকাণ্ড এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। সেখান থেকে 'নগর-কীর্তন' আরম্ভ হয়ে নানা পথ ঘুরে আশু দাদুর মণ্ডপে এসে শেষ হত। এতে কিশোরী চৌকিদার, জহিরউদ্দিন প্রভৃতি মুসলমানরাও যোগ দিত। এদের গাইবার ক্ষমতাও ছিল অসাধারণ। গ্রামে মহরমের মেলায় 'তাজিয়া' শোভাযাত্রায় রমেশ, টেপা প্রভৃতির লাঠি খেলা দর্শকদের অবাক করে দিত। তখন কেউ জানত না হিন্দু-মুসলমান দুটা পৃথক জাত। একটা মিথ্যেই শেষে সত্যি হল!

. মাতব্বর হালিম চাচা সকালে কাশতে কাশতে বাজারে এসে গল্প জুড়ে দিতেন। তাঁর কথা বলার একটা অদ্ভুত ভঙ্গি ছিল। সব কথা সত্যি না হলেও কথার প্যাঁচে সবাইকে স্বমতে নিয়ে আসতেন। শাস্তাহারের হাংগামার পর যখন গ্রামকে গ্রাম হিন্দু-শূন্য হতে লাগল তখন তিনি কেঁদে কেঁদে বল্লেন—বাবা কালা, মদা তুরা য্যাস না, আমরা গাঁয়ে থাকতে আল্লার মর্জিতে তুদের কিছু হবে না···। কিন্তু গ্রামের লোক সেদিন তাঁর কথায় আস্থা ফিরিয়ে আনতে পারে নি।

গ্রাম ছেড়ে আসার দিন আমার প্রিয় বন্ধু আহ্‌মেদ মিঞাও আমাকে বলেছিল—'ভাই তুইও আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছিস্?' এই কথাটির মধ্যে যে কত ব্যথা লুকানো ছিল তা একমাত্র আমিই জানি। আজো মনে হয় হালিম চাচার, আহমেদ মিঞার করুণ স্নেহ-সম্ভাষণ। মাঝখানে কিন্তু আমাদের রাজনীতির দুস্তর ব্যবধান যে সে ব্যবধানও হয় তো একদিন ঘুচবে। মিথ্যে তো সত্যি করে সত্যি কখনও হতে পারে না!

॥ পাবনা ॥

গাড়াদহ

কালের চাকা আবর্তিত হয়ে চলেছে অবিরাম। মানুষের জীবনের ওপর সে চাকার দাগ স্পষ্ট হয়ে থাকে। তাই একদিন যারা ছিল শ্যামল মায়ের আদুরে দুলাল, প্রকৃতি তার হৃদয়ের সমস্ত সৌন্দর্য নিঙড়ে যাদের অন্তর করেছিল কোমল, সজীব, তারা আজ রিক্ত, সর্বহারা। তারা কি কখনও ভেবেছিল, যে দেশকে সে 'মা' বলে জেনেছে—যে দেশের মাটি তার কাছে স্বর্গের চেয়েও পবিত্র, সেই দেশ তাদের নয়? একটা কালির আঁচড়ের ফলে তাকে সব কিছু ছেড়ে আসতে হবে? ওপারের লক্ষপতি এপারে আসবেন শরণার্থী হয়ে একটু মাথা গুঁজবার ঠাঁই আর দুমুঠো ভাতের জন্যে হবেন অন্যের কৃপাপ্রার্থী—কচি শিশুর মুখে তুলে দেবেন দুধের গুড়ো? বাস্তবের কঠিন কশাঘাতে মন যখন নিস্তেজ হয়ে আসে তখন মনে পড়ে পল্লীর সেই অনাবিল সৌন্দর্যের ছবি। মানস-পটে ভেসে ওঠে দিগন্ত বিস্তৃত সেই শ্যামল বনানীর শোভা। কিন্তু সে রামধনুর মতই ক্ষণস্থায়ী। তবুও তাকে তো ভোলা যায় না। ছন্নছাড়া জীবনের লক্ষ্যহীন যাত্রাপথে সেই ছবিই বার বার ভেসে ওঠে। আমার গ্রাম আমাকে ডাকে—নিভৃতে, অতি গোপনে। তার সেই ডাকে কি আর কোন দিনই সাড়া দিতে পারব না? তার গোপন আহ্বান কি কোনও সাড়া না নিয়েই ফিরে যাবে?

পাবনা জেলার একটি ছোট্ট গ্রাম গাড়াদহ তার নাম। দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন পটে আঁকা একখানা ছবি। শীর্ণকায়া করতোয়া কুলু কুলু রবে গাঁয়ের পূবসীমানা দিয়ে বয়ে চলেছে।

প্রায় পাঁচ হাজার লোকের বাস আমাদের গাঁয়ে। তার মধ্যে অর্ধেকের বেশী মুসলমান। অধিকাংশেরই জমিজমা বেশী কিছু নেই। অন্যের জমি বর্গা নিয়েই এরা সংসার চালায় আর সকলের আহার যোগায়। সারাদিন এরা হাড়ভাঙা খাটুনি খাটে। শেষ রাতে পাখির ডাকে এদের ঘুম ভাঙে। কাঁধে লাংগল নিয়ে তখন দলে দলে সবাই মাঠে যায়—সঙ্গে নিয়ে যায় এক বদনা জল

আর তামাক—যা না হলে এদের একদণ্ডও চলে না। মহাজনের কাছ থেকে চড়া সুদে টাকা ধার করে আবাদের খরচ যোগায়। সব সময় এক চিন্তা—কি করলে ফসল ভাল হবে। ভগবানের কাছে মানত করে ঠিক সময় বৃষ্টি দেবার জন্যে। বর্ষায় গ্রামের অলি গলি পুকুর যখন কানায় কানায় ভরে ওঠে, নৌকো ছাড়া যখন ঘর থেকে বের হওয়া যায় না তখনও দেখেছি ওরা দল বেঁধে ডুব দিয়ে দিয়ে পাট কাটছে। সমস্ত মাঠ ওদের কণ্ঠনিঃসৃত ভাটিয়ালী গানে মুখর হয়ে উঠেছে। ওদের চোখে মুখে ফুটে ওঠে এক অনির্বচনীয় আনন্দোচ্ছ্বাস। ওরা বলে, ওই গানের সুরের মধ্যেই সব কষ্ট ভুলে থাকার মন্ত্র রয়েছে। ওদের অনেকের বাড়িতেই তেমন ভাল ঘর নেই। কোন রকমে বেঁচে থাকার জন্যে যা প্রয়োজন তার বেশী কিছুই নেই। অনেকে শুধু মজুর খেটেই সংসার চালায়। আবার কেউ কেউ ছোটখাট ব্যবসাও করে। দল বেঁধে ওরা হাটে যায়। মাছ, লংকা, পেঁয়াজ এগুলো না হলে একদিনও ওদের চলে না। সুখ-দুঃখের আলাপ করতে করতে বাড়ি ফেরে। আশ্বিন-কার্তিক মাসে যখন ধানের ক্ষেতে সোনার রং দেখা, দয়, বাতাসে ধানের শীষগুলো নুয়ে পড়ে যখন পথচারীকে সাদর সম্ভাষণ জানায়, তখন চাষীদের মনে আর আনন্দ ধরে না। ধান ক্ষেতের দিকে চেয়ে তারা বৎসরের সমস্ত কষ্ট ভুলে যায়। কবে তারা এই ধান ঘরে তুলবে? এ থেকে দিতে হবে মহাজনের দেনা, ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স, জমিদারের খাজনা, আরও কত কি!

উত্তর দিকে তাঁতি পাড়া। দিন-রাত খট্‌খট্ শব্দে তাঁত চলেছে। গামছা, লুঙ্গী, ছোট কাপড়—এগুলোই সাধারণত বোনা হয় ওদের তাঁতে। সপ্তাহে একদিন করে তাঁতিরা হাটে তা নিয়ে যায়, মুনাফা যা থাকে তাতে ভালরকমেই চলে। রাস্তা দিয়ে চলতে নতুন সুতোর কেমন যেন একটা গন্ধ নাকে আসে। কোন সময়ই তাঁত বোনার বিরাম নেই। তাঁতিপাড়ার একটু দূরেই কুম্ভকারদের বাস। কত সময় গিয়ে বসেছি ওদের ওখানে। কী নিপুণ হাতের স্পর্শে কাঠের ঘূর্ণায়মান চাকার মাঝ থেকে হাঁড়ি তৈরী হয়ে আসত তা দেখে আশ্চর্য হতাম। এরপর সেই সব হাঁড়ির সঙ্গে বালি মিশিয়ে তারা পিটত অতি সন্তর্পণে। রাশি রাশি হাঁড়ি-কলসী, থালা, বাটি একসাথে জড়ো করে মাটির নীচে গর্ত করে তার ওপর মাটি চাপা দিয়ে ভেতর থেকে আগুন ধরিয়ে দিত। 'বুড়ীতলা'য় মানত করত যাতে এ সময় বৃষ্টি না হয়। পুজো-পার্বণ উপলক্ষে কুমোরপাড়ায় লোকের

ভিড় জমত। সবাই দেখে শুনে বাছাই করা জিনিস নিয়ে আসত। পরিশ্রমের তুলনায় সে জিনিসের দাম নিতান্তই কম। বর্ষার সময় নৌকো বোঝাই করে কুমোররা এগ্রাম সেগ্রাম ঘুরে বেড়াত এবং হাঁড়ি-কলসীর বিনিময়ে গৃহস্থের বাড়ি থেকে ধান নিত। এইটেই ছিল ওদের বড় আয়। এইভাবে তারা সারা বছরের ধান জোগাড় করে রাখত।

আর একটু দূরেই কর্মকার পাড়া। এখানেও সারা দিনরাত হাতুড়ির আওয়াজ কানে আসত। বিয়ে বা অন্য উৎসব উপলক্ষে এদের কাজ বহুগুণ বেড়ে যেত। কোন চাষীরই প্রায় সোনার গয়না তৈরী করার সামর্থ্য নেই। তাই পাটের টাকা পেলেই তারা বৎসরে অন্তত একটিবার রূপোর গয়না তৈরী করায়। সব চেয়ে ভিড় জমত সাধুর দোকানে। রাত্রিতে লাল টক্‌টকে লোহার চিমটে দিয়ে ধরে সে যখন গয়না পিটত তখন চারদিকে আগুনের ফুলকি উড়ে পড়ত। আর সেই জ্বলন্ত লোহার আঁচে তার মুখের একাংশ লাল্‌চে মেরে যেত। এই কর্ম-চঞ্চল জীবনের মাঝখানেও এরা আমোদ-প্রমোদ অত্যন্ত ভালবাসত। মাঝে মাঝে খোল-করতাল নিয়ে কীর্তন করত ; আবার কবি গান, পাঁচালি, ঢপ কীর্তন, কৃষ্ণযাত্রা, বাউল গান, শুনেও কোন কোন দিন রাত কাটিয়ে দিত। খাবারের চিন্তা তাদের ছিল না। তারা জানত যত দিন হাত, ততদিন ভাত, তাই অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে তারা থাকত না।

কেউ অন্যায় করলে তার বিচার হত গ্রামেই। হিন্দু-প্রধান এবং মুসলমান-প্রধানদের নিয়ে বসত পঞ্চায়েৎ। আসামী নত মস্তকে তাঁদের নির্দেশ মাথা পেতে নিত। সুখে দুঃখে সকল সময়ে এমনিভাবে গ্রামবাসীরা একসঙ্গে বসে তাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ঠিক করেছে। পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময়ও ঠিক এমনিভাবে তারা তাদের কর্মপন্থা ঠিক করেছিল। জমিদার বাড়িতে দরবার বসল। সামনেই একটা ছোট চৌকীর ওপর তাকিয়া হেলান দিয়ে তিনি বসে রয়েছেন। সামনে হুকোর নলটি পড়ে আছে। গ্রামের প্রধানগণ একে একে এসে তাঁকে নমস্কার জানিয়ে যে যার আসনে বসে পড়ল। প্রজাদের সুখ দুঃখের অভিভাবক তিনি।

গ্রামের ঠিক মধ্যস্থলে রায়েদের বাড়ি। পাশেই ব্রাহ্মণপাড়া। পুজো-আর্চা নিয়েই এঁরা সর্বদা ব্যস্ত থাকতেন। সন্ধ্যের সময় প্রতি বাড়িতে ঠাকুরের সন্ধ্যারতি আরম্ভ হত। মন্দির প্রাংগন লোকে ভরে উঠত। ছেলে মেয়েরা পুজোর প্রসাদ নিয়ে বাড়ি ফিরত। এ ছিল তাদের নিত্য কর্ম। রায়েদের

বাড়ির সামনেই খেলার মাঠ। শত কাজের মধ্যেও দলে দলে লোক আসত খেলা দেখতে। অনেক দূর থেকেও খেলোয়াড়গণ আসত। গ্রামবাসীরা তাদের সেবার ভার সানন্দে নিজেদের মাথায় তুলে নিত।

মাঠের এক পাশেই 'বুড়ীতলা'। কিভাবে যে এর এ নামকরণ হয়েছে তা আমরা জানিনা। প্রতি শনিবার এর প্রাংগণে লোক সমাগম হত। মংগলাকাঙ্ক্ষী নর-নারী হাতে পুজোর ডালা নিয়ে বসত এই বুড়ীতলায়। আসলে গাছটা 'সরা গাছ'। গোড়া থেকে দু'তিন হাত পর্যন্ত সিঁদুর দিয়ে লেপা। লোকে বলে এ গাছ নাকি জ্যান্ত দেবতা। লোকমুখে আরও শোনা যায় যে, আশে পাশে অন্ধকারে কারা নাকি ঘুরে বেড়ায়।

গাঁয়ের পুব দিকে নদীর ধারে জেলেদের বাস। বর্ষায় শীর্ণকায়া করতোয়া যখন কানায় কানায় ভরে ওঠে, জেলেদের ডিঙি তখন সমস্ত নদী ছেয়ে ফেলে। নদীর এপার থেকে ওপার পর্যন্ত মোটা মোটা বাঁশ পুতে দেওয়া হয় এবং মাঝে কিছুটা জায়গা ফাঁকা থাকে। তারপর সমস্ত জায়গাটা জেলেরা জাল দিয়ে ঘিরে দেয়। বর্ষার সময় এই রকম ভাবে জেলেদের জালে বড় বড় মাছ ধরা পড়ে। গ্রামের হাটে এদের ধরা মাছ বিক্রী হয়। লোকের ভিড় খুব বেশী হলে উৎসাহী হয়ে হয়তো অমুক সর্দার কি পরামাণিক তাকে মাছ বিক্রী করে ঠিক মত দাম নিতে সাহায্য করে। বেচা-কেনা শেষ হলে জেলেরা খুশি মনে এদের হয় তো একটা ভাল মাছ খেতে দেয়। এর মধ্যে কোনও কুটিলতা নেই। অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে, সহজ অন্তরে এরা সাহায্যকারীকে তার পরিশ্রমের জন্যে সামান্য কিছু উপহার দেয়।

খেলার মাঠের একটু দূরেই স্কুল, ডাকঘর, ইউনিয়নবোর্ড অফিস। ডাকঘর থেকে যে রাস্তাটা সোজা চলে গেছে ওই রাস্তার পাশে থাক্‌ত এক বাগ্‌দী——নাম তার ঝণ্টু। ডান হাতের কব্জি পর্যন্ত কাটা। ওর নাকি আগে মাছ ধরার খুব ঝোঁক ছিল। গাঁয়ের পশ্চিম দিক দিয়ে যে বিলটা গেছে লোকে আজও ওটাকে 'লক্ষমণির বিল' বলে। ঝণ্টু একদিন নাকি ওখানে মাছ ধরতে যায় গভীর রাত্রিতে। ঝুপ ঝুপ বৃষ্টি পড়ছে। হঠাৎ দেখল সাতটা কলসী ভেসে আসছে—আর তার ভেতর থেকে টুং টাং আওয়াজ হচ্ছে। প্রথম কলসীটি ধরতেই সে শুনতে পেল কে নাকি ভেতর থেকে বলছে—'তোমার যা দরকার পরের কলসীটি থেকে নাও।' এইভাবে পর পর ছয়টি চলে গেল। শেষের

কলসীর ঢাকনাটা আপনা থেকেই খুলে গেল। কে নাকি বলল—'এক বারে যা পার নাও।' ঝণ্টু দেখল ঘড়া ভর্তি সোনার মোহর—একবার নিয়ে কোঁচড়ে রেখে আবার যেমনি হাত দিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে হাতের কব্জিটুকু কলসীর ভিতরেই রয়ে গেল। সেই থেকে নাকি ও 'হাত কাটা ঝণ্টু' বলেই সকলের কাছে পরিচিত।

এখন বৃদ্ধ হয়ে গেছে ঝণ্টু। তবু সে মাঝে মাঝে গ্রামের মধ্যে নানা রকম খেলা দেখিয়ে বেড়ায়। কোনও দিন বা গান গায়—আবার কোনওদিন বা নিজের জিবটা কেটে থালার উপর রেখে বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ায়। ছেলেবেলায় ওর কারসাজী না বুঝতে পেরে অবাক বিস্ময়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকতাম।

পুজোর সময় আমাদের গ্রাম এক অপূর্ব শ্রী ধারণ করত। আনন্দময়ীর আগমনে চারদিক আনন্দমুখর হয়ে উঠত। আমাদের পেয়ে গাঁয়ের চাষী সম্প্রদায় যেন হাতে স্বর্গ পেত। তাদের ধারণা—আমরা এলেই থিয়েটার হবে। সাড়া পড়ে যেত গ্রামে। এখানে হিন্দু-মুসলমানে কোনও ভেদ নেই। এ যে আমাদের জাতীয় উৎসব—এর সঙ্গে রয়েছে যে আমাদের অন্তরের যোগ। তাই একই সঙ্গে মন্দিরের সামনে ভিড় জমে উঠত হিন্দু-মুসলমানের। কোনও দ্বিধা নেই—কোনও সংকোচ নেই। সকলেই যেন ওই একই মায়ের সন্তান। বিজয়ার দিন করতোয়ার তীর আর একবার ভরে উঠত। উচ্চ-নীচ, ধনী-নির্ধন সব সেদিন এক হয়ে যেত।

গ্রামের দক্ষিণ দিকে বাজার। নিত্য প্রয়োজনীয় সব জিনিসই এখানে পাওয়া যায়। গরীব চাষীরা বাড়ি থেকে দুধ নিয়ে আসে বিক্রী করতে। যা পায় তাই দিয়ে অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি কিনে নিয়ে যায়। দুধ খাবার মত সামর্থ্য তাদের অনেকেরই নেই। বাজারের এক ধারে বিরাট গর্ত। ওখানে চড়কের গাছ পোঁতা হয়। চৈত্র-সংক্রান্তির দিনে এখানে মেলা বসে। দেখেছি দুজনের পিঠে বড় বড় বড়শী বিঁধিয়ে একটা বাঁশের দুধারে ঝুলিয়ে তাদের ঘুরানো হত। সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়ে উঠত দেখে। আজ নানারূপেই মনে পড়ছে আমার গ্রামকে। জন্মভূমি থেকে বহু দূরে চলে এসেছি। তবু মনে পড়ছে পাবনা জেলার ছোট সেই অখ্যাত পল্লী-জননীকে। এখন হয় তো শীর্ণকায়া করতোয়া বর্ষার প্লাবনে যৌবন উচ্ছলা হয়ে উঠেছে। গ্রামের দিগন্তে জমেছে সন্ধ্যার ছায়া। আমার শত স্মৃতি জড়ানো সেই গাড়াদহ। দেশের সীমানায় সে আজ কতদূর, তবুও মনের কত কাছে, কত নিভৃতে। এ তারই অশ্রুসজল ইতিহাস।

পঞ্চক্রোশী

পঞ্চক্রোশী। নদী নয়, গ্রামের নাম। আমার নিজের গ্রাম। নামের হয়তো ইতিহাস আছে। সবটা আজ মনেও নেই, থাকবার কথাও নয়। তবু পাবনা জেলার উপান্তে সিরাজগঞ্জ থেকে পাঁচ ক্রোশ দূরের এই গ্রামে আমার জন্ম। নামের ইতিহাস যাই হোক গ্রামটি যে এককালে নেহাৎ ছোট ছিল না তার প্রমাণের অভাব নেই। তার পুরোনো আভিজাত্যের পরিচয় পাওয়া যায় নানা কাহিনী বিজড়িত কতগুলো পরিত্যক্ত ভিটে থেকে; আর পাওয়া যায় হৃত-গৌরব জমিদারবাড়ির চূণকাম খসা, নোনা ধরা ইটের তিনতলা দালানের চোরা কুঠীরের গহ্বর থেকে—যেখানে এখন চামচিকে আর লক্ষ্মী পেচার তত্ত্বাবধানে পড়ে রয়েছে রৌপ্যনির্মিত আসা-সোটা, বল্লম আর বিরাট আকারের সব ছাতি আর বস্তা-পচা অজস্র সামিয়ানা, তাম্বু আর সতরঞ্চি। জীবনের যে সময়টা রূপকথা শোনবার বয়েস, সে সময়ে এমন কোন সন্ধ্যা বাদ যায়নি যেদিন ঠাকুমার মুখ থেকে শুনতে পেতাম না আমাদের গ্রামের প্রাচীন নানা অপরূপ ঐতিহ্যের কাহিনী।

গ্রামের পূবদিকে মাঠের মধ্যে ঐ যে একটা ভিটে আছে যেখানে এখন রয়েছে ঘনসন্নিবিষ্ট আমগাছ আর বাঁশের ঝাড়, ঐখানে ছিল মনমোহন দাশের বাড়ি। মনমোহন দাশের ঐশ্বর্যের খ্যাতি ছিল প্রচুর—বদান্যতার খ্যাতি ছিল প্রচুরতর। সেকালের রাজর্ষি জনক রাজা হয়েও নিজহাতে হলকর্ষণ করতেন, আর একালের মনমোহন দাশ সোনার খড়ম পায়ে দিয়ে নাকি নিজে গরু দিয়ে ধান মাড়াতেন। হয়ত এ নিছক কাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়, কিন্তু ঠাকুমার মুখে সেদিন এসব শুনে আমাদের মনে যে অভূতপূর্ব ভাবের সঞ্চার হত সেতো আজও ভুলবার নয়! এমনি আরও কত টুকরো টুকরো কাহিনী—! তারপর জমিদার বাড়ির কথা—যে বাড়ি একদিন ছিল আত্মীয়-অনাত্মীয় চাকর-চাকরাণীর কলরবে মুখরিত, আজ সে বাড়ির নিস্তব্ধতা ভংগ করে দাঁড়কাকের কর্কশ কণ্ঠস্বর। এখনও কত নৈশ নিস্তব্ধতার অবকাশে ঠাকুমার মুখে শোনা জমিদারবাড়ির কাহিনী চলচ্চিত্রের মত একে একে চোখের সামনে ভেসে উঠতে থাকে। জমিদার দীননাথ

দাশগুপ্ত তাঁর দিনাজপুরের বাসা থেকে বৎসরান্তে একবার দুর্গাপুজো উপলক্ষে পঞ্চক্রোশীর বাড়িতে ফিরে আসছেন। সাতদিন আগেই বাড়িতে খবর পৌঁছে গেছে। নায়েব গোমস্তা থেকে আরম্ভ করে পেয়াদা চাকর চাকরাণীদের একমুহূর্ত বিশ্রাম নেই। ঘর-দোর ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করার জন্যে সকলেই অতিমাত্রায় ব্যতিব্যস্ত—তদারকরত নায়েব প্রসন্ন ভট্টাচার্য মশাই তাঁর সুপুষ্ট উদর নিয়ে দোতলা একতলা ছুটোছুটি করতে করতে হাঁপিয়ে উঠেছেন, আর অযথা চেঁচিয়ে সারা বাড়িটা তোলপাড় করে তুলেছেন। বাইরের মণ্ডপে চার-পাঁচজন কুমার অক্লান্ত পরিশ্রমে সুবিশাল দেবী প্রতিমা সমাপ্ত করবার জন্যে ব্যস্ত। সকলেই জানে তাদের সবার জন্যেই আসছে নানা রকমের উপহার। এদিকে জমিদার দিনাজপুর থেকে জলপথে গ্রামের সীমান্তে এসে পৌঁছেছেন, খবর আসতেই তাঁকে অভ্যর্থনা করে আনবার জন্যে দলে দলে ছুটে চলেছে হিন্দু মুসলমান প্রজার দল। প্রত্যেকের কাঁধে একটা করে লাল ব্যাজ—আর হাতে লাল নিশান। পেয়াদা বরকন্দাজরা ও চলেছে। কাঁধে তাদের রূপোর আসা-সোটা, হাতে তাদের রূপোর বল্লম, আর অপরূপ সাজে সজ্জিত বেহারার দল নিয়ে চলেছে বহুবর্ণে খচিত, মখমলের জাজিম বিছানো পাল্কী।...পূজোর কয়েকদিন কারও বাড়িতে হাঁড়ি চড়ত না, হিন্দু-মুসলমান সকলেরই সে কদিন জমিদার বাড়িতে নিমন্ত্রণ। কল্পনার চোখে দেখতে পাই—বাইরের প্রাংগণে সারি-সারি পাশা-পাশি বসে গেছে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে নিমন্ত্রিত প্রজার দল—গরদ বসন পরিহিত নগ্নপদ জমিদার দীননাথ নিজে উপস্থিত থেকে তদারক করছেন তাদের আহারের।...আজ ভাবি সেদিন কোথায় বা ছিল দুই জাতিতত্ত্ব, কোথায়ই বা ছিল সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ! পরিপূর্ণ প্রীতির সম্পর্ক ছিল হিন্দু আর মুসলমানের মধ্যে ; চাচা, ভাই সম্বোধনের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছিল একটা নিকট মধুর সম্পর্ক! ঝগড়া-বিবাদ হত, মারামারি হত—দুই পক্ষই ছুটে আসত জমিদারের কাছারীতে, গ্রামের মোড়লদের নিয়ে বসত মিটিং, হত বিচার, কমিটি যে রায় দিত, দুইপক্ষই তা মাথা পেতে মেনে নিত। হিন্দু সেদিন মুসলমানের কাছে অপরাধ স্বীকার করতে সংকোচ বোধ করত না, মুসলমানও হিন্দুর কাছে হাতজোড় করে ক্ষমা ভিক্ষা করতে দ্বিধা করত না।

এই তো সেদিনের কথা! মধ্যাহ্নে জমিদারবাড়ির কুল-বিগ্রহের ভোগশেষে যখন কাঁসর বাজত, দেখতাম দলে দলে উল্লসিত কণ্ঠে চিৎকার করতে করতে থালা হাতে ছুটে আসছে হিন্দু-মুসলমান ছেলেমেয়ে—সকলেই প্রসাদপ্রার্থী।

আবার সন্ধ্যারতির কাঁসর-ঘণ্টা বেজে উঠতেই আসত বহু মুসলমান স্ত্রী-পুরুষ। কারও বা মাথাধরা, কারও বা চোখ উঠা, কারও বা ছেলের পেটকামরাণী, কারও বা মেয়েকে ভুতে পেয়েছে— সকলেই আসত একটু 'ঠাকুর' ধোয়া পানির জন্যে, (চরণামৃতকে তারা বলত ঠাকুর ধোয়া পানি)। একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম 'আচ্ছা মতির মা, তোমরা মুসলমান হয়ে আমাদের হিন্দুর দেবতাকে বিশ্বাস করলে তোমাদের ইসলাম বিপন্ন হয়না ?' মতির মা উত্তর করছিল, 'অতশত বুঝিনা বাবু, যাতে কইর‍্যা আমাগো উপগার হয় আমরা তাই করি। তাছাড়া আপনাগ ঘরে দ্যাবতা, আর আমাগ ঘরে আল্লা আর পেরথক না, আপনারা কন ভগবান আর আমরা কই খোদা !' সেদিন দেশের অধিকাংশ জনসাধারণই ছিল বোধহয় আমাদের এই মতির মার মত মানুষ ! সরল অকপট বিশ্বাস নিয়ে প্রেতিবেশীর সঙ্গে তাই তারা হয়ে উঠতে পেরেছিল একাত্ম !

আজ মনে পড়ে সেই নাজির ভাই-এর কথা। শৈশব থেকে আরম্ভ করে কৈশোর পর্যন্ত প্রতিটি দিনের সে ছিল আমাদের নিত্য সঙ্গী। সামাজিক মর্যাদা, বয়সের পার্থক্য, শিক্ষার স্তর ভেদ কিছুই তারও আমার অভিন্ন হৃদয় বন্ধু হওয়ার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। খেলার মাঠ থেকে আরম্ভ করে পড়ার ঘর পর্যন্ত তার সঙ্গ ছিল আমাদের অপরিহার্য। মনে পড়ে আমির ভাই, ফজু ভাই, জোমসের আলী, আব্দুল সরকারের কথা। সন্ধ্যাবেলা মামার ডিস্‌পেন্সারী ঘরে কড়া শাসনে, তিনচারজনে মিলে আমরা যখন স্বর করে স্কুলের পড়া তৈরী করতাম সময় সময় মামাকে কেন্দ্র করেই আমাদের আড্ডাও জমে উঠত প্রবলভাবে ! সন্ধ্যা সাতটা থেকে রাত এগারটা অবধি কোন কোনদিন একটানা আড্ডা চলত। খাবার তাগিদ দিতে বাড়ির সবাই বিরক্ত হয়ে উঠত, তবু আমাদের আসর চলত পুরা দমে।

মনে পড়ে সেই সব বাল্যবন্ধু রশিদ, সওকাত, রউফদের কথা। নিজেদের গ্রামে হাইস্কুল ছিল না। পড়তে যেতাম দু মাইল দূরে সলপ স্কুলে। স্কুলে যাবার পথে আমাদের বাড়ি ছিল 'সেণ্টার'। দক্ষিণ পাড়া থেকে আসত রশিদদের দল, আর পাশের গ্রাম রায়দৌলতপুর থেকে আসত স্নুনীলদা, কার্তিকদা, শান্তি। একসঙ্গে স্কুলে যেতাম আর একসঙ্গে ফিরতাম। গল্প গুজবে আর হাস্য পরিহাসে দু-মাইল রাস্তা কখন ফুরিয়ে যেত টেরও পেতাম না। বৈশাখের খর রোদ, আর আষাঢ়ের মুষলধারায় বৃষ্টি আমাদের কোনদিন নিরানন্দ করতে পারেনি। চৈত্র মাসের বারুণী

স্নানের দিন থেকে আরম্ভ হত আমাদের মর্ণিং স্কুল। সূর্য ওঠার অনেক আগেই রওনা দিতাম স্কুলে। শিশির ভেজা ঘাসের ওপর দিয়ে, প্রাণ জুড়োনো ঝির্ ঝিরে শীতল হাওয়ায় খোলা মাঠের মধ্য দিয়ে দলবেঁধে স্কুলে যাওযার যে কি আনন্দ ভাষার মাপকাঠি দিয়ে তার গভীরতা নির্ণয় করা চলে না। মাঠ জুড়ে সবুজের মেলার মধ্যে দেখতাম প্রকৃতির অবর্ণনীয় দৃশ্য সম্ভারের আয়োজন। স্কুল থেকে ফেরার পথে পরের গাছ থেকে ঢিল ছুঁড়ে আম পাড়ার প্রতিযোগিতা ছিল আমাদের নিত্যকার কাজ।

বর্ষায় চারিদিক যখন জলে জলময় হয়ে যেত তখন স্কুলে যেতে হত নৌকোয় করে। আমাদের ঘাটে বাঁধা নৌকোয় যেয়ে সবাই উঠতাম—প্রত্যেকের এক হাতে বইখাতা, আর এক হাতে নিজ নিজ বৈঠা। স্কুলের গাযে নৌকো ভিড়িয়ে একই সঙ্গে ঝুপ্ ঝুপ্ করে বৈঠা ফেলে উঠে যাওয়া, ফেরার পথে অন্য গ্রামের ছেলেদের সঙ্গে বাইচ্ প্রতিযোগীতা, এসব কি সহজে ভুলবার! আমাদের গ্রাম থেকে কিছু দূরে বলরামপুরের নদী। ধান-পাট কাটা শেষ হবার আগেই যাতে জল এসে সমস্ত ডুবিয়ে না দেয় সে জন্যে প্রতি বছরই নদীর মুখে তৈরী করা হয় প্রকাণ্ড একটা বাঁধ। জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি সময থেকেই আমরা দিন গুনতাম কবে বাঁধ কেটে দেওয়া হবে আর কবে আমাদের পুকুরে জল পড়বে। পুকুরে বিপুল স্রোতে জল আসত। তা ছিল আমাদের একটা বড় আকর্ষণ। হঠাৎ একদিন ভোরবেলা ঘুম ভাঙ্তেই হয়ত শুনতে পেতাম জল-স্রোতের একটানা কল্লোল, বুঝতাম পুকুরে জল পড়ছে। তখন কোথায় থাকত ভোরবেলার সুখনিদ্রা, কোথায় থাকত পড়াশুনা—ছুটতে ছুটতে গিয়ে ডেকে নিয়ে আসতাম মাখন, রবি আর কেষ্টদের। মাছ ধরার হিড়িক পড়ে যেত। জেলেরা স্রোতের মুখে বড় বড় জাল পেতে 'খরা' তৈরী করত মাছের জন্যে। মাছ ধরার সে কৌশলটি একমাত্র পূব বাঙ্লায়ই দেখেছি।

আমার গ্রামের চাষীদের কী সুন্দর সরল জীবনযাত্রা! ভোরবেলা যখন দেখতাম কাঁধে হল, আর কোচরে মুড়ি নিয়ে চাষীরদল এগিয়ে চলেছে, তখন কতদিন মনে ইচ্ছা জাগত অমনি করে ওদের সঙ্গে মাঠে যেতে! মাঠের আল ধরে কোথাও যেতে যেতে যখন দেখতাম নিড়ানি হাতে গান করতে করতে ক্ষেতের মধ্যে ওরা কাজ করে চলেছে—মন যেত তখন উন্মনা হয়ে আর নিজের অজ্ঞাতেই যেন পা দু'টো দাঁড়িয়ে যেত। যে কোন ঘটনাকে উপলক্ষ করে নিজেরাই মুখে

মুখে ওরা রচনা করত গান—আর সেই গান তারা উন্মুক্ত প্রান্তরে দল বেঁধে গলা ছেড়ে গাইত প্রচণ্ড রোদে চাষের কাজ করতে করতে। গ্রামের দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ মাঠের কথা মনে পড়লে আজও কানে বাজে সেই সুর। মনে হয় এখনো যেন সেই সুরেই ওরা গেয়ে চলেছে—

'শুনেন সবে ভক্তিভাবে কাহিনী আমার—
শিবনাথপুরের কুমুদবাবু ছিলেন জমিদার।
ছিল সে ডাঙাদার,
ছিল সে ডাঙাদার, নাম তার ছিল জগৎজুড়ে,
জ্যৈষ্ঠ মাসের ১২ই তারিখ ঘটনা মঙ্গলবারে!
ম'লো সে অপঘাতে,
ম'লো সে অপঘাতে, গেল সাথে দুনিয়ার বাহার—
তারপরে শুনেন বাবুর বাড়ির সমাচার।
বাবু যখন যাত্রা করে,
বাবু যখন যাত্রা করে গাড়িত চড়ে রওনা
হতে যায়,
টিকটিকির কত বাধা পড়ে ডাইনে আর বাঁয়!
তা শুনে ঠাইগ্‌রাণী কয়,
তা' শুনে ঠাইগ্‌রাণী কয়, বলি তোমায়
গঞ্জে যেওনা,
ঘটতে পারে আপদ বিপদ পথে দুর্ঘটনা।
স্বপ্নের কথা বুড়ী করিল বর্ণনা।'

সব কথা অবশ্য আজ আর মনে নেই। বিপর্যস্ত জীবনযাত্রায় স্মৃতিও হয়ে আসছে ধূসর। তবু জানি আজও গ্রামের সাধারণ মানুষের দল তেমনি আত্মীয়তায় আমার কথা মনে রেখেছে। মনে রেখেছে আমায় সেই রশিদ, শওকতের দল। মনে রেখেছে আজিজুল, জেলহেজভাই। তবু নাকি সে গ্রাম আর আমার নয়! আমি আজ শরণার্থী।

ঘাটাবাড়ি

পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ থেকে মাইল আঠারো দূরে একটি সাধারণ ছোট গ্রাম। ইতিহাসে প্রখ্যাতি নেই। তবুও গ্রামখানি স্বয়ংসম্পূর্ণ। নাম ঘাটা-বাড়ি। এর পাশ দিয়েই বয়ে গেছে ছোট্ট নদী আঠারদা। কয়েক মাইল দূরে কান্ত কবি রজনীকান্ত সেনের জন্মস্থান ভাঙাবাড়ি। গ্রামের ইতিহাসে যার নাম অবিস্মরণীয় তিনি হলেন রাজা বসন্ত রায়। এই বসন্ত রায় কে, তাঁর আসল পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে তাঁর সম্বন্ধে এ অঞ্চলে জনশ্রুতির অভাব নেই। পাশের গ্রামে বসন্ত রায়ের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ আজো পড়ে রয়েছে। তাঁর কালের বলে বর্ণিত বড় বড় দুটি জলাশয় 'ধলপুকুর' ও 'আন্দ পুকুর' (অন্দর পুকুর) স্বল্প জলের সম্বল নিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে আছে আজো।

বাঙলার সত্যিকারের সৌন্দর্য, তার প্রকৃতির লীলা বিকাশের পরিচয় পাওয়া যায় উত্তর ও পূর্ব বাঙলায়। পল্লবঘন বৃক্ষরাজির ছায়ায় শান্তির নীড় এক একটি গ্রাম। সেই লক্ষ গ্রামেরই একটি গ্রাম এই ঘাটাবাড়ি। গ্রীষ্মের শীর্ণ নদী সংকুচিত তীর-ভূমিতে ক্ষীণ ধারায় দিয়ে যায় তার স্নিগ্ধ শীতল পরশ। বর্ষায় ফিরে পায় তার হারানো যৌবন। নদীটির সঙ্গেও অনেক লোকপ্রসিদ্ধি জড়িয়ে আছে। ঠাকুরমার মুখে শুনেছি, ওই নদীর মাঝখানে আঠারটি বড় বড় গর্ত আছে। অনেক কাল আগে নদীতে নাকি সিন্দুক ভেসে উঠত। কেউ বলত ওর মধ্যে মোহর আছে, আবার কেউ বলতো বাসনপত্র।

আমাদের অঞ্চলটা পাটের এলাকা। এককালে সিরাজগঞ্জ অঞ্চলে নদীর ধারে ধারে সাহেবদের বড় বড় কুঠি ছিল। আজ সেই সবই যমুনার কুক্ষিগত। নদী কল্লোলে তার কোন ইংগিত আজ আর পাওয়া যায় না। আমাদের গ্রামাঞ্চলে নীলের চাষও হত। অনেক জায়গায় বিশেষ করে ঐ কুঠিপাড়ায় নীল কুঠির ধ্বংসাবশেষও পাওয়া যায়।

ছুটিতে গ্রামে যেতাম বাইরে থেকে। পুরো একদিন হেঁটে পরের দিন প্রায় বারোটা একটার সময় গ্রামের ষ্টীমার ঘাট সোয়াকপুরে পেঁৗছতাম। ঘাটে আসবার আগেই ষ্টীমারের আর্তনাদ আমাদের সচকিত করে তুলত। পাড়ে

ভিড়বার সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের মত আসত কুলীরা। কিনারায় দণ্ডায়মান নরনারীর উৎসুক মুখের মাঝখানে দেখতাম আমাদের চিরপুরাতন কর্মচারীর হাসিমুখ। শেষের পথটুকু যেতে হত গরুর গাড়িতে। সারি সারি মাল, যাত্রী বোঝাই ছোট ছোট গরুর গাড়ি। যেন মহাপ্রস্থানের যাত্রী সব। এমানী ভাইয়ের গাড়ি তৈরী থাকত আমাদের জন্যে। ছইয়ের ভেতর না বসে সব সময়েই আমি এমানী ভাইয়ের পেছনে বসতাম। জীর্ণ গাড়ির চাকার একটানা ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ শব্দ কেমন জানি মোহ সৃষ্টি করত মনে। রৌদ্ররুক্ষ ধূলিময় পথ। শীর্ণকায় গরুগুলোর মুখ দিয়ে ফেনা বেরোচ্ছে। চালকের উদ্যত লাঠি দেখে অনেক কষ্টে যেন এগুবার চেষ্টা করছে। এমানী ভাই মাঝে মাঝে হাঁক দেয়—'ডানি-ই ক্যারে, গরু নৌড় পারে না ক্যা?' গ্রামের ভেতর আকা-বাঁকা যাত্রা পথ। এ পাশে ওপাশের বাড়ি থেকে ভেসে আসছে ঢেকীর ঢপ্ ঢপ্ শব্দ। শোলার বেড়ার ওপর দিয়ে কিষাণ বৌদের উৎসুক কৌতূহলী দৃষ্টি। ক্ষেতে কর্মরত চাষীদের প্রশ্ন—গাড়ি যাবে কোনে? হায়, এ সব-ই অতীতের রোমন্থন মাত্র। কাপড়ের আড্ডা ইনাদপুর এলেই আমাদের গ্রামের কাছে আসা হল। সোজা সড়ক। দূর থেকে আমার গ্রামকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। গরুর গাড়ি থেকে নামবার সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে আসতেন জসীম কাকা। আগেই বলেছি, গ্রামটি ছোট হলেও স্বয়ং-সম্পূর্ণ। বাজার-হাট, ডাকঘর, স্কুল, খেলার মাঠ সব কিছুই সেখানে গ্রামের ধনী দরিদ্রের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আমাদের বাড়ির সামনেই ছিল ডাকঘর। দুপুর বেলায় দেখতাম গ্রামের পথ দিয়ে দেশ-বিদেশের সুখ-দুঃখের চিঠি ভর্তি থলি ঝুলিয়ে এবং ঘণ্টা বাঁধা বল্লম কাঁধে নিয়ে ছুটে চলেছে রাণার। তার ঠুন্ ঠুন্ শব্দ শুনে ছুটে আসত গ্রামের ছেলেমেয়েরা। গ্রামের হাটটিও ছিল বাড়ির খুব কাছেই। ডাকঘরের সামনের ছোট রাস্তাটি ধরে এগোলেই হাট। তার কিছু দূরে এম, ই, স্কুল। আমার পিতামহের প্রতিষ্ঠিত। আমার কাকা ছিলেন এর প্রধান শিক্ষক। সামনেই খেলার মাঠ। গ্রীষ্মের অপরাহ্নে গাঁয়ের তরুণদল সেখানে ফুটবল খেলায় মেতে উঠত। পাশ দিয়ে চলে গেছে ইউনিয়ন বোর্ডের অপ্রশস্ত সড়ক। বর্ষায় মাঠ, সড়ক সব ডুবে যেত। বর্ষাকালে গ্রামের চেহারা হয় অপূর্ব। শুধু জল, থৈ-থৈ করা জল। নৌকো ছাড়া কোথাও যাবার উপায় নেই।

ফুটবল খেলা নিয়ে গ্রামে খুব হৈ-চৈ হত। নিজেদের শীল্ড খেলা ছাড়াও

অন্যান্য গ্রামের প্রতিযেগিতার খেলায় খেলতে যাওয়া হত। বেশ মনে পড়ে মালীপাড়ার ফাইনাল খেলার কথা। আমাদের গ্রাম যখন তিন গোলে বেতিল্ল গ্রামকে হারাল তখন হিন্দু-মুসলমান গ্রামবাসীর সে কী বিজয়-উল্লাস !

বারমাসে তের পার্বণের দেশ আমাদের। অন্যান্য পুজো-পার্বণ ছাড়াও চড়ক পূজো আমাদের গাঁয়ের উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান। চৈত্র মাসে পাট-ঠাকুরের পুজো আরম্ভ হয়। পাট-ঠাকুরের আসল ইতিহাস জানি না। তবে শুনেছি শিব পূজোরই এ এক ভিন্ন প্রথা। চৈত্র-সন্ন্যাসীরা পাড়ায় পাড়ায় প্রত্যেক বাড়িতে পাট-ঠাকুর সামনে রেখে নাচ গান করে। সংক্রান্তির দিন তাঁরা মিলিত হয় খোলার কালিবাঁড়িতে। এখানে এ উপলক্ষে বসে বড় মেলা। গ্রামের ছেলে-বুড়োরা যোগ দেয় এই আনন্দ উৎসবে। সন্ধ্যায় দুজন হর পার্বতী সেজে নাচে। তারপর আরম্ভ হয় চড়ক ঘোরানো। হিন্দুর অনুষ্ঠানে মুসলমানরা সানন্দে অংশ গ্রহণ করে ; আবার তাদের অনুষ্ঠানে হিন্দুরাও তেমনি ভাবেই যোগ দিত।

আমাদের বাড়ির পূবদিকে ঠাকুর বাড়ি। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার লক্ষ্মী পূজো উপলক্ষে ওখানে হত কীর্তন গান। ঠাকুর মশাইরা একে একে সবাই গত হয়েছেন। তাঁদের ছেলে মেয়েরা অসহায় অবস্থায় পূর্ব বাঙ্‌লার পরিস্থিতিতে ঘর বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন। আজকের সন্ধ্যায় ঠাকুর বাড়িতে হয়ত আর খঞ্জনীর ঝন্‌ঝনি শব্দ শোনা যায় না। শোনা যায় না সুমধুর শঙ্খধ্বনি বা কাঁসর-ঘণ্টার বাজনা। গৃহিণীরা আজ আর কেউ হয়তো সেখানে গলায় আঁচল দিয়ে তুলসীতলায় সন্ধ্যাদীপ জ্বালে না। আমার গাঁয়ের এক এক তল্লাট জুড়ে আজ হয়ত দেখতে পাওয়া যাবে আমার মনের মতই এক একটি ফাঁকা মাঠ। কিন্তু হাসির ঝরণা ধারায় আবার কি আমার গ্রাম সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে না ?

হায়রে, পৃথিবীর গতির বুঝি পরিবর্তন হয়েছে। তা না হলে বাঙ্‌লার হিন্দু-মুসলমানের মিলনের ধারা এমনি ভাবে সাম্প্রদায়িকতার মরুতে হারিয়ে যেতে পারে ? দুঃখ-সুখের জোয়ার-ভাঁটায় তারা যে একই সঙ্গে চলেছিল। আজ সেই শান্তির জীবনে অপ্রত্যাশিত ভাবে এসে পড়েছে একদলের মনে সংশয়, মৃত্যু-ভয়। নিজের জন্মভূমিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবার অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত। আজকের এই লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ সবহারাদের দল কি পথে-প্রান্তরেই প্রাণ দেবে ? শত সহস্র বীরের রক্তস্রোত কি ব্যর্থ হবে ?

সাহজাদপুর

ঈশ্বরদী থেকে সিরাজগঞ্জ লাইনে ছোট্ট স্টেশন উল্লাপাড়া। স্টেশন ছোট হলেও কর্মব্যস্ত খুব। মেল আর এক্সপ্রেস ট্রেনের স্টপেজ। চালানী মাল, মাছ, পান, পাট—ওঠে নামে। বড় বড় ব্যাপারীর আনাগোনায় রেল স্টেশন উল্লাপাড়া সর্বদাই সজাগ।

স্টেশনের সিঁড়ি দিয়ে বাইরে নেমে গেলেই শুনতে পাবেন ঃ "আয়েন বাবু আয়েন, বলদ দেহেন দেহি আমার, যেন্ হাতিশালের হাতি—ছোটে যহন্ দেহেন যেন পংখিরাজ ঘোড়া।' এমনি একের পর এক গরুর গাড়ির চালক এসে প্রলুব্ধ করবে আপনাকে। কেউ এসে বলবে ঃ 'ছইখান্ দেহেন দেহি। অট্টেলিকা বাবু, বজ্জর পলেও খাড়া, একখানি কাবাবি নাহি খসে।'

'যাবেন কনে, সাজাদপুর? গেরাদহ? চক্ষের নিমেষে লইয়্যা যামু।'

গরুর গাড়ি ছাড়া খরার দিনে গতি নেই। যে গ্রামেই যান, মাইলের পর মাইল আপনাকে যেতেই হবে গরুর গাড়িতে উল্লাপাড়া স্টেশন থেকে।

পথ আর ফুরোয় না। চলেছে তো চলেইছে। বিরক্তি প্রকাশ করলে মাঝে মাঝে গাড়োয়ান তাড়া দেয় বলদ দুটোকে লেজ মলে। অমনি কিছুদূর পর্যন্ত বেশ জোরে ছুটে চলে গাড়ি। দু'হাত দিয়ে তখন ছইয়ের বাঁশ চেপে ধরতে হয়—ভয় হয়, গাড়ি উল্টে নীচে পাশের ধানক্ষেতে পড়ে গেলে আর রক্ষে নেই। তবে ভাবতে ভাবতেই ভয় কেটে যায়। গাড়ির গতি আবার মন্থর হয়ে আসে। উচ্চৈঃস্বরে গাড়োয়ান গেয়ে ওঠে পুরানো একটা গান ঃ 'দরদীরে, তোর ভাঙা নৌকায়··'। নানা সুরের দোল খেতে খেতে গানের প্রথম কলিটিই মাঝপথে থেমে যায়—শেষ আর হয় না। বাঁয়ের বলদটার পেটে পা দিয়ে ঠেলা দিয়ে গাড়োয়ান বলে ওঠে—ছাখ্‌, দিনি, ডাঁয়ে ডাঁয়ে···।

ছোট ছোট গ্রাম পার হতে হয় একে একে। বেতবনের আর বাঁশবনের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে টিনের চাল আর খড়ো ছাউনির আগাল চোখে পড়ে এখানে ওখানে। উৎসুক হয়ে গ্রামের মেয়ে-বৌয়েরা মুখ বার করে দেখে আর একজন আর একজনকে জিজ্ঞেস করে—কোন্ গাঁয়ে যায় রে?

গাড়োয়ান সবারই পরিচিত। হেঁকে বলে—সাজাদপুর, সাজাদপুর। কোমরে কাপড় জড়ানো, ছোট ঘোমটায় আঁট-সাট মুখগুলো মনে হয় আপন, বড় নিজের—যেন স্নেহ-মমতায়-ভরা নিজের ঘরের মা আর বোন। ইচ্ছে করে নেমে গিয়ে শুধাই—কত সুখ, কত পরিতৃপ্তির পরিবেশে ঘর বেঁধে আছ তোমরা, শোনাবে তোমাদের গল্প, বলবে তোমাদের কথা?

ঢিবি পার হয়ে ঘচাং করে নীচে নেমে আসে ঐ পংখিরাজদের গাড়ি আর পিছনে ফেলে যাই এমনি করে গ্রামের পর গ্রাম। তারপরেই দু'দিকে ধু ধু মাঠ। মাঝে মাঝে শুধু টেলিগ্রামের পোস্ট, তারা যেন বলছে—এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও, আরো আছে পথ।

একবার গভীর রাতের গাড়ি থেকে নেমে চলেছিলাম এমনি এক গরুর গাড়িতে। পথ অনেক, তাই গাড়োয়ান পোয়ালের ওপর বিছানা খুলে দিয়ে ছইয়ের খোলা মুখ দুটোয় কম্বলের পরদা টাঙিয়ে দিয়ে বললে - ঘুমায়ে পড়েন বাবু, শীতের রাত। যাবানে ধীরে ধীরে।

মাথায়-কানে গামছা জড়িয়ে ফয়েজ আলি গাড়ি চালায়। বেশ আরামে চলেছি —চোখ দুটোও বোধহয় ধরে এসেছে। চমক ভেঙে গেল ফযেজের গানে—

'আমায় শুধাস নারে, কোন্ গাঁয়ে যাই—
ও সে, কালো চক্ষের জল দেখেছি
ফুলের নূপুর পায়।
তার দীঘল চোখের কাজল
আমার অঙ্গে লাগে নাইরে···
ও ভাই শুধাস নারে···'

কি দরদঢালা গলায় ফয়েজ গেয়ে চলেছে! নিস্তব্ধ রাত—ফিকে জোছনা। ফাঁকা মাঠের হাওয়ায় বারবার প্রতিধ্বনিত হচ্ছে: আমায় শুধাস নারে······। ওদের মেঠো সুরে গলার বাঁধুনি এত সুন্দর লাগে কেন? কে ওদের শেখায় এমনি করে প্রাণঢালা গান গাইতে? আর একবার ফিরতি পথে গাড়োয়ান জমিরকে বলেছিলাম: জমির মিঞা, জানো ভাই ঐ গানটা—সেই 'তার দীঘল চোখের কাজল আমার অঙ্গে লাগে নাই রে'? সে গাইল। একেবারে ভিন্ন সুর। কিন্তু তেমনি করেই চঞ্চল করল আমার মন প্রাণ।

এই পথেই, ঠিক এই সব ঝোপঝাড় ধুলোবালির পথ পেরিয়েই বিশ্বকবি

রবীন্দ্রনাথ সাহজাদপুরের কুঠীবাড়িতে, ঠাকুর কাছারীতে গেছেন কত বার। এই কথা মনে হত বারবার উল্লাপাড়া থেকে আমার জন্মগ্রাম সাহজাদপুরে যেতে যেতে। প্রতিটি বট আর কুলের গাছ, প্রতিটি টেলিগ্রাফের পোস্ট দেখে মনে হত কবি হয়ত কখনো এদের কানে-কানে কোন বার্তা দিয়ে গেছেন অনাগত পথিকের জন্যে ? কবি এখানে আসতেন কখনো পাল্কিতে, কখনো বা হয়ত গয়নার নৌকোয়। এই কুঠীবাড়িতেই ওপর তলায় বসে তিনি লিখেছিলেন 'পোস্টমাস্টার'।

এই ঠাকুর কাছারীতেই কোন এক টিনের চালার পাটকাঠির বেড়া-ঘরে কয়েকবার আশ্রয় পেয়েছিলাম। ঘুরে ঘুরে দেখতাম সেই বাঁধানো বকুলতলা, কুঠীবাড়ির গা ঘেঁষে বড় বড় গয়নার নৌকোর আনাগোনা—বাজার-হাট, ঘাট-মাঠ-পথ, আর ঐ বিখ্যাত কাঠের পুলটা, যার মুখ গিয়ে ঠেকেছে পাটগুদামের মস্ত টিনচালার ঘরটার গোড়ায়। কত রাত অবধি আমরা দল বেঁধে কাটিয়েছি ঐ কাঠের সাঁকোটার ওপর দাঁড়িয়ে। ভারি আনন্দ হত যখন তার নীচ দিয়ে একের পর এক নৌকো চলে যেত। কোনটায় বোঝাই থাকত বাঁশ, কোনটায় তামাক, কোনটায় দুধ। জোয়ান মাঝিদের শক্ত হাতের লগি ঠেলায় সাঁৎ সাঁৎ করে বড় বড় নৌকোগুলো জলের বুকে মুখ রেখে পিছলে পিছলে এগিয়ে যেত। এক একদিন কুঠীবাড়ির লাইব্রেরীর বারান্দায় বসে বসেই রাত প্রায় কাবার করে দিতাম। মুরগী ডেকে উঠত ওপারে চাষীদের উঠোনে। তখন বাড়ি ফিরতাম।

হাটে বাজারে সর্বত্রই প্রায় বেড়ার ঘর। পাটকাঠির বেড়া, ছেঁচা বেড়া, অথবা খল্‌পার বেড়াই বেশি। ওপরে টিনের চাল। কোথাও বা বেড়ার গায়ে সুন্দর করে মাটি লেপা। পাকা দালানঘরও আছে অনেক।

ঠাকুর কাছারীর সব কর্মচারীই একটি এলাকায় বাস করেন—ম্যানেজার সায়েব থেকে দপ্তরী পেয়াদা অবধি সকলেই। কাছারীর তরফ থেকে বাসা দেওয়া হয় তাঁদের সবাইকে।

অপর্যাপ্ত দুধ আর মাছের বাজার সেখানে। ইলিশ মাছ আর দুধ যে অত সস্তা হতে পারে তা ভাবাও যায় না। লোকে বাজারে দুধ আনতে গেলে বাল্‌তি নিয়ে যেত সঙ্গে করে। ১৯৪২ সালেও এরকম সচ্ছল অবস্থা ছিল সেখানে।

বর্ষাকালে (দুর্গাপুজোর আগে অবধি) নৌকো ছাড়া যাতায়াতের উপায় থাকত না। চারদিকে থৈ-থৈ জল। গভীর রাতে বাঁশ আর বেত বনের ভেতর দিয়ে ছপ্ ছপ্ শব্দে বৈঠা ঠেলে ঠেলে ছোট-বড় নৌকোগুলো যেত-আসত। হাটের দিনে সেই যাতায়াত প্রায় সারারাতই লেগে থাকত। নৌকোর ওপরই রান্না করছে মাঝিরা, সেইখান থেকেই হাঁড়ি বাসন ধুয়ে নিচ্ছে, সেইখানেই আহার সারছে। জলেই যেন ওদের ঘরকন্না। একবার একটানা পাঁচ দিন রইলাম এই নৌকোর ঘরে। পাবনা জেলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ালাম। কত বিচিত্র পথে আনা গোনা—তার শেষ নেই। হ্যারিকেন লণ্ঠন নৌকোর মাথায় তুলে দিয়ে ছইয়ের ওপর উঠে বসে রাত্রের অন্ধকারে মাইলের পর মাইল যাও—চারদিকে জলরাশি—কোথাও বা উঁচু—কোথাও নীচু। যেসব হাঁটাপথে একবার হেঁটে গেছি তারই বুকের ওপর দিয়ে জলরাশি ভেদ করে নৌকোয় যেতে সে কি আনন্দ! নিশুতি রাত। তবু বহুদূরের নৌকোর ডাক স্পষ্ট শোনা যায়। তার বহুক্ষণ পরে তার মাথায় টিম্‌টিম্ আলো দেখা যায়। সহযাত্রী জোটে। দুই নৌকো পাশাপাশি চলে। তীরের ওপর দিয়ে দুজন হয়তো বা গুণ ধরে চলে। জলের ভেতর পা দুটো ডুবিয়ে বসে শুনি ওদের গলাছাড়া গান :

'ও কালা শশীরে
আর বাজায়ো না বাঁশি—
বাঁশি শুনিতে আসি নাই আমি,
জল নিতে আসি ··।'

গলার অত জোর, অথচ মিষ্টত্ব নষ্ট হয় না—প্রাণঢালা দরদ মেশানো গান।

বড় বড় গয়নার নৌকো জোড়া জোড়া ঢাক পিটিয়ে চলে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। আট, দশ, পনের, কুড়ি মাইল—একটানা পথ। ঢাকের গগন-ভেদী শব্দে জানা যায়—গয়নার নৌকো চলেছে। ভেতরে শুয়ে বসে বহুযাত্রী একসঙ্গে যেতে পারে। কি শক্ত গড়ন—যেন লোহার তৈরী এই নাও।

দুর্গাপুজোর মতই সরস্বতী পুজো এদিকে মহাসমারোহে হত। সেই সময় বসত গানের আসর—দূর-দূরান্তর থেকে আসতেন নানা গুণীজন। সাহিত্য সভায় বাঙলাদেশের স্বনামধন্য অনেকেই আসতেন। যেবার অনুরূপা দেবী সভানেত্রী, সেবার আমি ছিলাম উপস্থিত। নাচ, গান, কবিতা প্রতিযোগিতা লেগে থাকত তখন প্রায় প্রত্যেকটি সন্ধ্যায়।

পাবনা জেলার সাহজাদপুর, জামিরতা, পরজনা, বাঘাবাড়ি—এদের আরেক রূপ দেখেছি পঞ্চাশের মহামন্বন্তরে। কোথায় ছিল এত লোক? এই নরকংকালের দল? একটু ফ্যানের জন্যে ঘুরে বেড়াত ওরা বেড়ার গায়ে গায়ে। যে বাড়িতে ছিলাম, সেই বাড়িতে রাত্রে রান্নাঘরে ধরা পড়ল একটি চৌদ্দ পনের বছরের ছেলে। অনেক লোকজন চোর মনে করে লাঠি সোঁটা নিয়ে ছুটে এল —ভাতের হাঁড়ি থেকে দুই হাতে ভাত তুলে মুখে দিচ্ছে ছেলেটা—এতটুকু ভয় বা উদ্বেগ যেন তার নেই।

যে সব মাঠে সোনার ফসল ফলেছে একদিন, সেই ধানক্ষেতেই বহু নরকংকাল পড়ে থাকতে দেখেছি এখানে ওখানে। চোখের সামনে খিদের জ্বালায় মানুষকে মরতে দেখেও মানুষ নিজের অন্নের ভাগটুকু সামলে রেখেছে। আগে যাকে দেখেছি ঘরের বৌ, সন্তানের মা, পচা ময়লা ঘেঁটে খাদ্যের সন্ধানে তাদেরও ঘুরে বেড়াতে দেখলাম। পরিচয় থাকা সত্ত্বেও কথা বলেনি তারা—শুধু জ্বলন্ত চোখ তুলে এক দৃষ্টে চেয়ে থেকেছে। বেশিক্ষণ সে-দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে সাক্ষাৎ ভগবানও বুঝি ভয় পাবেন!

কাছারী বাড়ির ওপারেই কামারের ঘর। দিনভর ভারী হাতুড়ির ঠোকাঠুকি লেগেই আছে। কখনো গরুর গাড়ির চাকায় লোহার বেড় লাগানো, কখনো কোদাল-কুড়ুল-দা-খোন্তা তৈরী হচ্ছে। কামার বলেঃ ঠাউর, আইচেন কন্ থিয়্যা?

শুনি ওদের কাজকর্মের কথা।

বিখ্যাত ছিল সূর্যরায়ের হোটেল। পাবনা জেলার গেজেট বলা হত ওকে। গ্রাম-গ্রামান্তরের খবর পাওয়া যেত সেখানে গেলে। কত জায়গার লোক এসে জোটে। সন্ধ্যার পর প্রত্যহ জমে মজলিশ—গল্পের, তাসের আর দাবার। হাটবাজার বন্ধ হয়ে গেলে সূর্যরায়ের হোটেল জমে ওঠে।…

আজো হয়ত সেই আড্ডা জমে, গয়না নৌকোর ভিড় জমে নদীতে, গাড়োয়ান সেই রকম উদাত্ত গলায় গান গেয়ে যায়, শুধু আমরা আর সে আড্ডায় যোগ দিতে পারি না, সেই গান শুনতে পাই না। র‍্যাডক্লিফের কুড়ুলের ঘায়ে সাহজাদপুর যে আজ আলাদা হয়ে গেছে! মায়ের সঙ্গে ছিঁড়ে গেছে আমার যোগ।

॥ কুষ্টিয়া ॥

শিলাইদহ

প্রমত্তা নদী পদ্মা। জলকল্লোলে প্রাণের জোয়ার, প্রাচুর্যের প্লাবন। সে প্লাবনে দু' তীরের গ্রামের মানুষদের অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। তাই গ্রামবাসীরা বড় দুঃখে প্রাণ-প্রবাহিনী পদ্মাকে নাম দিয়েছে কীর্তিনাশা। শুধু ধাও, শুধু ধাও, উদ্দাম উধাও। এই উদ্দামতার অত্যাচার সন্তানের আব্দারের মতই যেন সহ্য করে এসেছে আমার জননী, আমার প্রিয় জন্মভূমি শিলাইদহ। জনশ্রুতি আছে শেলী নামে একজন কুঠীয়াল সাহেবের নামানুসারেই গ্রামের নামকরণ হয়েছে শিলাইদহ। নদীর ধারে তাঁর কবরটি অনেকদিন পর্যন্ত গ্রামবাসীর কৌতূহল মিটিয়ে এসেছে। দুরন্ত পদ্মা এখন তা গ্রাস করে নিয়েছে। এমনি করে মানুষের কীর্তি নাশ করেছে পদ্মা একদিকে, আবার অন্যদিকে নতুন কীর্তি গড়ে তোলার কাজে অকৃপণ সহায়তাও করেছে। কিন্তু আজ পদ্মাতীরের মানুষ পদ্মাকে ছেড়ে এসেছে যে দুঃখে, পদ্মা নিজেও ততখানি দুঃখ দেয়নি কখনো। এ দুঃখের মূল পদ্মা নয়, মানুষের জাতভাই মানুষ।

হাজার গ্রামের মধ্যে শিলাইদার এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল না যার জন্যে বাঙলা দেশের মানুষ তাকে মনে রাখতে পারে। কিন্তু সে বিশিষ্টতা দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সোনার তরীর যুগে অনেক কবিতা রচনা করেছেন এই শিলাইদার কোল-ছোঁয়া পদ্মার বোটে বসে বসে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়িরই জমিদারীর অন্তর্গত ছিল এই শিলাইদা।

গ্রামের মাটির স্পর্শ ভুলতে পারি না। ভুলতে পারি না দুকূল-প্লাবিনী পদ্মাকে। বেশ বুঝতে পারছি আজকের এই পরমাশ্চর্য সকালের রোদে নদীর ওপারের ঝাউ গাছের দীর্ঘ সারির ফাঁক দিয়ে রোদের ঝলক সারা শিলাইদার গায়ে লুটিয়ে পড়ছে। নদীর ওপরে গাঙচিলগুলো মাছের লোভে চরকির মত ঘুরপাক খাচ্ছে। আর জলের বুকে নৌকো বেয়ে চলেছে পদ্মানদীর মাঝিরা। কোলকাতার এই মধুবংশীয় গলির প্রায়ান্ধকার কুঠুরীতে কোন রকমে মাথা গুঁজে

আজ অনুভব করছি শরতের প্রাক্কালে পদ্মা-স্নাতা শিলাইদার প্রকৃতি ও পরিবেশ। অকাল বর্ষণে নদী পদ্মার যৌবনমদিরতা হয়ত এখনো শেষ হয়নি। হয়ত জলতরংগ এখনো তেমনি প্রবলতায় আছড়ে পড়ছে শিলাইদার ছু'তীরে। সে কূলভাঙা ঢেউয়ের শব্দে কত রাতে ঘুম গেছে ভেঙে। কত ঝড়ের রাতে পদ্মানদীর মাঝিদের হাঁকাহাঁকিতে সচকিত হয়ে উঠত আমার কিশোর মন। ভাবতাম এই দুরন্ত, দুর্বার পদ্মার বুকে ভগবান যে মানুষদের জীবন-সংগ্রামে ঠেলে দিয়েছেন তারা যেন প্রকৃতির পরিহাসকে অনায়াসে ভ্রুকুটি দেখিয়ে এই দুর্দম ঝড়ের মধ্যেও নদী পারাপার করছে। এ শক্তি মানুষ অর্জন করেছে নিজেদের বাঁচবার অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে। কিন্তু সেই মানুষেরাই আবার আত্ম প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ভুলে গিয়ে আত্মধ্বংসী সংগ্রামে কি করে মেতে ওঠে?

পুজো এগিয়ে আসছে। প্রতি বছরই এ সময়টাতে শিলাইদা যাবার জন্যে মন উন্মুখ হয়ে উঠত। কুষ্টিয়া ষ্টেশনে নামলেই মন এক অপরিসীম আনন্দে ভরে যেত। সামনে গড়াই। নৌকো দিয়ে গড়াই নদী পার হয়ে গিয়ে পেঁছুতাম কয়াতে। আর দূর নয়। আর মাত্র তিন মাইল হাঁটাপথ। ছু'পাশে অতি পরিচিত আমবন, বাঁশঝাড়ই আরো কত বনলতার শ্যামল স্নিগ্ধ স্পর্শ। ভাঙা রাস্তা। তার ওপর দিয়ে আবার রহিম ভাইয়ের গরুর গাড়ির অত্যাচার। তবুও কোলকাতার পীচঢালা রাস্তার চেয়ে সে পথকেই আপন বলে জেনেছি, সে পথ যে আমার গ্রামের ভিটার সন্ধান দিত আমাকে। বর্ষাকালে জল, শীতকালে ধুলো। তবু যেন কী এক প্রশান্তি সারা মন জুড়ে থাকত সে পথে চলবার সময়, তা আজ বোঝাই কি করে? পথ-চলতি মানুষদের সুবিধার জন্যে ঠাকুরবাড়ির লোকেরা পথের ছু'পাশে অনেক বাবলা গাছ লাগিয়ে দিয়েছিলেন। কয়া থেকে কুঠীবাড়ি, কুঠীবাড়ি থেকে শিলাইদহ কাছারী পর্যন্ত এই বাবলা গাছের সারি। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি বিজড়িত সে বাবলা শ্রেণীকে কোনদিনইতো ভুলতে পারব না। গাছ-গুলোকে দেখলেই মনে হত যেন আপনার ছত্র-ছায়ায় আশ্রয় দেবার জন্যে দূর দেশের প্রবাসী সন্তানদের পথ চেয়ে ব্যাকুল আগ্রহে তারা অপেক্ষারত। শুধু গাছ নয়, পথিকদের সুবিধার জন্যে ঠাকুর পরিবারের কর্তারা রাস্তার পাশে একটি বড় পুকুর ও টিউবওয়েল খনন করিয়ে দিয়েছেন। বাড়ি যাবার পথেই কত কুশল প্রশ্ন। কেউ বলে: বাবু কখন আসতিছেন? কিছুদূর যেতেই আবার প্রশ্ন: আপনি বাড়ি আসেন না কো? আপনের মা আমার কাছে কত প্যাচাল পাড়েন!

বাড়ি গিয়ে হয়তো শুনি ও লোক অনেকদিন আসেইনি আমাদের বাড়ি। তবু সহজ আন্তরিকতায় কুশল প্রশ্ন করতে কার্পণ্য করে না কেউ। হয়তো বলি: তা তোমাদের দেখবার জন্যেই তো এতদূর থেকে এলাম।

'তা কয়েকদিন আছেন তো? কাইল আমার খাজুর গাছ নাগাইছি। আপনের জন্যে এক হাড়ি রস দিবার মন করি।'—কোথা থেকে ছুটে এসে জিজ্ঞেস করে জব্বর। কাছারীর গরুর গাড়ির গাড়োয়ান জব্বর মুন্সী। ওর বাড়ির সামনা দিয়ে যেতে দেখলেই জোর করে নিয়ে যাবে বাড়িতে। কিছু না খাইয়ে কিছুতেই আসতে দেবে না। এমনি মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল সবার সঙ্গে।

বাড়ি থেকে আধ মাইল দূরে খোরশেদপুর এম, ই, স্কুল। এই স্কুলেই বিদ্যা শিক্ষার হাতে-খড়ি আমার। খোরশেদপুরের স্কুলজীবনে মাত্র তিনদিন স্কুল পালিয়েছিলাম। বড় রাস্তা ছাড়া একটা জংগলের পথেও স্কুলে যাওয়া যেত। এই জংগল সম্পর্কে নানারকম জনশ্রুতি রয়েছে। ভূতের বাড়ি বলে ছিল এর পরিচয়। বলা বাহুল্য কোনদিন ভূত কিম্বা ভূতের বাসস্থানের আমরা সাক্ষাৎ পাইনি। স্কুল পালিয়ে ক্ষেত থেকে মটরশুটি চুরি করে এনে বনের ভেতর গাছতলায় বসে বসে খেতাম। একদিন ধরা পড়ে যাওয়ার পর আর স্কুল পালাইনি। মাঝে মাঝে আবার শিকারে বের হতাম। কোনদিন নদীর ধারে খরগোস শিকারের আশায়, কোনদিন দক্ষিণ দিকের জংগলে বাঘের বাচ্চা ধরবার উদ্দেশ্যে মহড়ায় বের হতাম। কিন্তু কোনদিন একটা ফড়িংও ধরতে পারিনি। এমনি সব অদ্ভুত খেয়ালে পাঠ্যজীবনটা কাটিয়েছি বেশ। একবার আমার আর দেবুর মাথায় খেয়াল চাপলো যে ডাকাতি করে গরীবদের দান করতে হবে। যে কথা সেই কাজ। খেলার ছোট পিস্তলটি নিয়ে রাত দশটার সময় বাইরের ঘর থেকে চুপি চুপি বেরিয়ে পড়লাম আমি আর আমার লেপ্টেনাণ্ট দেবু। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারিনি। পাশের বাড়িতেই প্রথম মহড়া দিতে গিয়ে কি যে নাকাল হয়েছিলাম সে করুণ কাহিনী প্রকাশ না করাই ভাল। অবশ্যি এমনি সব বুদ্ধি হত ডিটেকটিভ বইয়ের নানা আজগুবি গল্প পড়ে।

কিশোর জীবনের এই রূপকথার রাজ্যে মূর্তিমান বাস্তব ছিলেন গফুর মাষ্টার। আমার জন্মের পূর্ব থেকেই গফুর মাষ্টার আমাদের গৃহ-শিক্ষক। দাদা-দিদিদের হাতেখড়ি দিয়েছেন তিনিই। কোলকাতায় এসে অনেক কৃতবিদ্য

শিক্ষকের কাছ থেকে শিক্ষালাভ করে ধন্য হয়েছি, কিন্তু কোনদিন গফুর মাষ্টারকে ভুলতে পারিনি। কোলকাতার পথে চলতে চলতে রেডিওতে একটা গান শুনলাম : 'নীলনবঘন আষাঢ় গগনে তিল ঠাঁই আর নাহিরে। ওগো তোরা আজ যাসনে ঘরের বাহিরে।' গানটা শুনে আমার মন চলে গেল অনেক দূরের স্মৃতির রাজ্যে, শিলাইদার এক প্রান্তে কোন এক মুগ্ধ কিশোর মনের চিত্র সেটি। ঢল নেমেছে পদ্মার দু'তীরে। সারাটা আকাশে কে যেন কালি ঢেলে দিয়েছে। পূর্ব দিকের জানালাটা খোলা। মনে পড়ল রবীন্দ্রনাথ এমনি দিনেই হয়ত এখানকার পদ্মার বোটে 'সোনার তরী' আর 'খেয়া'র কবিতাগুলো রচনা করেছিলেন। সেদিনও আকাশ হয়তো এমনি মেঘাবৃত ছিল। সেই মেঘমেদুর অম্বরের প্রান্তঘেষা তাল-তমাল বন লক্ষ্য করে একদিন, সে বহুদিন আগে, আরও একজন কবি 'শতেক যুগের গীতিকা'য় সুর সংযোজন করেছিলেন। মন তখন অতীতমুখর। শুনতে পেলাম পদ্মানদীর মাঝি সুর ধরেছে : 'কূল নাই, কিনারা নাই, নাইকো গাঙের পাড়ি, সাবধানেতে চালাইও মাঝি আমার ভাঙা তরী।' সে দিন আর বুঝি ফিরে আসবে না!

রবিবার আর বুধবার এই দু'দিন বাজার বসত গ্রামে। বাকী পাঁচদিন গোপীনাথ দেবের মন্দিরের সামনে বসে বাজার। বাজারের পাশ দিয়েই পদ্মা প্রবাহিতা। চৈত্র-বৈশাখ মাসের পদ্মা আর বর্ষাকালের পদ্মা যেন আকাশ-পাতাল তফাৎ। পদ্মার এই দুটো রূপকেই আমি ভালবাসি। দারুণ গ্রীষ্মের দাবদাহে পদ্মা নিস্তেজ হয়ে পড়ে। আবার বর্ষার কালোমেঘ দেখলেই পদ্মা যেন উন্মাদের ন্যায় উত্তাল তরংগ ভেঙে দুর্বার হয়ে ওঠে।

এই আমার শিলাইদা। আজ তার পরিচয় দিতে গিয়ে কেবলই মনে হচ্ছে শিলাইদহে জন্মগ্রহণ করে আমি ধন্য হয়েছি। রবীন্দ্রনাথ এই শিলাইদহকে খুব ভালবাসতেন। এখানকার কুঠিবাড়িটি ছিল তাঁর নিজস্ব। এখানে থাকতেই তিনি 'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজী অনুবাদে হাত দেন। এখান থেকে কিছু দূরেই স্বর্গত সাহিত্যসেবী জলধর সেনের বাড়ি কুমারখালি। সব স্মৃতির বন্ধনই অটুট আছে, কেবল দেশের ব্যবধান গেছে বেড়ে। তবুও আমি শিলাইদহকে ভুলতে পারি না। মনে হয় আবার আমার গ্রামকে ফিরে পাব, ফিরে পাব গফুর মাষ্টার, জব্বর মুন্সী সবাইকে। সে দিন আর কতদূর?

ভেড়ামারা

'পথে যেতে ডেকেছিলে মোরে।
পিছিয়ে পড়েছি আমি, যাব যে কী করে ॥
এসেছে নিবিড় নিশা, পথরেখা গেছে মিশি ;
সাড়া দাও, সাড়া দাও আঁধারের ঘোরে ॥'

কবিগুরুর গানটি আজ আমাদের মনের কথা ব্যক্ত করছে। পথের ডাককে অগ্রাহ্য করতে না পেরে আজ আমরা মৃত্যুর পথে নিরুদ্দেশযাত্রা করেছি অন্ধকার নিশিতে। অপটু চরণ ক্লান্তিতে পড়েছে ভেঙে, পথরেখা মুছে গেছে সম্মুখ থেকে, ফলে জীবনযাত্রায় আমরা পড়েছি পিছিয়ে,—এ সময় এমন একটি ধ্রুবতারারও সন্ধান পাচ্ছি না, যার আলোর নির্দেশে আমরা এগিয়ে গিয়ে নির্বিঘ্নে জীবনে হব সুপ্রতিষ্ঠিত। আমরা মায়ের কোল থেকে ছিটকে পড়েছি দূরে। শস্যশ্যামলা গ্রাম্য পরিবেশ ছেড়ে রুক্ষ শহুরে আবহাওয়ায় যেন শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। ললাটে জন্মভূমির কোমল স্পর্শের জয়তিলক নিয়ে জন্মের প্রথম শুভক্ষণে কান্নার সুরে 'মা-মা' বলে আশ্রয় প্রার্থনা করেছিলাম একদিন, আজ জীবনমধ্যাহ্নে কাঁদতে কাঁদতে আবার আশ্রয় প্রার্থনা জানাচ্ছি দেশজননীকে। সেদিন পেয়েছিলাম গ্রাম-জননীর কোল, আজ তাঁর কাছ থেকে বিতাড়িত। সেদিন আর এদিনের মধ্যে পার্থক্য অনেক, আজ আমার চলার পথে কাঁটা, শ্বাস-প্রশ্বাসে নাগিনীর সুতীক্ষ্ণ বিষ! দ্বীপান্তরিত লাঞ্ছিত জীবন নিয়ে সর্বদাই বিব্রত। কেবল নিজের চিন্তায় সব সময় বিভোর। তবুও মন পড়ে আছে সেই সুদূরে হারাণো মায়ের কোলে, পল্লীর ছোট্ট কুটিরে, আমার গাঁয়ের শ্যামঘন নীলাকাশে। সে সব দিনকে আজ দিকচক্রবালে স্বপ্নের মত মনে হয়। জানিনা দেশজননী আবার মা-জননীর মত কোলে ঠাঁই দেবেন কিনা, আবার আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ পাব কিনা!

জীবনের ওপর বিতৃষ্ণা এলেই চোখের সামনে ছবির মত ভেসে ওঠে আমার গ্রামখানি। আমার গ্রাম ভেড়ামারা আমার কাছে অতুলনীয়, বার বার গ্রামের নাম উচ্চারণে শান্তি পাই মনে। মনের কোন গোপন কোণে সেই 'ভেড়ামারা' নামটি বোধহয় খোদাই হয়ে আছে, না হলে আজ এত দুঃসময়ের মধ্যেও তাকে

এত নিবিড় ভাবে মনে পড়ে কেন ? কেন তাহলে এই অজ্ঞাত অখ্যাত গ্রামটির তুলনা খুঁজে পাই না ? কেন সেই 'শান্তির নীড় স্নিগ্ধ সমীরে'র কথা চিন্তা করলে চোখ জলে ভরে আসে ? আজ ভেবে আশ্চর্য লাগে আমার গ্রাম আমার কাছে কেন বিদেশ হয়ে গেল এক রাত্রির মধ্যে ? প্রাণচাঞ্চল্যে ভরা গ্রামখানি কেন হঠাৎ লক্ষ্মীছাড়া হয়ে গেল ?

আমার গ্রাম পূর্বে ছিল নদীয়া জেলায়, আজ হয়েছে কুষ্টিয়া জেলার কুক্ষিগত। আগে এই কুষ্টিয়াও ছিল নদীয়া জেলারই একটি মহকুমা। এককালে একটি ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল আমার গ্রাম। কোলকাতার পণ্যেব বাজারে তাই ভেড়ামারার একটি নির্দিষ্ট স্থান ছিল বাঁধা। একদিন এখান থেকেই পাট আর পান রপ্তানী হত ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে রেল-ওয়াগন ভর্তি হয়ে। ইলিশ মাছও বাদ যেত না সে তালিকা থেকে। মাইল তিন চার উত্তরে পদ্মা নদীর ধারে 'রাইটা' থেকে বরফ দিয়ে মাছের সেরা ইলিশ মাছ আসত ভেড়ামারা স্টেশনে বিভিন্ন স্থানে রপ্তানী হবার জন্যে। বৃদ্ধদের মুখে শুনেছি একদা এখানে নাকি বাইশ তেইশটি ইলিশ মাছ মিলত, এক টাকায়। কুটুম্ববাড়ি যেতে হলে তাঁরা এক টাকার ইলিশ মাছ কিনে নিয়ে যেতেন মুটের মাথায় চাপিয়ে ! সেই মাছ অবশ্যি শুধু কুটুম্বরাই খেতেন না, আশেপাশের আরও অনেকেই রসাস্বাদন করতেন তার। আমরা অতটা না দেখলেও তার খানিকটা আভাস পেয়েছি। খাদ্যদ্রব্য খুব সস্তাই ছিল এখানে, আজ আর অবশ্যি সেদিন নেই। এখন সব কিছুই অগ্নিমূল্য। এখন মাছ থাকলে তেল থাকে না, তেল থাকলে মাছের অভাব ঘটে। সেদিনের রাম যখন নেই, তখন অযোধ্যার অন্বেষণ করা বৃথা। কেন হল এই দৈন্য ? গরীব মানুষের কি সুবিধে হয়েছে দেশ-দ্বিখণ্ডিত হয়ে ? দেশমাতার অংগচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে দেশের মানুষেরও যে অংগচ্ছেদ হয়েছে সেকথা মোটেই আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। আগেকার কথা ভেবে তাই অস্থির হয়ে পড়ি সময় সময়, কিন্তু আমার অস্থিরতার মূল্যই বা কি ? চেষ্টা করলে পারি না কি আমরা আবার এক হতে ? পারি না কি দেশের বুকের ওপর যে শ্বাসরোধক প্রাচীরটা তোলা হয়েছে তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে ? পারি না কি আবার আমরা পরস্পরকে বিশ্বাস ভরে আলিংগন করতে ? কাকে ছেড়ে কার চলবে ? তবে কেন সমস্ত মানবিক গুণকে বিসর্জন দিয়ে আমরা সাম্প্রদায়িক দৈত্যের দাসত্ব করব জীবনভোর ?

গ্রামে বাস করার কোন অসুবিধেই ছিল না। সরকারী হাসপাতাল, হাই স্কুল, থানা, স্টেশন, নদী ইত্যাদি কোন কিছুরই অভাব ছিল না। আশ্বিন-কার্তিকমাসে গ্রামখানিতে যেন লক্ষ্মীশ্রী ফুটে উঠত। সবদিকে ব্যস্ততা। সে সময় এত পাট আমদানী হত যে পাটের কাঁচা গন্ধে বাতাস হয়ে উঠত ভারী। একমাত্র পাটকে কেন্দ্র করেই লক্ষলক্ষ টাকার আদান-প্রদান চলত প্রতিদিন। কলে পাট চাপানো হত—সেই সময়ে কুলিদের সমস্বরে গাওয়া খুশিভরা বিচিত্র 'হো-আই-লো' গানের সব টুক্‌রো টুক্‌রো কলি আজো সময় সময় কানে এসে বাজে যেন। অন্য সময় চাল-ধান, ছোলা-মটর আর পানের ফলাও কারবারে ব্যবসায়ীরা থাকতেন ব্যতিব্যস্ত। লক্ষ্মীর ধ্যানে সকলেই থাকতেন মশগুল, অন্যদিকে মন দেবার তেমন অবসরই থাকত না কারো। দুঃখ হয় সেদিনের কথা ভেবে, কোথায় গেল সেই মধুভরা দিনগুলো!

মনে পড়ে 'পুণ্যাহে'র সময় জমিদারের কাছারীতে সে কি খাওয়া-দাওয়ার ঘটা! আকণ্ঠ চব্য-চুয্য-লেহ্য-পেয়ের পর বাড়ি ফিরতাম শোলার একটা মালা গলায় দিয়ে। এই 'পুণ্যে'র আসরে কোনদিন জাতিভেদ দেখিনি। হিন্দু প্রজা, মুসলমান প্রজা সমান উৎসাহের সঙ্গেই জমিদার বাড়িতে খেয়ে এসেছে, গল্প-গুজবে মশগুল হয়ে একই সঙ্গে ফিরে এসেছে আপন আপন বাড়িতে। জানিনা হঠাৎ সেই মধুর সম্পর্কের মধ্যে কি করে ফাটল ধরল, 'পুণ্যে'র মধুর বন্ধনে পাপের প্রবেশ ঘটল কখন কি করে!

আমাদের বাড়ির সামনেই বসত হাট। সপ্তাহে দুদিন। মনিহারী, জামা-কাপড় থেকে শুরু করে মাটির হাঁড়ি, কলসী, মশলা প্রায় সব কিছুই পাওয়া যেত হাটে। তরিতরকারী এবং মাছ-মাংস তো বটেই। গ্রামের হাটের সঙ্গে কোথায় যেন একটা বিরাট পার্থক্য আছে শহরের বাজারের। হাটের সঙ্গে গ্রামের অতি সাধারণ মানুষেরও একটা সুনিবিড় সম্পর্ক আছে। তেমন সম্পর্কের কোন হদিস মেলে না শহুরে বাজারে। আমাদের গ্রাম্য হাটটি তাই ছিল একাধারে মিলনক্ষেত্র এবং শিক্ষাক্ষেত্র। সপ্তাহে দুদিন কেনাকাটা করতে যেয়ে সঙ্গে সঙ্গে দূরগ্রামের লোকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতও হয়ে যেত হাটে। আমরা জিনিস কেনার জন্যে যত না হাটে গেছি তার চেয়ে বেশী গেছি বন্ধুজন ও আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে চাক্ষুষ আলাপের জন্যে। এই যে আমাদের গ্রামকেন্দ্রিক আত্মীয়তাপূর্ণ মন তা বিনষ্ট হল কেন? সেই সুন্দর পল্লীজীবন, সেই গোচারণ ক্ষেত্র,

সেই মর্মরায়মান বেণুকুঞ্জ কোন্ পাপে আমাদের জীবন থেকে নির্বাসিত হল কে জানে! পল্লীজীবনের সুস্নিগ্ধতা, সরলতা আর বনপ্রান্তরের সৌন্দর্য ও পাখির কাকলী দিয়ে যে জীবন ছিল ঘেরা সে জীবন কি আবার ফিরে পেতে পারি না? পল্লীগ্রামগুলো বাঙালীর জাতীয় জীবনের মূল আশা এবং আশ্রয়স্থল। সেই পল্লী থেকেই আমরা হলাম বিচ্যুত! কিন্তু আমাদের কি দোষ?

আজ বেশী করে মনে পড়েছে 'মায়ের বাড়ি'র কথা। গ্রামবাসীর প্রাণ-কেন্দ্র হিসেবেই ধরা হত 'মায়ের বাড়ি'কে। এখনো পর্যন্ত সেই 'মায়ে'র কথা চিন্তায় এলেই আপনা আপনি কপালে হাত দুটি উঠে প্রণামের মুদ্রায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। বিনা প্রণামে মায়ের কথা বলা ভেড়ামারার লোকেরা চিন্তাই করতে পারে না। দুর্গাপূজো হত এখানে অত্যন্ত ধুমধামের সঙ্গে। মানতের চিনি-সন্দেশের যে হাঁড়ি পড়ত তার সংখ্যা নির্ণয়ে ফুরিয়ে যেত ধারাপাতে শেখা যত সংখ্যাসমষ্টি! এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত শ্রেণীবদ্ধ হাঁড়ির সারি দেখে শৈশবে বিস্ময়াবিষ্ট হতাম। সারা বছরের মানত শোধ করা হত এই পুজোর সময়। পাছে গোলমাল হয়ে যায় এই ভয়ে প্রতিটি হাঁড়ির গায়ে খড়ি দিয়ে স্পষ্টাক্ষরে নাম লেখা থাকত গৃহস্বামীদের। ছোট গ্রামখানির বুকে পুজোর কটাদিন ধরে চলত জীবনের জোয়ার। দূর দূরান্তরের নরনারীরা আসত মেলা দেখতে, বিগ্রহ দর্শন করতে, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে। একই সঙ্গে পুজো দেখা, আত্মীয়দর্শন এবং জিনিসপত্র কেনাকাটার সুযোগ পল্লীগ্রামে বড় বেশী আসেনা, তাই দর্শনার্থীর প্রাচুর্য চোখে লাগার মতই হত। আজো সেইদিনকার ছবি স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠছে চোখের সামনে। কী সুন্দর গ্রামবাসীদের হাসিখুশিমাখানো মুখগুলো, তাদের ত্বরিৎ চরণধ্বনি, বিশ্রাম ও ব্যস্ততায় হিল্লোলিত অপূর্ব জীবনছন্দ! মনে হচ্ছে যেন দেখতে পাচ্ছি মা দুর্গার সামনে করযোড়ে অঞ্জলি দেওয়ার দৃশ্য—শুনতে পাচ্ছি বৃদ্ধ পুরোহিত মশায়ের উদাত্ত কণ্ঠের মন্ত্রপাঠ :

"অন্ধ্যং কুষ্ঠংচ দারিদ্র্যং রোগং শোকংচ দারুণম্।
বন্ধুস্বজনবৈরাগ্যং হরমে হরপার্বতি।"

দুর্গাপুজো সমগ্র বাঙলারই পুজো। সেখানে জাতি ভেদের কথা ওঠে না। পুজোর সময় সারা গ্রামে একটা জাতিই চোখে পড়ত তা হল মনুষ্যজাতি। সেইজন্যেই অঞ্জলির পর প্রসাদ গ্রহণের ব্যস্ততা দেখেছি শুধু হিন্দুদের মধ্যে নয়,

মুসলমান ভাইদের মধ্যেও। অস্থিমজ্জায় এই যে একাত্মবোধ সেদিন ছিল তা কোথায় গেল আজ? সেদিন তো দেখেছি হর-পার্বতী বা উমাকে নিয়ে যে গান হত তাতে উমার দুঃখে কত মুসলমান ভাইবোনও অশ্রু বিসর্জন করেছেন। আমাদের ব্যথায় তাঁদের চোখে আজ আর তেমন জল আসে না কেন? আজ কি সম্প্রদায় হিসেবে দুঃখ দুর্দশাও বাটোয়ারা হয়ে গেছে? মানুষের মনে কতখনি ক্লেদ জমলে এমনটি হতে পারে তার বিশ্লেষণ অপ্রয়োজনীয়! এই যে বিভেদ, এই যে কুশ্রীতা এর সমাপ্তি না ঘটলে ভবিষ্যতে আমাদের কপালে আরো দুঃখ জুটবে। দুঃখময় জীবনকে আরও তমসাছন্ন করার মধ্যে আর যাই থাকুক বাহাদুরী নেই। একতা না ফিরিয়ে আনতে পারলে অস্তিত্ব পর্যন্ত আমাদের বিপন্ন হতে পারে। আমরা কি আবার সেই ঐক্যবোধ ফিরিয়ে আনতে পারি না?

ভুলতে পারছিনা ঝুলনের সময় ঠাকুরবাড়ির যাত্রাগানের কথা। সেদিনটি যেন ছিল সমস্ত গ্রামবাসীর জীবনের একটি পরম লগ্ন। সারাবছরের প্রতীক্ষার পর আসত ঐ দিনটি। আমার বয়েস ছিল অল্প, তাই উৎসাহও ছিল অনন্ত। সন্ধ্যা না হতেই খেয়েদেয়ে ঠিকঠাক হযে যাত্রার আসরে চলে যেতাম। জায়গা না পাবার ভয়ে অভিনয়ের বহু পূর্বেই জায়গা সংগ্রহ করে উদগ্র প্রতীক্ষায় বসে থাকতাম সমস্ত ঠাট্টা-বিদ্রূপ অগ্রাহ্য করেই! ভিড় হত অসম্ভবরকম। ঠাকুর-বাড়ির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মাড়োয়ারীরা। গ্রামের লোক ঠাকুরবাড়িকে খুব শ্রদ্ধা করত। বাড়ির সামনে কালীঘরে কালীপুজো উপলক্ষে গান বাজনার আসর বসত হামেশাই। কালীপুজোর দিন বাড়ির গুরুজনেরা আমাদের টিকিটি দেখতে পেতেন না, আমরা সবাই থাকতাম মহাব্যস্ত। বলির পাঁঠাদের তত্ত্ব-তল্লাস করতাম, মহাযত্নে তাদের কাঁঠাল পাতা খাওয়াতাম, তাদের কোলে করে আদর করতাম সমস্ত দিন! কিন্তু এত আদরযত্নে যাদের লালন করলাম সমস্তটা দিন ধরে সেই স্নেহের জীবটিকে মুহূর্তে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে কোন ব্যথাই অনুভব করিনি! মনের এই দ্বৈত পরস্পর-বিরোধিতার গুণগত ব্যাখ্যা করার বয়েস তখন না হলেও আজ খুব বিস্ময় লাগে তা ভাবতে। সেই জিনিসই কি গোটা বাঙলার বুকে ঘটে গেল না?

'নরমেধযজ্ঞ' বা 'নহুস উদ্ধার' অভিনয় আমাদের একদিন সকলকেই মোহাবিষ্ট করত আজো বেশ মনে পড়ে। অভিনয়ে সুদখোর রত্নদত্তের চাপে পড়ে দরিদ্র ব্রাহ্মণ সিদ্ধার্থ তার শিশুপুত্র কুশধ্বজকে তুলে দিলেন রাজা যযাতির নরমেধ যজ্ঞে

বলি দেবার জন্যে। এই দৃশ্য দেখে আমরা সেদিন জাতিধর্ম নির্বিশেষে ডুকরে কেঁদে উঠেছি। লক্ষ্য করেছি আসরের আবহাওয়া মুহূর্তে পাল্‌টে গেছে শোকের গভীরতায়, কোন দর্শকের চোখ সেদিন শুকনো ছিলনা। অভিনয় সার্থক হয়ে যেন বাস্তবের রূপ পেত। আজ নহুসের কথাই বেশী করে মনে পড়ছে এইজন্যে যে তার প্রেতাত্মা কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে শুনতে পাচ্ছি। তার উদ্ধারের জন্যে মানুষের রক্ত চাই,—সে রক্তক্ষরণ তো হল এই বিশশতকের শেষার্ধে! এখনও কি আমাদের উদ্ধার আশা করা যায় না নহুসের সঙ্গে সঙ্গে? এত রক্ত কি বিফলে যাবে? আমার মনে হয়, এই যে বিচ্ছেদ আজ এসেছে তা মিলনেরই ভূমিকামাত্র। 'সীতা' অভিনয়ে আমরাই তো জোর গলায় শ্রোতাদের শুনিয়েছি :

'জননি আমার
হেন প্রশ্ন তুমি কর দেবী?
বাল্মীকির রাম-সীতা চির-অবিচ্ছেদ ;
অন্তরে অন্তরে চিরন্তন
মিলনের প্রবাহ বহিছে।'

মনে হয় এই মিলন-প্রবাহ অধুনা ক্ষীণ হলেও একদা প্রাণগংগায় জোয়ার এসে সমস্ত ক্লেদ নিয়ে যাবে ভাসিয়ে। বাল্মীকি মহাকবি, তাঁর কথা মিথ্যে হতে পারেনা। আমরা সেই মিলনের জন্যে সাগ্রহে প্রতীক্ষা করব। 'আসিবে সে দিন আসিবে।'

হিন্দু-মুসলমান, বাঙালী, মাড়োয়ারী বলে আমাদের গ্রামে কোন পার্থক্য দেখিনি। বহু মাড়োয়ারী এসে বাস করতেন ভেড়ামারায়. কিন্তু লক্ষ্য করেছি সবাই থাকতেন মিলেমিশে এক হয়ে। দেখেছি দু'পাঁচশ টাকা দরকার হলে চেয়ে আনত একজন অন্য আর একজনের কাছ থেকে। লেখাপড়ার কোন দরকার হত না তার জন্যে। এই যে আত্মবিশ্বাস এর ওপরেই ছিল সেদিনকার প্রাত্যহিক জীবন। পরিশোধের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। এই লেনদেনে কোনদিন কোন কলহবিবাদ দেখিনি আজকের মত। এত সুবিধে-সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কেউ কাউকে বড় একটা ঠকায়নি বা অবিশ্বাসের কোন কাজ করেনি। পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করত, পরামর্শ দিত, পরামর্শ শুনত, পরামর্শমত কাজও করত দ্বিধাহীনচিত্তে। সেখানে হিন্দু মুসলমান বা মাড়োয়ারীর গণ্ডী টেনে জনজীবনকে কেউই সীমাবদ্ধ করত না। মাড়োয়ারী বন্ধুদের বাড়িতে প্রায়ই জুটত নিমন্ত্রণ। খাওয়াতে তাঁরা

ছিলেন মুক্তপ্রাণ। বাড়িতে বেড়াতে গেলেও খাওয়ার ঘটা দেখে চোখ উঠত কপালে! তাঁদের 'লাড্ডু-মণ্ডা-টিক্‌রা'র স্বাদ এখনো ভুলতে পারিনি। সেই ঘিয়ে জব্‌জবে খাবার এখনো জিভকে সরস করে তোলে সময় সময়! কোথায় সেদিন? কোথায় সেই মনের আত্মীয়তা? কোথায় সেই ভেড়ামারা?

অনেক সময় বাবাকে গ্রামের বাইরে যেতে হত দীর্ঘদিনের জন্যে। আমরা তখন ছোট। মা থাকতেন একা অতবড় বাড়িতে আমাদের ক'জন নাবালককে নিয়ে। ক্ষুদিরামদাদা কিংবা ভবতারণ জ্যেঠার বাড়ি একটু দূরে ছিল বলে সব সময়ে খোঁজখবর নিতে পারতেন না তবু আমরা অসহায়বোধ করিনি কোনদিন। সামনের রিয়াজুদ্দিন মণ্ডল আর পাশের গৌরীশংকর আগরওয়ালা সর্বদাই খোঁজ নিতেন আমাদের, কোন কিছুর প্রয়োজন হলে সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যবস্থা করতেন। বাড়িতে পাহারা দিত জমিজমা তদারককারী আলিমুদ্দিন কিংবা কলিমুদ্দিন। তাদের আমি দাদা বলেই ডাকতাম। কোনদিন তাই মনে হয়নি তারা মুসলমান বলে দূরের কেউ। তারা আমার অগ্রজ তুল্য, যেখানেই থাকুক তারা সুখে থাকুক এই কামনাই করছি।

মনে পড়ছে এই আলিমুদ্দিনদা আর কলিমুদ্দিনদাই আমাদের প্রথম এসে বাধা দিয়ে ছলছল চোখে বলেছিল: 'জমিজায়গা বিক্রী করবেন না, বাবু! দেশ ছেড়ে কোথায় যাবেন? কতদিন থেকে আপনাদের খেয়ে আপনাদেরই কাছে পড়ে রয়েছি। এত সহজেই মায়া কাটিয়ে চলে যেতে পারবেন?' কই তারা তো সম্প্রদায়ের গণ্ডী টেনে আমাদের দূরে সরাতে চায়নি, রাজনীতির যূপকাষ্ঠে দেশকে দ্বিখণ্ডিত করতে চায়নি, দেশের এবং জনগণের অভিশাপে অভিশপ্ত হতে উৎসাহ দেখায়নি! তারা গ্রামের নির্বিবাদী নিরীহ প্রজা, তাদের সামনে লোভের মোহ নেই। তাই তারা কেঁদেছিল আমাদের চলে আসার সময়।

যাবার বেলা সকলেই পিছু ডেকেছে, বাধা দিয়েছে পিতৃভিটে বিক্রীর বিরুদ্ধে। আত্মীয়-অনাত্মীয়েরা কেঁদেছে, মাড়োয়ারীদের মা-বৌরাও স্টেশন পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেছে। গাড়ির জানলা দিয়ে দেখেছি আমার অতি প্রিয়জনরা প্ল্যাটফর্মে করুণমুখে, সিক্ত নয়নে দাঁড়িয়ে, প্রত্যেকের চোখেই ফিরে আসার মিনতি। কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করেছে—'তোমরা তো চলে গেলে, আমরা কি করবো?' এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিনি, কাপুরুষের মত মুখ লুকিয়ে এড়িয়ে গেছি সেকথা। আজ ধিক্কার দিই নিজেকে,—জানিনা যারা সেদিন এ প্রশ্ন

তুলেছিল তারা আর কোথাও সে প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেয়েছে কিনা। জানিনা তারা আজ কোন্ ক্যাম্পে মাথা গুঁজে মৃত্যুকে এড়িয়ে চলেছে? আমাদের বাড়ির বুড়ি ঝি এখনো কি বেঁচে আছে?

এখনো চোখ বন্ধ করলে, কান ঢাকলে শুনতে পাই রেলগাড়ি চলার শব্দ। সেদিন যে ট্রেন ভেড়ামারা থেকে বাঁশি বাজিয়ে ছেড়েছে আজও যেন তার গতিরোধ হয়নি। জানিনা নিরবধি কালের কোন্ পর্যায়ে সে আমাদের নির্বিঘ্নে স্টেশনে পৌঁছে দেবে,—সেই গতিহীন অনন্তযাত্রার সমাপ্তির রেখা কবে দেবে টেনে।

স্বপ্নে হঠাৎ হঠাৎ প্রায়ই যেন কানে আসে—কোথায় যাবেন বাবু, এত সহজেই কি গাঁয়ের মায়া কাটিয়ে চলে যেতে পারবেন?—চমকে উঠে বলি—'আলিমুদ্দী-কলিমুদ্দী দাদা! তোমাদের কথাই ঠিক, তোমাদের মায়া কাটানো সোজা নয়, তোমরা আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাও।' আমাদের কথা কি আলিমুদ্দিনদাদাদের কানে কেউ পৌঁছে দেবে? আবার কি আমরা ফিরে পাব পল্লী-জীবনের সেই মধুর পরিবেশ?

।। মালদহ ।।

কালোপুর

গম্ভীরার আসর বসেছে গ্রামে। ওস্তাদ পরাণ মাঝি সুললিত কণ্ঠে গাইছে : 'শিবহে, এবার পূজা বুঝি তোমার হৈলনা, হৈলনা'। অনেকদিন শুনেছি এই গান, প্রতিবারই শুনেছি। কিন্তু কোনদিন কি ভেবেছি এমন একদিন আসবে যেদিন সত্যিই শিবের পুজো আর হবে না গ্রামে।

ভীতত্রস্ত আশংকাম্লান একদল লোকের মিছিল চলেছে গ্রাম থেকে বাইরে, কোথায় কেউ জানেনা। একা তাদের পথ আগলে দাঁড়িয়েছিল দোস্ত মহম্মদ—জোয়ান লাঠিয়াল দোস্ত মহম্মদ। বলেছিল : 'কুথে যাবে, যে যাবে তার মাথা লিয়ে লিব'। তাকেও পথ ছাড়তে হল। লাঠি ফেলে দিয়ে কেঁদে উঠল দোস্ত মহম্মদ। মালদহ জেলার অখ্যাত পল্লী কালোপুরের ইতিহাসে আরেকটি নতুন অধ্যায় শুরু হল। দোস্ত মহম্মদ কাঁদছে, দুর্ধর্ষ লাঠিয়াল দোস্ত মহম্মদ কাঁদছে। কেন? এ জিজ্ঞাসার জবাব নেই। ওপরে নির্বাক আকাশ। পায়ের নীচে পাতাজড়ানো তামাটে রঙের পথ কথা কয় না।

উত্তরবঙ্গের মালদহ জেলার ছোট্ট একটি গ্রাম কালোপুর। গ্রাম নয়, যেন একটি দ্বীপ। সভ্যজগতের কলকোলাহল থেকে বিচ্ছিন্ন শান্তিপ্রিয় আত্মমুখী জীবন-যাত্রায় অভ্যস্ত সে দ্বীপ। ছোট ছোট মানুষ, ছোট ছোট তাদের আশা-আনন্দ, সুখ-দুঃখ। প্রাচীন গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ আজো যেখানে দেখা যায়, সেখান থেকে খুব দূরে নয়, মাইল দশেকের মধ্যেই। কিন্তু কি সেকালে, কি ইংরেজ আমলে, ইতিহাসের ওঠাপড়ায়, রাজা-উজিরের আসাযাওয়ায় কেমন একটা অপরিবর্তনীয়তা গ্রামটিকে পেয়ে বসেছিল। হঠাৎ এলো আঘাত—অপ্রত্যাশিত, অভাবিত। বিমূঢ় মানুষগুলো একান্তই গেঁয়ো, বুঝেই উঠতে পারেনি কত বড় ঝড় তাদের আমজামের ছায়ায় ঘেরা ঘরগুলোর ওপর নেমে এল। সর্বনাশ যখন এল, তখন তারা বুঝল কী তাদের ছিল, কী তারা হারাল।

মালদহ জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তের শিবগঞ্জ থানার এলাকায় পড়ে

গ্রামটি। আমবাগানের ঘনবিস্তৃত ছায়ায় এলোমেলো ঘরগুলো। খড়ের চালা, মাটির দেওয়াল। ছোট্ট একটুকরো উঠোন। এ গাঁয়ে যাদের বাস—চাষ-আবাদ করেই চলে তাদের জীবিকা। এরা সকলেই প্রায় মুসলমান।

গাঁয়ের দক্ষিণে কয়েকঘর হিন্দুর বাস। তাদের কেউ কামার, কেউ কুমোর, কেউ তাঁতী। কৈবর্ত আর তাঁতীদের সংখ্যাই বেশী। কেউ কেউ জাতব্যবসা করে বটে, কিন্তু চাষ সবাইকেই করতে হয়—না হলে চলে না। আমাদের বাড়িটা একেবারে মুসলমান পাড়ায়। ডাইনে বাঁয়ে তাদের ঘর। সামনে ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের ধুলোটে রাস্তা। ভোরবেলা থেকেই গরুর গাড়ির চাকার শব্দে ঘুম ভাঙতো গ্রামের। ভিন্‌গাঁয়ের লোকেরা আসা-যাওয়ার পথে এই ছোট্ট গাঁয়ের দিকে কেউ বা তাকাত—কেউ বা তাকাত না।

গাঁয়ের পাশ দিয়ে চলে গেছে গংগা নদী। অপ্রশস্ত শীর্ণ। শীতের সময় চর পড়ে,—বর্ষায় থই-থই করে। উত্তর বাঙলার অন্য সব গ্রামের মতই কালোপুরেও নেই ষড়ঋতুর বিপুল ঐশ্বর্য। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের আভরণহীন প্রকৃতি ক্ষতিপূরণ করে আম-জাম দিয়ে। তারপর বর্ষা। ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের ধুলোভরা রাস্তা কর্দমাক্ত হয়ে যায়, নীচু জমির জল উপচে উঠে। কিন্তু তবু গরুর গাড়িই প্রধান বাহন—নৌকো নয়। নৌকো যা চলে তা গংগায়। বড় বড় পালতোলা নৌকোগুলো এ গাঁয়ের কাছে ক্বচিৎ নোঙর ফেলে। বর্ষা এ গাঁয়ে আসে অভিসম্পাতের মত, পুরোনো খড় চুঁইয়ে ঘরে জল ঝরে। বর্ষার পর শরৎ। কত নাম-না জানা ফুল ফোটে—ঝোপ্‌-ঝাড়ের ফাঁক দিয়ে মিঠে রোদ উঁকি মারে। কিন্তু এ সময় প্রকৃতি তার ক্ষতিপূরণ আদায় করে নেয়। পুজোর আনন্দের হাসি মিলিয়ে যেতে না যেতেই 'ম্যালেরিয়া দেখা দেয়। হেমন্ত আর শীত কেটে গেলে পর ম্যালেরিয়ার মেঘও কেটে যায়। বসন্তই এ গ্রামে সত্যিকারের ঋতু। আমের পাতা নতুন রঙ ধরে—গাছে গাছে থোকা থোকা মুকুলের গন্ধে গ্রাম-পথ মেতে ওঠে। জানা-অজানা পাখির ডাকে গ্রামের আকাশ মুখর। সে কী আকর্ষণ!

কিন্তু আজ সে গ্রাম দূরে—অনেক দূরে। পরিচিত মুখগুলো মনে পড়ে—পরিচিত মাঠ, নদী, বাগান, ক্ষেত এমন কি গাঁয়ের সেই খোঁড়া কুকুরটাকে পর্যন্ত। আর আমাদের চণ্ডীমণ্ডপ। স্বল্পবিত্ত মুসলমাস চাষী আদালতে যেত না, এই চণ্ডীমণ্ডপেই ভিড় জমাতো বিচারের জন্যে। বাড়ির কর্তাকে এরা সবাই

বলত ঠাকুরমশাই। এমন কি শিবগঞ্জ, কানসাট, মোহদিপুকুর, দেওয়ানজাগীর লোকেরাও চিনত তাঁকে। গাঁয়ের যে কোন বিবাদ মেটাতে, আনন্দে-উৎসবে আর দুঃখের দিনে—সব সময়ই তিনি থাকতেন গাঁয়ের লোকের পাশাপাশি। আর এই চণ্ডীমণ্ডপ ছিল গাঁয়ের আদালত।

বছরে গ্রামে একবার করে রটন্তী কালীপুজো হত। সে পুজো হয় মাঘ মাসে। তাতে হিন্দু-মুসলমান সবাই যোগ দিত। মুসলমান চাষীদের কাছেও এ সময়টা যেন পরবের।

সারা রাত জেগে তারা আলকাপ আর গম্ভীরা গাইত।

গম্ভীরার নাচের তালে তালে উদ্ভাসিত হয়ে উঠত সারা গ্রাম। নানারকম গালগল্প অবলম্বন করে যে গান হয় তাকেই এদেশের লোক আলকাপ বলে। দু'পক্ষের বক্তব্য বিনিময় হয় গানের মাধ্যমে। নাট্যরসও থাকে তাতে। হাস্য-রসেই এর পরিণতি। বিধবা বিবাহ নিয়ে আলকাপ ব্যঙ্গ গানের একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাক। কন্যাদায়গ্রস্ত স্বামী স্ত্রীকে আশ্বাস দিয়ে বলছে—

আমার কথা শুনেক বামনী চুপ্ করয়্যা থাক···(টে)
জামাই আনবো গাড়ী গাড়ী লাখে-লাখ···(টে)

উত্তরে স্ত্রী বলছে—

ঘরে রাখ্যা কুমারী, উদ্ধার করছ কুড়্যার আড়ি—
মাথাতে জ্বালিয়া তুষের আগুন,
বাহিরে বেড়াইছো পট্‌কা চাল্যা—

অর্থাৎ ঘরে কুমারী, মেয়ে, মাথায় তুষের আগুন জ্বলছে, আর তুমি কিনা বিধবা উদ্ধার করার চাল মেরে বেড়াচ্ছ। গানগুলো হয়ত অনেকাংশেই স্থূল আর গ্রাম্য —কিন্তু তবু বাংলার লোকসংস্কৃতিব ইতিহাসে এই সব বিলুপ্তপ্রায় আলকাপ আর গম্ভীরা একেবারে মূল্যহীন নয়। সেটেলমেণ্টের অফিসারকে দেখে গ্রাম্য লোকের ব্যস্ততা, ভয় আর কিছুটা বিদ্বেষের ছবি কি ফুটে উঠেনি এই গম্ভীরা গানে—

'এ দাদু আয়না দৌড়্যা চট করয়্যা,
এ শালার এমন জরিপ এমন তারিখ
মারল মুলুক জুড়্যা।
আমিন বাবু চেনম্যান লইয়া
ঝনমন করয়্যা আইসছে,—

ক্ষেত-আলার গড় দেখ্যা র‍্যাগ্যা
যে লাল হইছে।'

এসব গান এদের মুখে না শুনলে বোঝাই যায় না, তীক্ষ্ণ বিদ্রূপকে কি করে এরা হাস্যরসে রূপান্তরিত করতে পারে। দেশের মুক্তি আন্দোলনে উদ্দীপনা দানে এবং দেশবাসীর উপর পাশ্চাত্য শিক্ষার কুপ্রভাবের কঠোর সমালোচনায় গম্ভীরা গানের মুখরতা অবিস্মরণীয়। পল্লী-কবি মহম্মদ সুফির রচিত একটি গম্ভীরা গানের নিম্ন পংক্তি কয়টিতে কী আন্তরিক জ্বালাই না ফুটে উঠেছে। কবি লিখছেন ঃ

(আমরা) বিলাসিতায় বাংলাকে হায়
মাটি করলাম ভাইরে!
(আমরা) ছিলাম বা কি, হলাম বা কি
বাকি কিছুই নাইরে!
(আমরা) দু' পাতা ইংরেজী পড়ে
কৃষি-শিল্প তুচ্ছ করে,
বাপ্-দাদাদের ব্যবসা ছেড়ে—
(পরের) মুখপানে চাইরে!

এ সব গান আজ মনে পড়ে—আর গ্রামের ছোট বড় কত ঘটনাই না সারা মনকে ঘিরে ধরে। মনে পড়ছে জহর আলি কাকার কথা। আমাদের বাড়িতে একবার চুরি হয়েছিল। সবাই সন্দেহ করল জহর আলিকে। তিনি তো কেঁদেই অস্থির। তিনি যে নির্দোষ!

আলি কাকা চমৎকার গল্প বলতেন। তাঁর ছেলেবেলায় তাঁর মুখে শোনা গৌড়ের জিনের কাহিনী আজো ভুলিনি। গভীর রাতে গৌড়ের পথ ধরে চলেছে গরুর গাড়ি। গাড়োয়ান গাইছিল কি একটা গান। হঠাৎ থেমে যেতেই অশরীরী জিন পেছন থেকে শুনতে চাইল পরের লাইন। তারপর কি হল বলতে গিয়ে জহর আলি কাকা গাড়োয়ানের সৌভাগ্যের যে চিত্র এঁকেছিলেন তা ভোলবার নয়।

আর দোস্ত মহম্মদ। ফরসা জোয়ান ছেলে। কখনো আমাদের জমিতে গরু-বলদ নামিয়ে ধান খাইয়ে দিত, কখনো আখের জমিতে লুকিয়ে আখ খেয়ে যেত। আমরা গ্রাম ছেড়ে চলে যাব শুনে মস্তবড় বাঁশের লাঠি আংগিনায় ঠুকতে-

ঠুকতে চীৎকার করে বলতে লাগল—'কুঠে যাবে, যে যাবে তার মাথা লিয়ে লিব।' ভয়ে বাড়ির সবার মুখ শুকিয়ে এল। দাদা বেড়িয়ে এসে হাসতে হাসতে বললেন —'কি মহম্মদ তুমি, তুমি আমাদের মারবে?'

মহম্মদ চোখ তুলে তাকাতেই পারল না। বাঁশের লাঠিটা ফেলে দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে চলে গেল। যেদিন গ্রাম ছেড়ে চলে আসি সেদিন তার সে কি কান্না! আশ্চর্য ছেলে।

গাঁ থেকে মাইল খানেক দূরে শিবগঞ্জ থানা এলাকা—সেখানেই পোষ্টাপিস, ইউনিয়নবোর্ড, স্কুল সব কিছু। আমাদের কালোপুর গ্রামের চোখে প্রায়-শহর সেটি। সেখান থেকেই প্রথম দাংগার খবর এল। মুসলমান চাষীরা আমাদের যেতে দিতে চায়নি। কিন্তু অগ্নিস্ফুলিংগ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। আমাদের রাখতে ওরাও আর সাহস পেল না।

সেই গ্রাম আজো কি তেমনি আল্‌কাপের দিনে মেতে ওঠে? গম্ভীরায় আজো কি তেমনি হিন্দু মুসলমান একযোগে চীৎকার করে গান ধরে—'শিবহে, এবার পূজা বুঝি তোমার হৈল না, হৈল না'? ধান উঠলে কি তেমনি হাসে—অনাবৃষ্টি হলে তেমনি কাঁদে?

এদের ছেড়ে আসতে ভারি কষ্ট। আমাদের আসার পথে এদের চোখে যে জল দেখছি তা কি করে ভুলব। আজ আর সে গাঁয়ে ফেরার পথ নেই। ধান উঠুক, জহর আলির জিন আমাদের ডাকুক, দোস্ত মহম্মদ কাঁদুক, 'তবু সেই ছেড়ে আসা গ্রাম' থেকে আমরা অনেক দূরেই পড়ে থাকব!

॥ রঙ্‌পুর ॥

হরিদেবপুর

মন বলে, যাই। অনেকদিন স্বপ্নেও দেখেছি। ভাবতে ভাবতে চোখের সামনে এসে দাঁড়ায় বৃদ্ধ ছুতোর মথুর কাকা। খোল-বাজিয়ে কানাইদার মিষ্টি গলার গান শুনতে পাই যেন। বৃদ্ধ আফসর দাদু এসে লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়ান। উতলা হয়ে ওঠে মন। মনে মনেই ফিরে যাই উত্তর বাঙলার সেই লোক-না- জানা অখ্যাত অজ্ঞাত গ্রামে, আমার জন্মভুমিতে।

উত্তরবঙ্গের রঙ্‌পুর টাউন থেকে মাত্র বার মাইল দুরে আমাদের ছোট্ট গ্রাম হরিদেবপুর। তার কোল দিয়ে ভুজংগায়িত বিনুনীর মত এঁকে-বেঁকে চলে গেছে শঙ্খমারী নদী। ছোট্ট নদী—খোলা তলোয়ারের মতই চক্‌চকে ছোট্ট নদী। বর্ষাকালে সে কিন্তু আর ছোট্টটি থাকে না। অবাধ্য সন্তানের মত উদ্দাম স্রোতে সে ভাসিয়ে দিয়ে যায় তার দুটি পাড়। ধান আর পাট গাছের গুড়িতে দিয়ে যায় তার পেলব মাটির স্পর্শ। আকারে ক্ষুদ্র পাল-তোলা নৌকোর সারি ভেসে বেড়ায় দুরন্ত বালক দলের মত। প্রতিদিন দল বেঁধে আমরা স্নান করতাম। পাড়ের ওপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়াতে কত না আনন্দ পেতাম সেদিন। সবচেয়ে ওস্তাদ ছিল পাড়ার নেপাল মামা। একাদিক্রমে তিনশ' বার ডুব দেয়াই ছিল তাঁর স্নানের বিশেষত্ব। এক হাতে নাক ধরে তাঁর ডুব শুরু হত—উঠে আসতেন জবাফুলের মত টক-টকে লাল চোখ-জোড়া নিয়ে। জ্বর তাঁর কিন্তু কোনদিন হয়নি সেজন্যে।

আগেই বলেছি গ্রামটি খুব ছোট। মোট কুড়ি একুশ ঘর হিন্দু আমরা, আমাদের পাড়ার নাম কায়েত পাড়া। সামনে ও পেছনে মুসলমান পাড়া, নয়া পাড়া আর পাছ পাড়া—সব মিলে হরিদেবপুর।

গ্রামের নয়াবাড়ি অর্থাৎ ঘোষ মশাইদের বাড়িতে গড়ে উঠেছিল একটি সমিতি—সৎসংগের আদর্শে। বিপ্লবী যুগে এই সংঘের দান বড় কম নয়। পাড়ার সবার সুরেশকাকা ছিলেন আমারই কাকা। তিনিই ছিলেন সমিতির

নেতা। জ্ঞান হবার পর দেখেছি প্রায়ই আমাদের বাড়ি সার্চ হত। পাটের গুদাম লণ্ড ভণ্ড করে দিয়ে যেত পুলিশ।

কোন একদিন সার্চ করতে এসে পুলিশ যাবার বেলায় ধরে নিয়ে গেল সুরেশকাকা আর সামসুদ্দিনদাকে। সামসুদ্দিনদা পাছ পাড়ার বুড়ো আফসর দাদুর একমাত্র ছেলে। সেদিন আফসর দাদুকে দেখেছি তামাক ক্ষেতের আলের ওপর দাঁড়িয়ে এই বিপ্লবীদ্বয়কে বিদায় দিতে। বিদায় দিতে দেখেছি হাসি মুখে তাঁর প্রাণের ছেলে সামসুদ্দিনদাকে। তাঁরা জেলে গেলেন, কিন্তু ফিরে এসেছিলেন পাঁচ বছর পর।

সেই বিপ্লবী সুরেশকাকা এবার সাত পুরুষের ভিটে ত্যাগ করে আসবার সময় আমাদের তক্‌তকে উঠোনের মাটি মাথায় নিয়ে, চোখের জলে মাটি-মায়ের বুক ভিজিয়ে দিয়ে চলে এসেছেন এ প্রান্তে।

আমরা চলে যাচ্ছি এ খবর পেয়ে সামসুদ্দিনদার সত্তর বছরের বুড়ো বাবা আফসর দাদু লাঠিতে ভর দিয়ে পথের মাঝে সুরেশ কাকার হাত ধরে বল্লেন—'ত্থাশ ছাড়ি তোরা কোটে যাওছেন দেব মশাই। তোরা চলি গেইলে আমরা গুলা কেম্‌তি করি বাচিম্‌। তোর চোখৎ পানি!' কিন্তু বাস্তবের রূঢ় আঘাতে সেই স্নেহশীল বুড়ো মুসলমান প্রতিবেশীর আকুল আবেদন উপেক্ষা করেই স্বপ্ন দিয়ে গড়া সেই ছোট্ট গ্রামখানিকে ছেড়ে আসতে হয়েছে আমাদের সবাকেই—সুরেশ কাকাকেও।

জেল থেকে ফেরার মাস তিনেক পরে একদিন সন্ধ্যায় পল্লীমায়ের দুরন্ত ছেলে সামসুদ্দিনদা মায়ের ঐ ছায়াঘন কোলের ওপরে ঘুমিয়ে পড়লেন চিরদিনের মত। স্তব্ধ হয়ে পড়েছিল আমাদের ছোট্ট গ্রামটি। মাঝি পাড়ার বাজার সেদিন বসেনি ...ক্ষেতে সেদিন কেউ নিড়ানি দিতে যায়নি...। শঙ্খমারীর কোলের বড় পুরোনো অশ্বত্থ গাছটার তলায় আজো তিনি ঘুমিয়ে আছেন।

গ্রামের প্রধান খেলা ছিল হাডু-ডু-ডু আর ফুটবল। কালাচাঁদের মাঠে খেলা হত। সেই রোমঞ্চময় রক্তরাগোজ্জ্বল অপরাহ্নের কথা ভুলিনি আজো। আজো ভুলিনি খোঁড়া জসিমের খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাডু-ডু-ডু খেলায় দম দেয়া। মহানগরীর সাতমহল বাড়ি ডিঙিয়ে, কত শত নদ নদী-প্রান্তর পেরিয়ে, কত সবুজ ধানের ক্ষেত মাড়িয়ে আজো ভেসে আসে সেই হাডু-ডু-ডু ধ্বনি।

শঙ্খমারীর তীরে ছিল আর একটা অশ্বত্থ গাছ। ঘন পত্রাবৃত ডালগুলো

কিছুটা ঝুলে পড়েছিল শঙ্খমারীর জলের ওপরে হুমড়ি খেয়ে—চলূতি জলে বাঁধা দিত তার এক-একটি পাতা—এক-একটি পচে যাওয়া ডাল। স্রোত কাটার শব্দ ভেসে আসত নদীর ছায়াঘন কূল থেকে। এই ছায়াতে মাঝে মাঝেই উদয় হতেন এক সাধু। এসেই কুড়িয়ে আনা কাষ্ঠফলকে জ্বালিয়ে দিতেন আগুন। সারা গাঁয়ের হিন্দু মুসলমান ভাগ্য-জিজ্ঞাসা নিয়ে জড় হত সেই ভয়াল অন্ধকার ঘেরা অশ্বত্থ গাছের নীচের আলোয়।

বকুলতলা আমাদের খেয়াঘাট। বৈকালিক ভ্রমণস্থলও বটে। ছেলে-বুড়ো সবাই বেড়াতে আসত সেখানে। কেনী ঝালো, নিতাই মণ্ডল, জয়েন খাঁ—এরা তাদের ছোট্ট ছোট্ট ডিঙি দিয়ে নামমাত্র পারানি নিয়ে পার করে দিত শঙ্খমারী। শহর ফেরৎ যারা, তারা খবর বহন করে আনত সমস্ত জগতের। সত্যি-মিথ্যে মেশানো খবর···সিঙ্গাপুর পতনের সাতদিন আগে আমরা খবর পেয়েছিলাম জাপান সিঙ্গাপুরে হেরে গেছে। ভজু করমজায়ীর দেকানটাই ছিল ছেলে-বুড়ো সবার আড্ডাস্থল। আকর্ষণ ছিল বৈকি তার একটা! ভজু কিছুদিন হল শহর থেকে সওদা নিয়ে আসবার সময় একখানা করে খবরের কাগজ নিয়ে আসত। গ্রামের বিজয় ডাক্তার (হোমিওপ্যাথ) পড়তেন, আমরা সবাই শুনতাম। সে যেন একটি ছোটখাট সভা। ভজুর এতে কোন আপত্তি হত না, বরং তার দোকানের বিড়ি-সিগ্রেটটা সেই সময়েই বেশী বিক্রি হত।

এই সেদিনের কথা। সেদিন খুব কুয়াশা পড়ছে সকাল থেকে। দেশী কথায় হাত পা সমস্ত 'ট্যালকা' হয়ে পড়েছিল। তবুও সন্ধ্যে বেলাটায় কিছুতেই বাড়িতে বসে সোয়াস্তি পেলাম না। চাদরটা জড়িয়ে গিয়ে উঠলাম সেই করমজায়ীর চালা ঘরটাতে। একে মেঘলা দিন তার ওপর একটা ঝাঁপ বন্ধ করে রাখায় ঘরটা আঁধার আঁধার হয়ে ছিল। ঘরে ঢুকে প্রথমে বিজয় ডাক্তারকে দেখতে পেলাম। ভজু করমজায়ী টাউন থেকে ফেরেনি তখনো, সবাই অপেক্ষা করছে তার জন্যে।

'ভজুটি আওছেনা,—কোণ্টে গেইল ?'—পাছপাড়ার তফি শেখ প্রশ্ন করে।

'আরে নয় নয় বাহে, বেলা দুইট্যাৎ টাউনৎ গেইচে। এ্যালায় ত ফিরবার কতা।'

'আর ফিরোচে বাহে—আইজ আর'—···কাজিমুদ্দনের কথা শেষ না হতেই ঘরে ঢুকল ভজু। হাতে খবরের কাগজ, সওদাপত্র কিছুই নেই।

ডাক্তার আশ্চর্য হয়ে বল্লেন—'আরে এ ভজু, তুই সদাপত্তর কিছু করিসনি !'

ভজু কাগজটা এগিয়ে দিয়ে পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল।

ডাক্তার কাগজখানা খুলে বসলেন। আমি দূরে দাঁড়িয়ে আছি। ডাক্তার চুপ করে কাগজ খুলে বসেই রইলেন। সবাই জোরে জোরে পড়তে বল্লে।

'আর কি পড়বো ভাই—আবার গণ্ডগোল।'—ডাক্তার হতাশ ভাবে উত্তর দিলেন।

'আরে বাহে, কোটে গণ্ডগোল হইল কন্ কেনে।' —তফি শেখ বলে।

'সান্তাহারে গাড়িতে বহুৎ হিন্দু নিহত হইছে।'—ভজু যোগ দিল।—টাউন থেকে সব হিন্দু গাড়ি বোঝাই হয়ে হিন্দুস্থানে যাচ্ছে এবং তারাও যাবে, এ-কথাই ভজু বলতে যাচ্ছিল।

ভজুর কথা শেষ না হতেই কাজিমুদ্দিনের গলা উঁচু হয়ে উঠল—'তোরা কোটে যাবি ? হামরা কি তোর জান মারি ফেল্‌ছি ?'

কাজিমুদ্দিনের মত মুসলমান ছিল বলেই আজ বেচে আছি—নইলে সেদিন ভজুর দোকান থেকে বেরিয়ে যাবার সময় তফি শেখের মুখের চেহারা আজো গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

আমার গাঁয়ের সাধারণ মানুষের গলায় ভাওয়াইয়া গানের সুর মনকে মাতিয়ে তুলত। কথা-প্রাণ বাংলা গান। ভাওয়াইয়া গানের বেলাও তাই। একটি গানের কথা স্পষ্ট মনে পড়ছে। দোতারা বাজিয়ে তাল দিয়ে দিয়ে গান গাইছে ভাবুক ঃ

আরে ও ভাবের দোতারা
নবীন বয়সে মোর করলি বাউদিয়া।
যখন দোতারা নিলাম হাতে,
নিষদ করে মোর পাড়ার লোকে,
নিষদ করে মোর দয়াল বাপভাই।
(দোতারা) তোর জন্য মোর গিরাম বাদী
থানায় দেয় এজাহারী,
দারোগাবাবু হাতে দেয় দড়ি।
তুই দোতারা রাখিস মান,
রূপা দিয়ে মুই বান্দবো রে কান।

অল্প বয়সে দোতারার আকর্ষণে পাগল হয়ে সংসার ছেড়ে-বেড়িয়ে এসেছে ভাবুক। বাপ, ভাই, গ্রামের লোক কারুর কথাই সে কানে তোলেনি। গ্রামবাসীরা বিরোধী হয়ে দারোগাকে জানিয়ে দিয়ে তাকে হাত-কড়া পর্যন্ত লাগিয়েছে। তবু সে দোতারা ছাড়েনি। সেই দোতারাকেই সে বলছে, 'ও আমার দোতারা, তুই যেন আমার মান রাখিস্, আমি রূপো দিয়ে তোর কান বাঁধিয়ে দেবো'। অর্থাৎ সংসারের মোহগর্তে আর যেন তাকে প্রবেশ করতে না হয়, সে মান যেন তার থাকে। সত্যি কী উচ্চ ভাবের গান! আজ অবশ্য আমরা কম বেশী সবাই ভগ্ন-সংসার নিরুদ্দেশের পথের মানুষ। কিন্তু যেখানেই থাকি না কেন, আমার সোনার গ্রামখানি আমার চোখের সামনে।

পুজো এসে গেছে। আমাদের বারোয়ারী বাগানের বাঁধান বেদী এবার খাঁ খাঁ করবে—বিসর্জনের প্রদীপও জ্বলবে না। নদীর ঘাটে বিসর্জনের দিনের মেলায় সে কী কোলাহল হত! হিন্দু-মুসলমান সকলকে মিলনের রাখী পরিয়ে দেওয়া হত মেলায় প্রতি বছর। এবার হয়তো শুধু এক টুক্‌রো দক্ষিণা বাতাস বয়ে যাবে হু হু করে পল্লীমায়ের চাপা কান্নার সুরে। ধান মাড়াইয়ের স্বপ্নে কৃষকদের মন এবারও আনন্দে হয়তো ভরে উঠবে। কিন্তু মথুরা কাকা আর কানাইদার মিষ্টি গলার কীর্তন আর এবারের কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোকে মহিমান্বিত করবে না। কালীপুজোর প্রসাদ বিলির আনন্দও আর উপভোগ করবে না কেউ।

সব আনন্দই গেছে আমার গ্রামকে ছেড়ে। নইলে, পুজোয়, কালীপুজোয় যে সব থিয়েটার হত বারোয়ারী তলায়, সেগুলো তো এখানেই পেতে পারি—কিন্তু পল্লীমায়ের অদৃশ্য সেই স্নেহের টানতো পাবনা আর।

একবারের কথা মনে আছে—পুজোয় খনা বই নামবে। আমাকে খনা ও আমার বন্ধু ছহেরকে দেওয়া হয়েছিল মিহিরের। কিন্তু সেদিনের খনা আজ এখানে—মিহিরকে ছেড়ে অনেক দূরে—মিহির কি খনার বিরহে আজ বিরহী?

॥ বগুড়া ॥

ভবানীপুর

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এদেশকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন—স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে দেশ, স্মৃতি দিয়ে গড়া এবং একথাও বলেছেন, এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি। বাংলাদেশের এক স্বপ্নাচ্ছন্ন গ্রাম হল এই সতীতীর্থ ভবানীপুর। গ্রামের ইতিহাস সম্পর্কে শুনেছি যে দক্ষের পতিনিন্দায় লজ্জায় ও ক্ষোভে আত্মবিসর্জন দিলেন সতীদেবী। মহাপ্রলয় হল শুরু। সতীর নশ্বর দেহ নিয়ে নৃত্য করে স্বর্গ-মর্ত্য-পৃথিবী জুড়ে তাণ্ডব সৃষ্টি করলেন সংহারক মহাদেব। রক্ষাকর্তা বিষ্ণুর টনক নড়ল। চক্রের আবর্তনে খণ্ডিত হল সতীদেহ—আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা পেল ধরিত্রী। বাহান্নখণ্ডের একখণ্ড পতিত হল উত্তরবঙ্গের অখ্যাত এই ভবানীপুর গ্রামে। মা ভবানী স্থূলদেহ পরিত্যাগ করে দারুদেহে রূপ পরিগ্রহ করলেন। আমার গ্রামের ঐতিহাসিক পটভূমিকা তৈরী হল। আমার জন্মভূমি ভবানীপুর তাই পীঠস্থান। সেখানকার মাটি, সেখানকার ইতিহাস সবই আছে, কিন্তু নেই শুধু আমার বাসের অধিকার! আমার শান্তির নীড় আজ নষ্ট। খুব বেশীদিনের কথা নয়, বছর কয়েক আগেও ভাবতে পারিনি যে এমন সোনার গাঁ ছেড়ে আমাকে হীনতা-দীনতার মধ্যে জীবনের শেষদিনগুলো কাটাতে হবে। আমার জন্মভুমি থাকতেও আমি পরবাসী লক্ষ্মীছাড়া হয়ে ক্লান্তপায়ে ফুটপাতে বিশ্রাম করব, বৃক্ষতলে রাত কাটাব, শিশুপুত্রের হাত ধরে ঘুরে বেড়াব অস্নাত অভুক্ত অবস্থায়। এই অশ্রুর বন্যায় মনে পড়ছে একটি কবিতার কথা :

ত্রিযুগের ব্যথা তিনভাগ জলে পূর্ণ করিল ধরা,
বাকী এক ভাগ ধর্মের নামে আজ অশ্রুতে ভরা।

আজ দেখছি অশ্রুই সত্যি। না হলে এমন যে স্বপ্নঘেরা গ্রাম ভবানীপুর, এমন যে শাঁখারীপুকুর তাকে ছেড়ে নতুন ইহুদী সেজে আমাদের অচেনা-অজানা পরিবেশে চলে আসতে হবে কেন? শান্-বাঁধানো কোলকাতার কোলাহলমুখর

অশান্ত সন্ধ্যায় যখন মন বিক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে তখনই বেশী করে মনে পড়ে সেই শ্যামল বনানী পরিবেষ্টিত আমার জন্মভূমি আর সাধের শাঁখারীপুকুরের কথা। মন মন্থন করে চলে শৈশবের সুখের দিনগুলো। মনে হয় কাক-জ্যোৎস্না রাত্রে চুপচাপ বসে আছি শাঁখারী পুকুরের ধারে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে অবচেতন মনের সেই পরিচিত ছবি ঃ 'আমি শাঁখের শাঁখারী—রাঙা শাঁখা ফিরি করি।' সঙ্গে সঙ্গে বনমর্মর ভেদ করে কানে যেন ভেসে আসে ক্ষীণ স্বর—'এই দেখো আমার শাঁখা পরা হাত'! সম্বিত ফিরে চমকে উঠে দেখি বাস্তবতার কঠোর পরিবেশ যেন ঠাট্টা করছে আমাকে! চোখ দুটো জলে ভরে আসে আপনা-আপনি। মনে মনে শুধু আক্ষেপের সুরে বলি ঃ

অনাদি এ ক্রন্দনে মিশাইনু ক্রন্দন এ,
বুঝে নে মা এ প্রাণের কি দাহ!

মাঝে মাঝে ভাবি আমার গ্রামের ইতিহাস আমার ওপর এমন মর্মান্তিক প্রতিশোধ কেন নিল? যে তাণ্ডবের মধ্যে আমার গ্রামের জন্ম, সেই তাণ্ডবই কি আমাকে গৃহহীন করল?

শিবতাণ্ডব আমার জীবন-সমুদ্রকেও কি উদ্বেলিত করছে? এ সময় রক্ষাকর্তা বিষ্ণু কোথায়? কে আজকে এই মৃত্যুতাণ্ডব রোধ করবে? কিন্তু দুঃখে যাদের জীবনগড়া তাদের দুঃখ-কষ্টের কথা ভাবতে গেলে চলে কি? আজ শত দুঃখের মধ্যেও সেরপুরের সেই ফ্যামা পাগলা আমওয়ালার কথা বড্ড বেশী করে মনে পড়ছে। কোথা থেকে খুঁজে খুঁজে সিঁদুরকুটি আম নিয়ে এসে অতি আপনজনের মতই সে যেন বলেছে 'খোকাবাবু কনে যাও, আম খ্যাবা না?' কই সে তো কোনদিন বলেনি 'বাবু, আমাদের মোছলমানের দ্যাশ—তোমরা হেঁদুস্থানে চল্যা যাও!'

সেই কাদের মিঞা, রাজেক মাষ্টার তাঁরা তো কেউ আমার মন থেকে মুছে যায়নি। তাঁদের প্রতিটি কথা প্রতিটি উপদেশ আজোও আমি মনে করে রেখেছি। আজোও তাঁদের কথা চিন্তা করে আমার স্পর্শকাতর মন বেদনায় টনটন করে ওঠে। কেন?

কেন আমার প্রিয় সহপাঠী মহসিনের শেষ কথাগুলো আজো বার বার মনে পড়ছে এত দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও? আমাদের চলে আসার সময় সে বলেছিল—'হ্যাঁরে, আমরা কি দোষ করেছি যে তোরা চলে যাচ্ছিস?' এর উত্তর এ অবধি

খুঁজে পাইনি আমি। ভাই মহসিন, যেখানেই থাক তুমি, জেনো এখনো তোমাকে আমি ভুলিনি। তোমার সঙ্গে আমাকে শত্রুরা পৃথক করতে পারেনি। ভাই ভাইকে কবে কোথায় কে ভুলতে পেরেছে? তুমি যদি কোনদিন আমাকে স্মরণ কর তাহলে নিশ্চয়ই আমি যাব। কি আর বলব, কি সমবেদনা জানাব, শুধু ভাবছি আমিও বাঙালী। বাঙালী ঘর ছাড়তেও পারে, আবার তৈরী করতেও জানে।

চোখ বুঁজলেই মনে পড়ে নাটমন্দিরের ধারে রক্তচন্দনের বীজ কুড়ানোর সে কী ধুম! কে কত বেশী বীজ কুড়োতে পারে তার যে প্রতিযোগিতা চলত তা ভাবতে গেলে হাসি পায় আজ। হারান পণ্ডিত মশায়ের বাড়ি থেকে পেয়ারা চুরি করতে গিয়ে কতদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা একপায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হত! এসব শাস্তি কিন্তু কোনদিনই পেয়ারা চুরি থেকে আমাদের দূরে সরাতে পারেনি! পেয়ারা গাছটি তেমনিভাবে ফল দিয়ে চলেছে? ছোট ছেলের দল আজোও কি সেই সেখানে গিয়ে ভিড় জমায় পেয়ারা সংগ্রহের জন্যে?

পাঁজিতে প্রতি বছরই পুজো আসে, কিন্তু আমরা দেশে যেতে পারি না। আজ দেশ স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু আমরা কি স্বাধীন আমরা যে সম্পূর্ণ অন্যের করুণার উপর নির্ভরশীল। আগে প্রতি পুজোতেই বাড়ি গিয়েছি। সে কী আনন্দের দিন! ছোট থেকেই দেখে আসছি অন্য সব দিনেও মা করতেন শিব পুজো। আমরা বসে থাকতাম ঠাকুরের প্রসাদ আর রক্তচন্দনের লোভে।

কালীবাড়ি আর কাছারীর মালিক ছিলেন নাটোরের ছোট তরফ। তাঁদের কথা ভোলবার নয়। আর ভুলতে পারব না রামনবমীর উৎসবে ব্যস্ত-সমস্ত নায়েব চোংদার মশায়কে। তাঁর কাছে হিন্দু-মুসলমান সবাই ছিল সমান। জাতির লেবেল এঁটে তাঁর কাছে কেউ বিশেষ আদর আশা করতে পারত না। রামনবমীর দিন সমস্ত জায়গাটি গম্‌গম্ করত। আজও মাঝে মাঝে চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেদিনকার ছবি জীবন্ত হয়ে।

দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে পড়ে সেদিনকার কথাকেও আজ রূপকথা বলে মনে হচ্ছে আমাদের। সকালে স্নান-আহ্নিক সেরে মা সবাইকে নিয়ে বসে কুটনো কুটতেন। ঝিয়েরা রাশি রাশি বাসন ধুয়ে রকের ওপর রাখছে। সেসব বাসন আর একবার ভালো করে ধোয়া হলে তবে হেসেলে যাবে। বাইরে থেকে চাকর-ঠাকুররা এসে রান্না ও অন্যান্য কাজে সাহায্য করত। প্রকাণ্ড উঠোন—

ভেতরের বাড়িতে ধানের মরাই বাঁধা সারি সারি। এক পাশে ঢেঁকিশাল। গোয়ালে গরু, পুকুরে মাছ। ঠাকুমা প্রতিটি গরুর গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করে তবে অন্য কাজে মন দিতেন। যেখানে পশুর প্রতিও মানুষের এমনি অসীম মমতা, মানুষে মানুষে প্রীতি-প্রেমের এমনি শোচনীয় অভাব সেখানে ঘটে কি করে! বাইরের বাড়িতে মাঝে মাঝে কীর্তনের দল এসে মাতিয়ে তুলত মন। তার সব খুঁটিনাটি ছবি বড় বেশী করে আজকে পীড়িত করে তুলছে সারা অন্তরকে। মনে করি আর ভাবব না ওসব কথা, কিন্তু মনের ওপর চোখ রাঙিয়ে বেশীক্ষণ থাকতে পারি না তো! মানুষের মন কি পালটায়?

চিরদিনই ইতিহাস রচনা করেছে মানুষ। আজকের 'ছেড়ে আসা গ্রাম'কে নিয়ে জানি একদিন ঐতিহাসিকের দল গবেষণা করবেন, সাহিত্য পাবে খোরাক। কিন্তু তখন কি আর আমরা থাকব? যে সংঘবদ্ধ জীবন জাতিধর্ম নির্বিশেষে একসূত্রে সহস্রটি মনকে বেঁধেছিল সে সূত্র কে ছিঁড়ল? এক এক সময় হিসেবী মন কি পেয়েছি আর কি পাইনি তার হিসেব কষতে যায়, কিন্তু তার সার্থকতা কোথায়? ছিন্নমূল জীবনে স্থিতি না এলে হিসেব তো মিলবে না। মন শুধু ক্ষুব্ধ হয়েই বলবে—

'প্রলয় মন্থন ক্ষোভে
ভদ্রবেশী বর্বরতা উঠিয়াছে জাগি
পঙ্কশয্যা হতে। লজ্জা সরম তেয়াগি
জাতি-প্রেম নাম ধরি' প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।'

।। দিনাজপুর ।।

ফুলবাড়ি

বাঙ্‌লা দেশের উত্তর ভূখণ্ডের গ্রাম ফুলবাড়ি। রাঙামাটির পথ এখান থেকে শুরু হয়ে দিগন্তে হারিয়ে ফেলেছে নিজেকে। পদ্মা-মেঘনার দোলন-লাগা ছায়া-সুনিবিড় পূর্ব বাঙলার গ্রামের তুলনায় দিনাজপুরের এই পল্লীশ্রী একটু বিশেষ বৈচিত্র্যময়। এখানে অরণ্যের অনাহত সারল্য উদ্দাম হয়ে উঠেছে গ্রামান্তের আদিবাসী নরনারীর মাদল-দোলানো নৃত্যের তালে তালে। পাণ্ডব-বর্জিত পূর্ব-বাঙ্‌লা থেকে এই বরেন্দ্রভূমি এদিক দিয়ে নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে। কোলকাতার-কর্ম্মমুখর জনতাস্রোতে আজ নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি। যে গ্রামের বুকে পিতৃ পিতামহের স্মৃতি প্রতিটি বৃক্ষ-লতায় পথের ধূলিকণায় মিশে আছে, তার সঙ্গে আজ দুস্তর ব্যবধান। ফুলবাড়ি আর আমার নিজের বাড়ি নয়, সেখানে আমি অনাহূত। এ নির্ম্মম সত্য বিশ্বাস করতে মন চায় না, অবিশ্বাস যে করব মনের সে জোরই বা কই ?

গ্রামকে ছেড়ে এসে আজ আমি শরণার্থী। আরো লক্ষ জনের মতই আমি আজ স্বদেশচ্যুত, কিন্তু সব কিছু হারিয়েও ভুলতে পারিনি সে গ্রামের স্মৃতি। তার সঙ্গে যে আমার নাড়ীর যোগ !

বিশেষ করে আজ মনে পড়ছে দুর্গোৎসবের দিনগুলো। প্রতি বৎসর এই দিনগুলোর জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকতাম। পুজোর কদিন আগেই কোলকাতা থেকে রওনা হতাম গ্রামের দিকে। পথ যেন আর ফুরোয় না। দীর্ঘ পথ-পরিক্রমার শেষে কখন গ্রামের এলাকায় স্টেশনে গিয়ে পা দিতুম, নিজেকে তখন মনে হত যেন সম্রাট ! কোলকাতায় আমি কে ? সেখানে যে আমি অসংখ্য সাধারণের একজন। গ্রামে স্টেশন মাষ্টার মশাই প্ল্যাটফর্মে দেখেই স্মিতহাস্যে শুধোতেন, দেশে এলেন ? সেই অন্তর-ভরা প্রশ্ন আজোও যেন কানে এসে লাগে। কে যেন বলছেন-দেশে এলেন ? আহা, অমন প্রশ্ন শুধোবার দিন আবার কবে আসবে কে জানে ? আবার কবে মেহেদী পাতায় ঘেরা ছোট্ট ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে লাল মাটির পথ ধরে যাব এগিয়ে ফুলবাড়ির দিকে। কবে আবার শুনব পথের দুপাশে

অগুণতি চেনা-চলতি মানুষের সস্নেহ সম্ভাষণ, দেশে এলেন কর্তা! আর কিছু নয়, সহস্র কুশল প্রশ্ন লুকিয়ে থাকত এই দুটি কথার মধ্যে। সে দেশ, আমার, সে গ্রাম যে কী জিনিস, আজ তাকে হারিয়ে মর্মে মর্মে তা অনুভব করতে পারছি।

দুর্গোৎসবের সময় সাড়া পড়ে যেত পাড়ায় পাড়ায়। সোনার আঁচল বিছিয়ে শরতের রাণী আসছেন। তাঁর আগমনী সুরে সুরেলা হয়ে উঠেছে ফুল-বাড়ির আকাশ, বাতাস, প্রকৃতি। এত শুধু পুজো নয়, এ যে আমাদের জাতীর উৎসব। এ উৎসবকে কেন্দ্র করে মিলিত হতাম সমস্ত গ্রামবাসী। শ্রেণী সম্প্রদায়ের প্রশ্ন সেখানে নেই, আর্থিক সংগতির প্রশ্ন সেখানে অবান্তর। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সে উৎসবে সকলে মিলিত হয়ে আনন্দ করেছি, সে মিলনের মধ্য দিয়ে গ্রামের সহজ সরল আত্মীয়তার মধুর স্পর্শ অনুভব করে ধন্য হয়েছি।

সবচেয়ে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে বিজয়া দশমীর দিনটি। প্রিয়জনের বিচ্ছেদ বেদনার মতই সেদিনটি অশ্রু-টলমল। পুণ্যতোয়া করতোয়ার তীরে বিসর্জনের বাজনা বাজছে। সে উৎসব উপলক্ষে সমবেত হয়েছে এসে সাঁওতাল-আদিবাসী ছেলে-মেয়ে স্ত্রী-পুরুষের সব দল। তাদের চিকণ কালো যৌবনপুষ্ট দেহলী সৌষ্ঠব, কেশপাশে কৃষ্ণচূড়ার অপূর্ব বিন্যাস-সমারোহ। মাদলের তালে তালে শুরু হত তাদের লোক-নৃত্য। কোথায় সেদিন, কোথায় সেই অরণ্য লালিত মানুষের নৃত্যছন্দের হিল্লোল। আজ সে সব স্বপ্ন বলেই মনে হয়।

উৎসবের দেশ বাঙলার গ্রামে এসেছে দোলপূর্ণিমায় হোলিখেলার দিন। বসন্তে রঙ লেগেছে ফুলবাড়ির আকাশে। দিকে দিকে গান শুরু হয়েছে 'দখিণ দুয়ার খোলা'। সেই ফাল্গুনের উজ্জ্বল রোদে আমরা দল বেঁধে বেরিয়ে পড়তাম গ্রামের পথে। আমাদেরই কাউকে হোলির রাজা বানিয়ে দিতাম শিবের মত সাজিয়ে। তার পেছন পেছন সকলে হোলির উৎসবের-হৈ-হল্লায় গ্রামের পথঘাট মাতিয়ে তুলতাম। ছড়িয়ে দেবার, ভরিয়ে দেবার সে আনন্দে হোলির দিনগুলো আজও মনকে দোলা দিয়ে যায়।

বারোয়ারীতলায় এক একদিন বসত কীর্তনের আসর। 'মাথুর' পালা শোনবার আকর্ষণে হাজার লোকের ভিড়। ভিনগাঁ থেকে এসেছে নাম-করা কীর্তনীয়া। প্রতিবেশী মুসলমানরাও বাদ পড়েনি সে গানের আসরের আমন্ত্রণ থেকে। মাথুরের অশ্রুসজল কীর্তনের সুরে মুগ্ধ হয়ে কেউ বা হয়ত মেডেল পুরস্কার দিতেন কীর্তনীয়াকে। মুসলমান শ্রোতারাও অনেক সময় দিয়েছেন উপহার।

সেদিন তো ধর্মের কোন বালাই ছিল না। স্কুলে মুসলমানদের পর্ব 'মিলাদ শরীফ' হয়েছে, হিন্দু ছাত্ররাও তাতে অংশ গ্রহণ করেছে বিনা দ্বিধায়। সেদিন তো কোন জাতির প্রশ্ন, ধর্মের প্রশ্ন পরস্পরের এই প্রীতির সম্পর্ককে এমনি বিষাক্ত করে তোলেনি। আজ কেন এই অন্ধ উন্মত্ততা ?

আজও মনে পড়ে আমাদের গ্রামের সর্বজনপ্রিয় আব্দুল রউফ সাহেবের মৃত্যুর দিনটি। তাঁর মৃত্যুর সংবাদে সবার চোখে সেদিন জল এসেছিল। হিন্দু-মুসলমান সকলে সেদিন যোগ দিয়েছিল রউফ সাহেবের শবযাত্রায়। তাঁর সমাধি হিন্দু-মুসলমান অনুরাগীর শোকাশ্রুতে সেদিন স্নাত হয়ে গিয়েছিল। সেদিনের স্মৃতি আজও তো মন থেকে মুছে যায় নি !

দরিদ্র পল্লী-বাঙলা। ফুলবাড়িও তেমনি দরিদ্র পল্লী। গ্রামবাসী অনেকেরই আর্থিক সচ্ছলতা ছিল না। তবু তাদের মনে সুখ ছিল। আর ছিল প্রতিবেশীর প্রতি অসীম মমত্ববোধ। এই আত্মীয়তার স্পর্শেই গ্রামবাসী মানুষের জীবন সেদিন মধুময় হয়ে উঠেছিল।

গ্রাম থেকে উৎখাত হয়ে নগরে এসে আজ আস্তানা গড়েছি। এ মহানগরীর সঙ্গে শুধু দেনা-পাওনার সম্পর্ক, প্রাণের কোন যোগ নেই এখানে। গ্রামের মাটিতে সবুজ তৃণলতা থেকে শুরু করে সবকিছুর সঙ্গেই যেন একটা মধুর প্রীতির সম্পর্ক পাতানো ছিল। দেশ বিভাগের ফলে সেই মাটির মাকে হারিয়েছি। ছিন্নমূলের ভূমিকায় আজ আমরা নিজেদের হারিয়ে ফেলেছি অজানার ঘূর্ণাবর্তে। আমরা ফিরে পেতে চাই সেই মাটিকে। ফিরে যেতে চাই রাঙ্গামাটির দেশে সেই উত্তর বাঙলার নিভৃত পল্লী-পরিবেশে।

ফুলবাড়ির রূপ আজ কেমন দাঁড়িয়েছে জানি না।

আধ-পাগলা সেই বিলাসী বৈরাগী আর হয়তো একতারা বাজিয়ে গান ধরে না—'চল সজনী যাই গো নদীয়ায়'। বাউলের আখড়ায় সন্ধ্যের দিকে আর আড্ডাও হয়তো বসে না। কিন্তু আমাদের পাশের বাড়ির ডাক্তার বাবুর বাগানের গন্ধরাজ গাছটির গন্ধ নিশ্চয়ই অকৃপণ দাক্ষিণ্যে পূর্ণ করে দেয় অংগনতল। রজনীগন্ধার ঝাড় থেকে অফুরান মনমাতানো সৌরভ এখনো হয়তো ফুলবাড়ির পথঘাটে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু আমাদের বাসুদেবের ভাঙা দেউলে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালাবার মত কেউ আর বোধ হয় সেখানে নেই। ফুলবাড়ির নিষ্প্রদীপ দেউলে মানুষের ভগবান কি তপস্যায় মগ্ন কে জানে ?

রাজারামপুর

কোথা থেকে যেন কি হয়ে গেল। যে-ছিল একান্ত আপন সেই হয়ে গেল পর। স্বদেশকে স্বাধীন করবার মূল্য দিতে হল এই ভাবে। মূল্য হিসেবে দিতে হল গ্রামজননীকে। আমাদের স্বাধীনতা তাই এল মহাবিচ্ছেদের কান্নায় ভিজে হয়ে!...

আমার গ্রামের নাম রাজারামপুর। দিনাজপুরের অনেকগুলো গ্রামের একটি। রাজারামপুর-ভাটপাড়ায় এসে পেঁাছলে মনে হয় বাঙলার সাধারণ গ্রাম থেকে এর চেহারা যেন একটু পৃথক। তবে রংপুর, রাজসাহী, নাটোর—এ-সব অঞ্চলের গ্রামের সঙ্গে মিল রয়েছে অনেকটাই। চারিদিকে শটীর জংগল আর আটিশ্বরের ঝোপ। আম জাম-কাঁঠালের বন মাঝে মাঝে এতই নিবিড় হয়ে উঠেছে যে হঠাৎ ঠাহর করাই শক্ত সেই বনের মধ্যে কোথায় কার খড়ের চালা মাথা উঁচু করে আছে।

দিনাজপুরের বালুবাড়ি শহরের অনেকটা কাছে, তাই তার গ্রাম্য চেহারা কিছুটা বদলেছে। কিন্তু তারই বুক চিরে মহারাজ হাইস্কুলের পাশ দিয়ে যে মেঠো পথ বনজংগল ভেদ করে রাজারামপুর-ভাটপাড়ায় গিয়ে পেঁাছেছে, সে পথ দিয়ে দিনের বেলায় একা হাঁটতেও কেমন যেন ভয় করে। কিছুদূর পথ চলার পরই ধুলো হাঁটু অবধি উঠে আসবে। গরুর গাড়ির মন্থর গতি দেখে বেশ বোঝা যায় যে চাকা ধুলোর ভেতর দিয়ে কোন রকমে এগিয়ে চলেছে। তবু ও-পথটার এমনই একটা আকর্ষণ আছে, সে-পথে না গেলে তা বোঝা সহজ নয়। বালুবাড়ির সীমানা পার হওয়ার পরই দেখা যাবে বাঁদিকে কুমোরদের পল্লী। মাটির বাসনকোষন ছাড়া এরা খাপড়াও তৈরী করে থাকে—শহরের লোকের খাপড়ার চাহিদা রোজই বাড়ছে।

তারপরই জলা-জংগল পার হয়ে আম-কাঁঠাল গাছের সারি। পথের ছু'ধার থেকে তারা যেন ইশারায় ডেকে নিয়ে যায়। তারপরেই রাজারামপুর-ভাটপাড়া।

রাজারামপুর-ভাটপাড়া—এই তুই গ্রামের নাম পৃথক হলেও প্রকৃতপক্ষে

ও-এলাকাটাকে একটা গ্রাম ছাড়া ভাবা যায় না। দুই গ্রামের মধ্যে শুধু ছেলেদের বল খেলার একটি বিস্তীর্ণ মাঠ। এই মাঠেরই একধারে রাজারামপুর আর একদিকে ভাটপাড়া।

পরাধীনতার যুগে এই অরণ্যঘেরা এলাকায় মাত্র কয়েক ঘর মানুষের বসতির মধ্যে থেকে 'হিলি ডাকাতির' প্রেরণা কি ভাবে লোকে পেয়েছিল তার কাহিনী চিত্তাকর্ষক। এই সব এলাকায় ঘুরে বেড়িয়েছি—কিন্তু হিলি ডাকাতির মামলার কথা সাধারণত কেউ বলতে চাইত না। শুনতাম, হৃষি এবার জেল থেকে বার হবে। কত অল্প বয়সে পুলিশ ওকে ধরে নিয়ে গেছে। যাবজ্জীপন দ্বীপান্তর! বালুবাড়ি, ক্ষেত্রিপাড়া, কালীতলা, বড়বন্দর—এ-সব জায়গার কে না জানে পরমধার্মিক রমেশ ভট্টাচার্যকে। তাঁরই ছেলে হৃষি। লেখাপড়ায় আর আদব-কায়দায় তার মতো ছেলে মেলা ভার। রমেশ বাবু বন্দরে নিজের বাড়ি করেছিলেন। কিন্তু তাঁর শরিক দেবেশ ভট্টাচার্য ভাটপাড়াতেই থাকতেন। পৈতৃক সম্পত্তি অগাধ। দেবেশ বাবু ছিলেন সৌখিন ও আমুদে প্রকৃতির লোক। হঠাৎ একদিন হৃষি ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে কয়েকজন কিশোর এল বড়বন্দর বালুবাড়ি থেকে ভাটপাড়ায়। এমন তারা প্রায়ই আসে। সকলের গায়েই আলোয়ান। দেবেশ বাবু বাড়ি নেই।

তখন বাড়িতে নতুন নতুন কয়েকটা আগ্নেয়াস্ত্র এসেছে। হৃষির দলবলের আগ্রহে দেবেশবাবুর স্ত্রী একে একে ওদের সেগুলি সব দেখালেন। তারপর চামড়ার 'কেসে' বন্ধ করে তুলে রেখে দিলেন। খাওয়া-দাওয়া সেরে ছেলেরা হাসিমুখে প্রণম্যদের প্রণাম করে বেরিয়ে গেল।

তারপরই ওরা নিরুদ্দেশ। কিছুদিনের মধ্যে হিলি ডাকাতির মামলার বিবরণ প্রকাশ পেল। দেখা গেল হৃষিও অভিযুক্ত। একনম্বর আসামী ইংরেজের আদালতে। খবর শুনে ধর্মপ্রাণ রমেশবাবু মর্মাহত। কিন্তু হৃষির প্রাণভিক্ষার আপীলও তিনি নাকি করতে চাননি।

পরে দেখা গেল দেবেশ ভট্টাচার্যের বাড়িতে রিভলবারের চামড়ার কেস'-গুলো ঠিকই আছে, তবে তার মধ্যে থেকে আসল জিনিস উধাও হয়েছে।

আর ঐ উপজাতি পোলিয়ারা। ওদের প্রভাব বাসিন্দাদের ওপর প্রচুর। ওদের স্ত্রীপুরুষ শটী জঙ্গলে কাজ করে। হলুদের মত শেকড় তুলে চালনী-টিনে ঘষে ঘষে কাৎ বার করে। তারপর সে কাৎ ধুয়ে ধুয়ে, শুকিয়ে নিয়ে তৈরী করে

শটী। ওদের সঙ্গে ওদের ভাষাতেই কথা কইতে হয়—খাবা নাহে, এলাই বাহে ইত্যাদি। পিঠে নবজাত শিশুকে বেঁধে নিয়ে মাঠের কাজ করছে, মুড়ি বিক্রি করছে তাদের রমণীরা। এদের ভাষার প্রভাব অল্পবিস্তর পড়েছে সকলের ওপরই। অবশ্য মুখের ভাষাতেই এই প্রভাব সীমাবদ্ধ—লেখার ভাষায় নয়।··

রাজারামপুর-ভাটপাড়া জংগল আর পানাপুকুরে ভরা। তবু বন-জংগলের ফাঁকে ফাঁকে কত যে দেবদেবীর মূর্তি আছে তার বোধকরি সীমা সংখ্যা নেই। রাজারামপুরের ভদ্রকালী অতি জাগ্রত বলে খ্যাত। তেমনি আবার ভাটপাড়ার শ্মশানবাসিনীর মন্দির। শ্মশানবাসিনীর মন্দির দূর থেকে দেখলেই ভয় লাগে। বনজংগল ঘেরা এই জীর্ণ মন্দির। আরো কত জায়গায় ছড়িয়ে আছে শিবলিঙ্গ আর কালীমূর্তি।

আষাঢ় থেকে শীতের আগে অবধি গ্রামে ম্যালেরিয়ার তাণ্ডব। তবু পুজোর সময় দেখা যায় একাধিক দুর্গা প্রতিমা। ঢাকের আওয়াজে মুখরিত চারিদিক। যুবকরা মাঠে মাঠে বাঁধে থিয়েটারের স্টেজ। সারারাত ধরে কোথাও হয় আলমগীর, কোথাও বংগেবর্গী। দেশলাইয়ের বাক্সে কুইনাইনের পিল্ নিয়েও থিয়েটারে মাততে দেখেছি অনেককে।

আর আছে কান্তজীউয়ের মন্দির। সে মন্দিরে কারুকার্য দেখে মনে হয় কোথায় লাগে গয়ার মন্দির! দিনাজপুর রাজপ্রাসাদে যখন কান্তজীউকে মিছিল করে নিয়ে আসা হয়—সমগ্র শহর ও গ্রামগুলো যেন জেগে ওঠে উৎসবের আনন্দে। রাজবাড়িতে দেবতার অন্নভোগ হয় না—কিন্তু এই সময় অতিথির সেবা আর অন্নদান হয়। বছরের বাকি কয়েক মাস কান্তজীউ থাকেন কান্তনগরে। বিখ্যাত গোষ্ঠ মেলা আর রাস মেলার সময় কত দূর দূরান্তর থেকে কত ব্যাপারী আসে। মেলা চলে একমাস। কান্তজীউয়ের ভোগের পর প্রধান সেবায়েৎ তাঁকে চাঁদির গড়গড়ায় তামাক সেজে দেন।

এ-সম্বন্ধে একটি গল্প শোনা যায়। একবার এক অতিথি দর্শনলাভের আশায় কান্তজীউয়ের মন্দিরে আসে। রাত বেশি হয়ে যাওয়ায় বাইরের বারান্দায় শুয়ে সে বিশ্রাম করতে থাকে। রাতে গড়গড়া টানার শব্দে সে তামাক ইচ্ছা করে এবং তাকে 'একজন' সেই চাঁদির কল্‌কে এনে দিয়ে যায়। পরের দিন কান্তজীউর কল্‌কে বাইরে পড়ে থাকতে দেখে মন্দিরে গোলমাল বেধে যায়। সেই আগন্তুককে নিগ্রহ ভোগ করতে হয়। সেই থেকে নাকি কান্তজীর তামাক খাওয়ার শব্দ আর শোনা যায় না।

পৌষ সংক্রান্তি খুব ধুমধামের সঙ্গে পালিত হত। আঙিনায় আলপনা দিয়ে, ঘরের দরজার মাথায় পিঠেলুর চিত্র এঁকে শোলার ফুলগুচ্ছ ধান-দুর্বার সঙ্গে ঝুলিয়ে দেওয়া হত। সব বাড়িতেই নানারকম পিঠে তৈরী হত এবং কারুর বাড়ির পিঠে খেতে ইচ্ছে হলে বিনা নিমন্ত্রণেই সে বাড়িতে গিয়ে খাওয়া যেত।

এ-এলাকার লোকসংগীতের উল্লেখ না করলে বিবরণ অবশ্যই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। উত্তরবাঙলার ভাওয়াইয়া, চটকা প্রভৃতি গান এই গ্রামেও শোনা যায়। একটি চটকা গানেরই দৃষ্টান্ত দিচ্ছি ঃ

ডাল পাক কররে কাঁচা মরিচ দিয়া,
গুরুর কাছে নেওগা মন্তর নিরালে বসিয়া,—
ডাল পাক কররে।
ছোট বৌ চড়ায় ডাল মাঝলা বৌ ঝাড়ে,
(হারে) বড় বৌ আসিয়া কাঠি দিয়া নাড়ে।
ডাল পাক কররে।
(আমার) শ্বশুর করে ঘুসুর-ঘুসুর
ভাসুর করে গোসা,
(আজি) নিদয়া এলো স্বামী এসে ধরলো
চুলের যোসা,
ডাল পাক কর রে।
(আমার) শাশুড়ী আছে, ননদ আছে
আছে ভাগনা-বৌ,
এমন করে মার মারিল আইগ্যালো না কেউ,
ডাল পাক কর রে।

এমন কিছুনয়। সংসারের একটি ছোট ছবি। রান্না, শ্বশুরের অভিযোগ, স্বামীর মারধোর, অসহায় স্ত্রীর আক্ষেপ এই তো ছবি। কিন্তু আন্তরিকতায় ভরা।

গ্রামের বৈশিষ্ট্যই যে এই আন্তরিকতা। তার ছোঁয়া আমাদের বুকেও লেগেছিল। আজ সে গ্রাম স্বাধীন ভারতের দেশের বাইরে চলে গেছে। তবু তার সেই স্পর্শ আজো অম্লান ॥

॥ জলপাইগুড়ি ॥

বোদা

সুখের স্মৃতি বেদনা আনে, তবু যা একদিন নিতান্তই আপন ছিল অথচ রাজনীতির খেলায় যার সঙ্গে সম্পর্ক আজ অতি দূর হয়ে গেল তার কথা না-ভেবে পারি কি করে! আমার গ্রাম-জননী বোদা বাঙলা দেশের অসংখ্য গ্রামের একটি, হয়তো খুব করে বড়ো মুখে বলবার মতনও কিছু নেই তার—তবু আমার কাছে জননীর মতই সে অদ্বিতীয়া।

চোখ মেলেই যার আকাশ দেখেছি, যার ধুলো গায়ে মেখে বড় হয়েছি সেই বোদা আজ পরদেশ। জানি না আজও মাঘী পূর্ণিমায় বোদেশ্বরী মন্দিরে মহোৎসব হয় কি-না, স্বচ্ছতোয়া করতোয়ার উত্তরবাহী অংশে বারুণী স্নান উপলক্ষে একমাসব্যাপী মেলা বসে কি-না তাও জানি না। অম্বিকা সুন্দরী কারকুন যে শিবমন্দির স্থাপন করেছিলেন সেখানে আজো নিত্য পূজো হয় কি-না সে-খবরই বা আমায় কে দেবে।

বোদা যেতে হলে ডোমার পর্যন্ত যেতে হত ট্রেণে, সেখান থেকে গরুর গাড়িতে একুশ মাইল পাড়ি দেবার পর বোদা। আরও একটা পথ ছিল। জলপাইগুড়ি থেকে চিলাহাটি পর্যন্ত ট্রেণে, সেখান থেকেও আবার গরুর গাড়ির সাহায্য নিয়ে।' পনের মাইল পার হয়ে গেলে বোদার দেখা মিলত। জলপাই-গুড়ি থেকে বোদা পর্যন্ত বাস চলা শুরু হয় আজ থেকে বছর পঁচিশ আগে। প্রথম বাসটির নাম মনে আছে, 'আঁধারে আলো'। সত্যিই যেন সে বাসটি আলো হয়ে এল বোদার অধিবাসীদের কাছে।

বোদার নামকরণের ইতিহাস বলি। বুধরাজা এক বিরাট গড় তৈরী করে রাজবাড়ি স্থাপন করলেন। ত্থ' বর্গ মাইল এলাকা। ক্রমে সেই গড়ে স্থাপিত হল দেবী বুধেশ্বরীর মন্দির। শক্তির ভ্রামরী মূর্তি দেবী বুধেশ্বরী। একান্ন পীঠের অন্যতম। ক্রমে লোকের মুখে মুখে দেবী বুধেশ্বরীর নাম হল বোদেশ্বরী। সেই থেকে বোদা।

আগে রঙপুর জেলার তেঁতুলিয়া মহকুমার মধ্যে ছিল বোদা। ১৮৬৯ সালে গঠিত হল নতুন জেলা জলপাইগুড়ি। তখন বোদা এল জলপাইগুড়ির মধ্যে। তারপর এল ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট। র‍্যাডক্লিফের রায়ে বোদা পড়ল গিয়ে পাকিস্থানে। আমাদের ছেড়ে আসতে হল জন্মভূমিকে।···তবু মাকে ছেড়ে আসা কি সহজ কথা ?

মনে পড়ছে পোহাতুর মায়ের কথা। সেই নিরক্ষরা কৃষক-জননীর ছড়া কাটাঃ

ছাড় জায়গা না রয় পানি,
ছাড় পুত্র না ধরে বাণী,
ছাড় দেশ নিবন্ধুয়া,
ছাড় ভার্যা দুচারিণী।

পোহাতু গামছা দিয়ে কপালের ঘাম আর চোখের জল মুছলে। বললে, মাকে কি ছাড়া যায় ? মা রুদ্ধ কণ্ঠে বললে ঃ

ছাড় খেচখেচি মাও,
ছাড় খেচকেটা দাও।

ভাবছি, আমার বোদাও কি আজ নিবন্ধুয়া দেশ হয়ে উঠল ? তাকেও কি শেষ পর্যন্ত 'খেচখেচি' মায়ের মতই ত্যাগ করতে হল ?···ত্যাগ করতেই হল বোদাকে। তবু ভুলতে পারিনা বোদার কথা।···কোন দিন কি পারব ভুলতে ? মনে পড়ছে সারারাত ব্যাপী যাত্রার কথা। রাতের পর রাত, পালার পর পালা।

আরো মনে পড়ছে আমন ধান রোপনের আগে গছর পোনা, ধান কাটার আগে লক্ষ্মী পূজো, আর জমিতে ধুলো ছড়িয়ে ছড়া কাটা—

আগ শূয়োর হঠ্,
পোকা-মাকড় দূর যাউক্,
সবার ধান আউল ঝাউল,
আমার ধান শুদ্ধ চাউল।

তারপর নয়া খাওয়া, বিশুয়া, কইনাগাত, জিতুয়া। সবই মনে পড়ে আজ।···

গ্রামের লোকসংগীতের সুর এখনো কানে বাজে। চোখ বুজে সেই সুর শুনতে শুনতে আবার আমি বোদায় ফিরে যাই। লোকসংগীত সংগ্রহের সখ ছিল খুব। গাঁয়ের মানুষের মুখে গান শুনেই তৃপ্তি হত না, তাদের কাছে বসে সেই গানের কথা লিখে নিতাম। সে-কথায় কৃত্রিমতার লেশমাত্র নেই, তার সুরের

উৎস হৃদয়ে। আজো ইচ্ছে করে সেই সুর শুনতে, সেই গানের কথা সংগ্রহ করতে। কিন্তু আজ তো সে দুয়ার একরকম বন্ধ।

বিশেষ করে মনে পড়ে রাখাল ছেলের মুখের মইশাল গান :

মইশাল মইশাল কর বন্ধুরে
(ওরে) শুকনা নদীর কূলেহে,
মুখখানি শুকায়ে গেছে
চৈত মাইস্যা ঝামালে।
প্রাণ কান্দে মইশাল বন্ধু রে।
আমার বাড়িতে যাইও বন্ধুরে এই না বরাবর,
খাজুর গাইছা বাড়ি আমার
পূব দুয়ার্যা ঘর।
প্রাণ কান্দে মইশাল বন্ধুরে।
আমার বাড়িতে যাইও বন্ধুরে, বসবার
দিব মোড়া,
জলপান করিতে দিব ও শালি ধানের চিড়া।
প্রাণ কান্দে মইশাল বন্ধু রে।
শালি ধানের চিড়া দিবরে বিন্দু ধানের খৈও
(আজি) মোটা মোটা সফরী কলা গামছা
পাতা দৈও রে।
প্রাণ কান্দে মইশাল বন্ধুরে।

মইশাল বন্ধুর জন্যে মেয়ের প্রাণ কাঁদছে। চৈত্রমাসের উত্তাপে শুকনো নদীর কূলে মুখখানি শুকিয়ে গেছে একেবারে। মেয়ে বলছে মইশাল বন্ধুকে, তুমি এই পথ ধরে আমার বাড়িতে যেও। আমার পূব দুয়ারী ঘর, বাড়িতে আছে খেজুর গাছ। তোমায় বসবার জন্যে মোড়া দেব, জলপান করতে শালি ধানের চিড়া দেব। আর দেব বিন্দু ধানের খৈও, মোটা মোটা সফরী কলা আর ঘন দই।

বোদা হল দীঘির দেশ। কত যে দীঘি ! রাজার দীঘি, ময়দান দীঘি, কইগিলা দীঘি, ঠাঁটপাড়া দীঘি। আরো কত দীঘি। সুউচ্চ পাড় আর অশ্বত্থ ছায়ায় ঘেরা ময়দান দীঘির কাকচক্ষু জলে আজো লাল-শাপলার ছায়া কেঁপে

কেঁপে ভাসে কিনা কে জানে ! ঠিক তেমনি আজো কেউ জানে না সেই লোভী ব্রাহ্মণের নাম যে নাকি দীঘি ঠাকুরাণীর ঋণ পরিশোধ করেনি।

মেয়ের বিয়ের ব্যয়বহনে অক্ষম কোন গরীব লোক ময়দান দীঘির পাড়ে এসে করজোড়ে প্রার্থনা জানালে জলের বুকে নাকি ভেসে উঠত মোহরে ভর্তি থালা আর চালুনী। চালুনীর মোহর নিলে ফেরৎ দিতে হত না। চালুনীর মোহর ছিল দীঘি ঠাকুরাণীর দান। কিন্তু থালার মোহর ভেসে উঠত ঋণ হিসেবে। এক লোভী ব্রাহ্মণ চালুনী আর থালা, দুপাত্রেরই মোহর আত্মসাৎ করল। কিন্তু ঋণের মোহর আর পরিশোধ করতে পারল না। শোনা যায়, সেই থেকে নাকি দীঘি ঠাকুরাণী আর কাউকে দয়া করেন নি।

লোকে বলে যে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় কোচবিহারের মহারাজা দুর্ভিক্ষের হাত থেকে প্রজাদের বাঁচাবার জন্যে এই সব দীঘি কাটিয়েছিলেন। দীঘি খননের জন্যে লোকে মজুরী পেত মাথা পিছু একসের চাল আর নগদ দুআনা।

বোদাতে শুধু দেবমন্দির আর দীঘিই ছিল না। এই ছোট্ট গ্রামটিতে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অভাব বোধ করেনি কেউ। বোদার ছেলেদের হাইস্কুল অতি পুরোনো। মেয়েদের জন্যেও ছিল আদর্শ বালিকা বিদ্যালয়। আমগাছের ছায়াস্নিগ্ধ প্রাংগণে বালিকা বিদ্যালয়টি সত্যিই পঠন-পাঠনের পক্ষে ছিল আদর্শ স্থান। এছাড়া বরিশাল জেলার রাজবন্দী গোপালকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এখানে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন একটি নৈশ বিদ্যালয়।

বোদার গৌরবের ভূষণ ছিল কোচবিহার কাছারী। তাছাড়া দাতব্য চিকিৎসালয়, জনস্বাস্থ্য কেন্দ্র, সাব-রেজিষ্টারী অফিস, থানা, ডাকঘর সবই ছিল বোদা গ্রামে।

আজো হয়তো সবই আছে। নেই শুধু আমরা—বোদার এই হতভাগ্য সন্তানেরা, ভাগ্যের পরিহাসে পশ্চিমবাঙলার তথা ভারতের নানা প্রান্তে যারা আজ বাস্তুহারা বলে পরিচিত। বোদাকে আজ স্পর্শ করতে পাই না, তার বাতাসে আর নিঃশ্বাস নিতে পাই না, তবু তাকে স্মৃতিতে পাই। বোদা আজো আমায় ডাকে। তার প্রাণের কান্না প্রতি মুহূর্তে শুনতে পাই। না-কি আমারই প্রাণের কান্নাকে তার প্রাণের কান্না বলে ভুল করি !

কাঁদি, তবু ভাবি, এ-কান্না একদিন শেষ হবেই বোদার কোলে আবার গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ব। এই বিচ্ছেদ নেহাৎই সাময়িক—পুনর্মিলনের প্রস্তুতি।